বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ফেনী

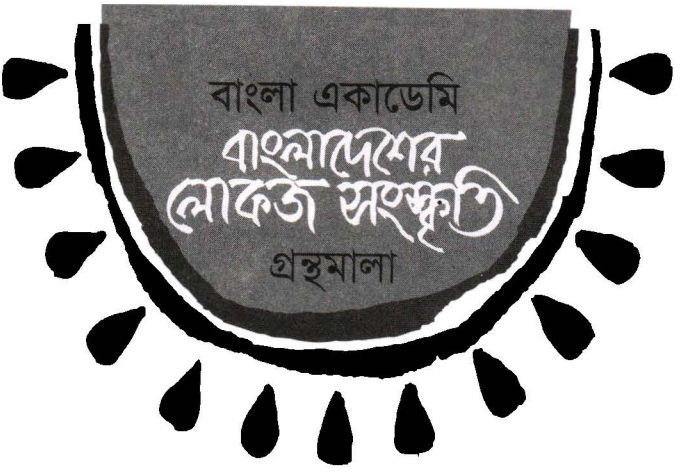

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ফেনী

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
শফিকুর রহমান চৌধুরী

সংগ্রাহক
সাইদুর রহমান বয়াতি
মোহাম্মদ নোমান (স্বকৃত নোমান)

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
ফেনী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১৬

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : FENI (Present state of Folklore in Feni District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 200.00 only. US$: 5.00

ISBN-984-07-5325-8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

এ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর),

www.pathagar.com

মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা

www.pathagar.com

পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান,

www.pathagar.com

সহকারী অনুবাদক রিফ্‌ফাত সামাদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান ফেনী জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ফেনীর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৯৬

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ছ. হাটবাজার
জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৯৭-১১০

ক. কিংবদন্তি
খ. লোককবিতা
গ. পুথিসাহিত্য

গ্রাম/স্থান নাম (place name) ১১১-১১২

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১১৩-১৩৬

লোকশিল্প
১. মৃৎশিল্প
২. বাঁশবেত শিল্প
৩. পাটি/বটনি
৪. নকশিকাঁথা

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৩৭-১৩৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৩৯-১৪২

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা/গীতিকা (ballad) ১৪৩-১৫১

১. দেশাত্মবোধক গান
২. উন্নয়নমূলক গান
৩. বন্দনা সংগীত
৪. ধুয়া গান
৫. আঞ্চলিক গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৫২-১৫৫

১. ঢাকঢোল
২. তবলা
৩. মুরলী
৪. মন্দিরা
৫. শঙ্খ

লোকউৎসব (folk festival) ১৫৬-১৬৩

১. চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখী উৎসব
২. ঈদুল ফিতর
৩. ঈদুল আযহা
৪. দুর্গাপূজা
৫. আশুরা

লোকাচার (ritual) ১৬৪-১৭০

১. কালীপূজা
২. লক্ষ্মীপূজা
৩. কুমারী পূজা
৪. গঙ্গাপূজা
৫. বিশ্বকর্মা পূজা
৬. রক্ষাকালী বা রক্ষাচণ্ডীর পূজা
৭. শীতলা পূজা
৮. ধন পূর্ণিমা পূজা
৯. অন্নপ্রাশন
১০. আকিকা
১১. কুলখানি
১২. গায়ে হলুদ
১৩. বিবাহ

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ১৭১-১৮২

খেজুরের রস, পিঠাপুলি, মিষ্টি, নারিকেলের চিড়া,
শসার মোরব্বা, খেজুর রসের পায়েস (শিরনি), খাডা

লোকনাট্য (folk theatre) ১৮৩-১৮৪

লোকক্রীড়া (folk games) ১৮৫-১৯০

১. পুতুল খেলা
২. টোপাভাতি
৩. এক্কাদোক্কা
৪. ওপেনটি বায়োস্কোপ
৫. খেজুরের গোটা খেলা
৬. গুটি খেলা
৭ হাডুডু বা কাবাডি
৮. ঘুড়ি উড়ানো বা ঘুড্ডি উড়ানো
৯. ডান্ডা খেলা
১০. গোল্লাছুট
১১. চাঁড়া মারা
১২. কানামাছি

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ১৯১-২০৫

১. জেলে
২. কামার
৩. ধোপা
৪. পাটি শিল্পী
৫. কারুশিল্পী
৬. মুচি
৭. পাল

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্র-মন্ত্র (chant) ২০৬-২০৮

ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্র-মন্ত্র

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২০৯-২১৪

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ২১৫-২১৬

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২১৭-২২০

১. বাঁশের তৈরি সরঞ্জাম
হাজারি, বাঁশের খাঁচা, কোরা, খাঁচি, মুরগির খাঁচা, ওড়া, কুলা, ধোচনা, চালইন
২. মাছ ধরার সরঞ্জাম
নৌকা, জাল, চাই, ডুলা

লোকভাষা (folk language) ২২১-২২৪

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

ফেনীর নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে নানা ধরনের জনশ্রুতি পাওয়া যায়। কারো কারো মতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের বিরাট রাজার এক সামন্তের নাম ছিল ফনী রাজা। তাঁর রাজ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে। উত্তরবঙ্গের বিরাট রাজার দিঘি, হাট-ঘাট ইত্যাদিকে মহাভারত বর্ণিত রাজার স্মৃতিবাহী বলে ধারণা করা হয়। বিরাট রাজার সামন্ত ফনী রাজার রাজধানী ছিল ফেনীর অদূরে পোড়ামাটির পাহাড়ে যা শিলার শহর নামে পরিচিত ছিল। তাই ধারণা করা হয় যে ফনী রাজার নামানুসারে ফনী বা ফেনী নামকরণ হয়েছে। আরো ধারণা করা হয় যে, ফনী রাজার রানির নামে একসময় ছিল 'রানির ঘাট'—যা বর্তমানে 'রানিরহাট' নামে পরিচিত। ফেনী শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিশাল দিঘি প্রাচীন ফনী রাজা বা তাঁর বংশধরদের উদ্যোগে খনন করা হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দিঘিটি 'রাজাজী' মতান্তরে 'রাজার ঝি' বা 'রাজাঝি' দিঘি নামে খ্যাত।

দূর অতীতে ফেনীর বিরাট এলাকা ছিল সাগর বা নিম্নজলাভূমিতে নিমজ্জিত। এখানকার অথৈই জলে ছিল শুধু 'কচুরিপানা' বা 'কচুরি ফেনা'। অন্য এক জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানকার জলাভূমিতে একসময় শুধু দেখা যেত 'বুদবুদ' বা 'ফেনা'। তাই এই 'ফেনা' (কচুরিপানা বা বুদবুদের ফেনা) বাহিত স্রোতধারা কালক্রমে 'ফেনী' শব্দে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকালে এখানে বিচরণ করত শুধু ফণী, আর ফণী অর্থ সাপ। সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণ ফণী বা সাপের যম বলে খ্যাত ফণী মনসা গাছ লাগাত।

খাল-বিল, নদী-নালায় সাপের আধিক্যের কারণে এখানকার বহমান নদী 'ফণী' নদী নামে পরিচিত হয়েছিল যা কালক্রমে ফেনী শব্দে পরিণত হয়েছে। কারো কারো মতে প্রাচীনকাল থেকে এখানকার পাহাড়িয়া স্রোতধারা বর্ষাকালে সাপের ফণার মতো ফুলে উঠত এবং তা সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়ে মানুষের জানমাল ও সম্পদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি করতো। তাই 'ফণী' শব্দ থেকে এখানকার প্রধান নদী ফেনী নদী নামে খ্যাত হয়েছে।

ফেনী নদীর নামে জনপদের নাম হয়েছে, না ফেনী জনপদের নামে নদীর নামকরণ হয়েছে এই বিষয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে এখানে 'ফেনী' নামে কোনো রাজস্ব এলাকার নাম নেই, অতীতেও ছিল বলে মনে হয় না। তাই ধারণা করা চলে যে নদীর নামানুসারে এই জনপদের নামকরণ হয়েছে ফেনী। মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও পুথিপত্রে একটি বিশেষ নদীর স্রোতধারা ও ফেরী পারাপারের ঘাট হিসেবে আমরা 'ফণী' শব্দ পাই।

www.pathagar.com

ফেনী জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

পনেরো শতকের মধ্যভাগে পণ্ডিত জটাধর ভট্টাচার্য রচিত 'অভিধানতন্ত্রম' গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দানকালে জাহ্নবীকূলের পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বঙ্গলভূমিতে এসে ফণীতটস্থ দেবকর গ্রামে বসতি স্থাপনের কথা বলেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগলপুরের বর্ণনাকালে লিখেছেন, "ফণী নদীতে বেষ্টিত চারিধার, পূর্বদিকে মহাগিরি পার নাই তার"। উপর্যুক্ত দু'জন পণ্ডিতের ভাষায় আমরা 'ফণী' নামে একটি নদীর নাম পাই। সতেরো শতকের প্রথমভাগে মির্জা নাথানের ফার্সি ভাষায় রচিত "বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে" ফণী শব্দ ফেনীতে পরিণত হয়েছে। তিনি দু'টি ফেনী নদীর কথা উল্লেখ করেছেন। আঠারো শতকের শেষভাগে কবি আলী রেজা প্রকাশ কানু ফকির তাঁর পিরের বসতি, হাজীগাঁওর (মিরসরাইতে) অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন, "ফেনীর দক্ষিণে এক শহর উপাম, হাজীগাঁও করিছিল সেই দেশের নাম।" কবি মুহাম্মদ মুকিম তাঁর পৈতৃক বসতির বর্ণনাকালে বলেছেন, "ফেনীর পরিচয়ভাগে জুগিদিয়া দেশে ..."। বলা বাহুল্য তারাও নদী অর্থে 'ফেনী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। মনে হয় আদি শব্দ 'ফণী' মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের ভাষায় 'ফেনী'তে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় যে, ১৮৭২-৭৪ সালের মধ্যে মোগল আমলের আমিরগাঁও থানা দপ্তর নদীর ভাঙনের মুখোমুখি হলে তা ফেনী নদীর ঘাটের অদূরে খাইয়ারাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ঐ থানা কোম্পানির কাগজপত্রে ফেনী থানা (ফেনী নদীর অদূরে বলে) নামে পরিচিত হয়। ১৮৭৬ সালে নতুন মহকুমার পত্তন হলে খাইয়ারা থেকে থানা দপ্তরটি মহকুমা সদরে স্থানান্তরিত হয় এবং নতুন মহকুমাটি ফেনী নামে পরিচিত হয়। প্রায় তিনদিকে ফেনী নামের নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত জনপদের নামকরণ ফেনী যথার্থ বলে মনে হয়।[১]

ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৮৭৬ সালে ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহকুমা হিসেবে ফেনী নোয়াখালীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ মহকুমার গোড়াপত্তন হয় মিরসরাই, ছাগলনাইয়া ও আমীরগাঁও-এর সমন্বয়ে। নতুন মহকুমার পত্তন হলে খাইয়ারা থেকে থানা দপ্তরটি মহকুমা সদরে স্থানান্তরিত হয় ও নতুন মহকুমাটি ফেনী নামে পরিচিত হয়। ১৮৭৬ সালে মিরসরাইকে কর্তন করে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম মহকুমা সদর দপ্তর ছিল আমীরগাঁওয়ে। ১৮৮১ সালে তা ফেনী শহরে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে যে সকল মহকুমাকে মানোন্নীত করে জেলায় রূপান্তর করা হয়েছিল ফেনী জেলা তার একটি।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র জেলা ফেনীর আয়তন ৯২৮.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফেনী জেলায় (তৎকালীন মহকুমা) চারটি থানা ছিল : ফেনী সদর, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম। বর্তমানে ফেনী জেলায় উপজেলা : ৬টি–ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, ফুলগাজী, পরশুরাম ও দাগনভূঁইয়া; থানা : ৬টি- ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, সোনাগাজী, ফুলগাজী, পরশুরাম ও দাগনভূঁইয়া; পৌরসভা : ৫টি, ইউনিয়ন : ৪৩টি, গ্রাম : ৫৬৪টি, মৌজা : ৫৪০টি।

www.pathagar.com

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

ফেনী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বভাগে অবস্থিত একটি জেলা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ফেনী একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তর নোয়াখালীর পূর্বদিকে ফেনী অঞ্চলকে ভূখণ্ড হিসেবে অধিকতর প্রাচীন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। গাছপালা, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, জলাভূমি ও নদ-নদী পরিবেষ্টিত জনপদ ফেনীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এখানকার মানুষের স্বকীয়তা, জীবন, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হয় বলে এখানকার মানুষ অত্যন্ত সাহসী এবং পরিশ্রমী। জনসংখ্যার তুলনায় জমি কম থাকার কারণে এই অঞ্চলের মানুষ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ফেনীর উত্তরে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই, পশ্চিমে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ ও কোম্পানীগঞ্জ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ফেনী বিষুব রেখার ২৩°-১´ উত্তরে এবং গ্রিনউইচের ৯১°-২২´ পূর্বে অবস্থিত।

এই জেলার ভূমিরূপ সমতল। উত্তরে ভারতীয় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ক্রমশ ঢালু। ছাগলনাইয়া, পরশুরামের পূর্বদিকে একসময় টিলা, বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কাজিরবাগের পোড়ামাটির টিলা ফেনীর একমাত্র উঁচুভূমি। একসময় কালিদহ ছিল একটি বিরাট জলাভূমি। পঞ্চাশের দশকে কালিদাস-পাহালিয়া খাল কাটার কাজ শুরু হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই খাল কাটার কাজ সম্পন্ন করেন। এর ফলে কালিদহ জলাভূমি ভরাট হয়ে যায় এবং এখানে কৃষিকাজ জোরদার হওয়ার ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকা ফেনী। সাগরের জলোচ্ছ্বাস ও ভাঙন রোধ করার জন্য সোনাগাজীতে মুহুরী প্রকল্প নামে এক বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে স্লুইস গেইট ও বেড়ি বাঁধ নির্মাণের ফলে জোয়ারের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং ফেনীর বিরাট এলাকায় চাষাবাদের জন্য সারা বছর পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফেনী একটি কৃষি নির্ভর এলাকা। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমানে (২০১১) ফেনীর মোট আবাদী জমি : ৭৫,৯২২ হে., নিট আবাদী জমি : ৭৪,৭২০ হে., চাষাবাদযোগ্য জমি : ৭৪,৭২০ হে., জলাভূমি : ৬,০১০ হে., চাষের অযোগ্য : ১২০২ (সাময়িক), এক ফসলী : ৯,১৩৬ হে., দো ফসলী : ৫৪,২৪৯ হে., তিন ফসলী : ১১,৩৩৫ হে., সেচের আওতায় : ৩৫,০৮২ হে., মোট বনভূমি : ২,১৭৯.২২ হে.। খনিজ সম্পদ : ফেনী গ্যাস ফিল্ড, সদর উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। এটি বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত।[২]

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শিলালিপি, তাম্র শাসন, প্রাচীন দালান-কোঠা, মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। ফেনী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। সুদূর

www.pathagar.com

অতীতে এ অঞ্চল ছিল নিম্নজলাভূমি বা সাগরের অংশ। উত্তর-পূর্বদিক পাহাড়িয়া অঞ্চলের পাদদেশ। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে জনবসতি ছিল বলে গবেষক ও ইতিহাসবিদদের ধারণা। ফেনীর পূর্ব দিকের রঘুনন্দন পাহাড় থেকে কাজিরবাগের পোড়ামাটি অঞ্চলে হয়ত আদিকালের শিকারী মানুষের আগমন ঘটেছিল। এখানকার ছাগলনাইয়া গ্রামে ১৯৬৩ সালে একটি পুকুর খনন করার সময় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত একটি হাতকুড়াল বা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এটি বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা এই হাতকুড়াল প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। অনুরূপ হাতিয়ার বা মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী ময়নামতি, রাঙ্গামাটি ও সীতাকুণ্ড অঞ্চলেও পাওয়া গেছে।[৩]

বৃহত্তর নোয়াখালীর পূর্বদিকের ফেনী অঞ্চলকে একটি প্রাচীন ভূখণ্ড বলে গবেষক ও ইতিহাসবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন। ফেনীর পূর্বভাগে ছাগলনাইয়া উপজেলার শিলুয়া গ্রামে রয়েছে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ। এই শিলামূর্তি নিয়ে স্থানীয়ভাবে নানা ধরনের কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এই শিলামূর্তির অবস্থানের কারণে স্থানটি শিলুয়া বা শিল্লা নামে পরিচিত হয়েছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এন. কে ভট্টাশালী ও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে শিলুয়া গ্রামের শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার একটি প্রাচীন নিদর্শন। তাঁদের মতে শিলামূর্তির গায়ে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপি থেকে এখানে আর্যসভ্যতা বিকাশের প্রমাণ মেলে। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মী হরফ মৌর্য বংশের সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত ছিল। শিলুয়া গ্রামের শিলামূর্তি স্থাপনের সময়কাল থেকে ফেনী অঞ্চলের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা মনে করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত রয়েছে।[৪]

ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসেবে প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত গৃহস্থালী সামগ্রীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফেনী ও নোয়াখালীর অঞ্চল যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় বারবার ভেঙেছে। নিম্নাঞ্চলের নদ-নদীর গতি বারবার পরিবর্তন হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মে নতুনভাবে চরাঞ্চলের ন্যায় জনপদ গড়ে উঠেছে। নিম্নজলাভূমি ও নদ-নদী অধ্যুষিত প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াত ও পরিবহনের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের বহু স্থানে পুকুর খনন করার সময় কাঠের তৈরি নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[৫]

মধ্যযুগের ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের ইতিহাস রচনার জন্য ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনি, দ্য রেরস ও ফন ড্রেন রুকের মানচিত্র, রাল্‌ফ্‌ফিচ ও বার্নিয়ারের বিবরণ, ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা', মোগল রাজ কর্মচারী মির্জা নাথান রচিত 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী', চট্টগ্রামের কবি দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্য, ভুলুয়ার কবি আবদুল হাকিমের কাব্যাবলী, মিরসরাই-এর খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খানের রচনাবলী ইত্যাদি যথেষ্ট সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।[৬]

মধ্যযুগের উপকূলীয় অঞ্চলে আরব, মধ্য এশিয়া থেকে আগত অনেক সুফি, ফকির, দরবেশ, নাবিক, ব্যবসায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন। মুসলমান সুফি-সাধকগণ

www.pathagar.com

স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা প্রচার করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের মানবিক মূল্যবোধ, একই স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষে মানুষে ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছিলেন। এর ফলে বহিরাগত এসব ফকির, দরবেশ, সুফি-সাধকদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে স্থানীয় জনগণের জীবন যাপন পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সুফি-সাধকদের মাজারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে একটি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা। তৈরি হয়েছে নানা ধরনের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি। যা বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া এসব অঞ্চলের গ্রাম, রাস্তা-ঘাট, দিঘি, মসজিদ-মন্দিরের নামকরণের সঙ্গে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে রয়েছে।

এখানকার চারণকবিদের রচনা ও কাব্যে ইতিহাসের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকে সেনবাগের কবি শেখ বাসানিয়ার স্থানীয় ভাষায় রচিত 'চৌধুরীর লড়াই' কাব্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি শেখ মনোহর রচিত শমসের গাজীর পুথিকে একটি ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ফেনী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত কিংবদন্তি, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসংগীত এবং সুফি, সাধু, ফকির-দরবেশদের মাজারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জনশ্রুতি ইত্যাদির মাধ্যমে এখানকার মানুষের জীবন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

এছাড়া এলাকার ভূমি জরিপ, জমিদারি ইজারা পত্তন, আদমশুমারী প্রতিবেদন, জেলা গেজেটিয়ার, ইংরেজ আমলে ফেনীর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়িয়া কুকী আদিবাসীদের হামলা বিষয়ে পরশুরামের কবি গুল বক্স এবং মদন ধূপীর কাব্য, ফেনীর মহকুমা হাকিম কবি নবীন চন্দ্র সেন রচিত স্মৃতিকথা, ফেনীর বিখ্যাত সুফি ও দরবেশ পাগলা মিয়ার জীবন কাহিনিতে ফেনীর আধুনিক ইতিহাস ও সমকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।[৮]

অধ্যাপক আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের ইতিকথায় বলেছেন, "প্রাচীনকালে আধুনিক ফেনী অঞ্চল ছাড়া নোয়াখালীর বেশিরভাগ ছিল নিম্ন জলাভূমি। তখন ভুলুয়া (নোয়াখালীর আদি নাম) ও জুগিদিয়া (ফেনী নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত) ছিল দ্বীপের মত।[৯]

আধুনিক ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণাঞ্চল 'দক্ষিণশিক' পরগনা নামে পরিচিত। ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদারি ব্যবস্থায় ফেনীর বিরাট এলাকার জমিদার ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ। ফেনীর ছাগলনাইয়া-পরশুরাম অঞ্চল মহারাজার জমিদারিভুক্ত হয়। এই জনপদে শমসের গাজী নামে এক বীর বাঙালির আবির্ভাব ঘটেছিল। স্থানীয় কৃষকপ্রজাদের সমর্থনে এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তিনি রৌশনাবাদ ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা জয় মাণিক্যের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহের নেতা হিসেবে শমসের গাজী সংগ্রামের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা ফেনীসহ বাংলাদেশের মানুষকে নানা প্রতিরোধ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সৃষ্ট এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলনেই ফেনীর জনগণ গভীরভাবে একাত্ম হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের শুরুতে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফেনীর এক বীরসন্তান আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ আলী চৌধুরী। শর্শাদীর নিমতলীতে জমিদার মুহাম্মদ আলী চৌধুরীর নির্মিত বসতবাড়ি এখনও রয়েছে। একজন ইংরেজ-বিরোধী জমিদার হিসেবে তিনি সারাজীবন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা ও কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ফেনী-নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারী ও কৃষকপ্রজাদের ওপর কোম্পানির আমলা ও দালালদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শিখ-নরপতি রণজিত সিং-এর হাতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হলে সৈয়দ আহমেদ রায় বেরেলী ১৮৩০ সালে পাঞ্জাবের শিখ শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, শিখ-নরপতি রণজিত সিং-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের নোয়াখালী-কুমিল্লা অঞ্চল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক মুজাহিদ যোগদান করেছিলেন। ফরায়েজি আন্দোলন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭১৮-১৮৪০)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হাজী পির দুদু মিঞাঁর নেতৃত্বে নোয়াখালীর উপকূলীয় লবণ-চাষিরা দীর্ঘদিন ইজারাদার-বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল।[১০]

ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠার আগে ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম এলাকা কুমিল্লা জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে আগত কুকী দস্যুদের উপর্যুপরি হামলা ও লুণ্ঠনে ছাগলনাইয়া-পরশুরাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কুকী দস্যুরা কোলাপাড়া গ্রাম আক্রমণ করতে এলে সে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি গুনাগাজী মজুমদার দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে কুকী দস্যুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।[১১]

ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক ইউনিয়ন হিসেবে কালেক্টরেট বা জেলা এবং জেলার অধীনে বেশকিছু থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের অপর পর্যায়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত করেন। ১৮৭৬ সালে ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটাকে নোয়াখালী জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠা ফেনীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর কবি নবীন চন্দ্র সেন ফেনীর হাকিম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হাটবাজার প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজের জন্য তাঁকে নবপ্রতিষ্ঠিত ফেনী মহকুমার যথার্থ স্থপতি বলা চলে।[১২]

আধুনিক ফেনী জনপদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও মরমীসাধক পাগলা মিঞাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফেনী শহর প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ফেনীর এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ফেনী অঞ্চলের মানুষের সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[১৩]

www.pathagar.com

ব্রিটিশ আমলে রেললাইন স্থাপন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটা মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। ১৮৯৫ সালে ফেনী সদরকে স্পর্শ করে আসাম-বেঙ্গল এবং ১৯২০ সালে ফেনী-বিলোনিয়া শাখা রেলপথ চালু হলে এখানে আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে এবং ফেনী দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসন প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে এদেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইউরোপে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশ তুরস্কের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এটা ইতিহাসে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁর ভাই শওকত আলী ছিলেন এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা। আলী ভ্রাতৃদ্বয় সাংগঠনিক সফরে নোয়াখালী সফরে এলে এখানকার গ্রামে-গঞ্জে খেলাফত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিক্ষুব্ধ মানুষ এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধী খেলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এতে আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। তিনি একই সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করা এবং বিলেত থেকে আমদানীকৃত পণ্য বর্জন করা। নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন এক জঙ্গিরূপ ধারণ করেছিল। নোয়াখালীর রামগঞ্জ, ফেনীর পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিটি গঠনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। নোয়াখালীর খান সাহেব আবদুর রশীদ, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ দেওবন্দি, নগেন্দ্র কুমার শুর, ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, আবদুল গোফরান উকিল (শর্শাদী), মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (ফেনী), মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বারাহীপুর), ফেনীর উকিল গুরুদাস কর প্রমুখ ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৪]

অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরে এখানে উপকূলীয় লবণ উৎপাদন ব্যাপকতা লাভ করে। সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত লবণ কর অমান্য করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী লবণ-কর অমান্য করে লবণ উৎপাদন শুরু করলে তা উপকূলীয় লবণ উৎপাদিত অঞ্চলে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্থানীয় লবণ-চাষিদের লবণ কর অমান্য করার জন্য সন্দ্বীপের কমরেড মুজাফফর আহ্মেদ, সোনাগাজীর যামিনী কুমার মাস্টার ও পুলিন বিহারী দাশগুপ্ত, আমিরাবাদের প্রিয়লাল মজুমদার, ফেনী কলেজ ও ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১৫]

চট্টগ্রামের অগ্নিপুরুষ বীর বাঙালি মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হয়। তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রমের সঙ্গে নোয়াখালী অঞ্চলের কিছু যুবনেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিপ্লবীরা ফেনী রেলস্টেশনে চট্টগ্রামগামী একটা অস্ত্রবাহী ট্রেনের ওপর হামলা করে। কর্তৃপক্ষ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে।[১৬]

www.pathagar.com

তিরিশের দশক থেকে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের কর্মসূচিতে ফেনী ও নোয়াখালী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাঁতিদের তৈরি খদ্দর কাপড় এখানে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খদ্দর কাপড় প্রচলনের আন্দোলনকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য ফেনী শহরে এবং নোয়াখালী সদরে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা খদ্দর অফিস চালু করেছিলেন। ফেনী অঞ্চলে স্বদেশি খদ্দর কাপড় প্রচলনে সোনাগাজীর নেতা আবদুল জব্বার জনসাধারণের কাছে আবদুল জব্বার খদ্দর নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পরশুরামের ধনীকুন্ডা গ্রামের নেতা শামসুল হুদা তাঁতিদের গান গাইতেন বলে একসময় 'টুকটাক' হুদা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে ফেনীর তৎকালীন তরুণ নেতা খাজা আহমদসহ আরো অনেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৭]

বিশের দশক পর্যন্ত ফেনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা দীর্ঘদিন যৌথভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তবে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ-এর সহযোগিতা শুরু করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৩৫ সালে আইনসভাকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করলে ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বাড়তে শুরু করে। আইনসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টির কর্মকাণ্ড এই অঞ্চলে বেশ জোরদার হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এখানে মুসলিম লীগ প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফেনী অঞ্চল থেকে মুসলিম আসনে কৃষকপ্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম (বারাহীপুর) এবং নোয়াখালী থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী আবদুল গোফরান উকিল আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।[১৮]

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলেও জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে ফেনীর কৃতীসন্তান হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা। চল্লিশের দশক থেকে তিনি বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অমূল্য অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি এ-অঞ্চল থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৯]

মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন–নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে পরশুরামের কৃতীসন্তান মাহমুদ নূরুল হুদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি দেশের বামপন্থী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ও গণতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি বায়ান্ন সালে কারাবরণ করেন। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা।[২০]

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে স্থানীয়ভাবে ফেনীর ছাত্রসমাজের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। মুসলিম লীগ বিরোধী হক সাহেব মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় থাকাকালে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ফেনী কলেজের বি.এ. ক্লাসের সাতজন মুসলমান ছাত্রকে এক পর্যায়ে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'ফেনী দিবস' পালিত হয়। কর্তৃপক্ষ সাতজন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।[২১]

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে একদিকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছিল, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা ফেনীতেও বেজে ওঠে। জাপানি আগ্রাসনের নিকট বার্মার পতন ঘটলে শত্রুপক্ষ ফেনী-চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে পৌঁছে। শত্রুপক্ষের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য ফেনী অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপিত হয়। শহর ও পল্লি অঞ্চলের এখানে-সেখানে সেনাছাউনি স্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ ভারতে এশিয়ার বৃহত্তম প্রতিরোধ ঘাঁটি হিসেবে যুদ্ধকালীন বিশ্বে দুই প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে ফেনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নির্মিত হয়েছিল একটি বিশাল বিমানঘাঁটি। এছাড়া পরশুরাম ও লেমুয়াতেও রাতারাতি অস্থায়ী বিমানঘাঁটি স্থাপিত হয়। শত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও এখানকার মানুষ মাতৃভূমি রক্ষার কাজে মিত্রবাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

কিন্তু ছনুয়া গ্রামে অবস্থিত মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের কার্যকলাপ ফেনীর মানুষকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে। গোরা সৈন্যরা ছনুয়া ও আলোকদিয়া গ্রামে নারীনির্যাতনের মতো জঘন্য কাজে এগিয়ে গেলে গ্রামবাসী মারমুখী হয়ে উঠে এবং গোরা সৈন্যদের ছাউনি ঘেরাও করে বসে। নিরস্ত্র জনতার উপর ছাউনি থেকে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করা হলে ঘটনাস্থলে কয়েকজন নারী-পুরুষ নিহত হয়। ছনুয়া ও আলোকদিয়া গ্রামের ঘটনা ও ফেনীর মানুষের প্রতিক্রিয়ার খবর কলকাতার পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস গোরা সৈন্যদের কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করে। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ফেনীর জনগণ একাধিকবার আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবাদ বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল। যা স্থানীয় ভাষায় 'কত্তি ভাঙ্গা' (মাটির বদনা) আন্দোলন নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল জাপানি বোমারু বিমান ফেনী অঞ্চলে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান এখানে ভূপাতিত হয় এবং কয়েকজন জাপানি পাইলট নিহত হয়।

মহাযুদ্ধের পরপরই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করে। এই দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলার রাজধানী কলকাতা মহানগরে এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়। ফেনী-নোয়াখালীর মতো নিভৃত অঞ্চলেও

www.pathagar.com

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নোয়াখালীর রামগঞ্জে সংগঠিত হয় এক ভয়াবহ দাঙ্গা। দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া ফেনী শহরে এবং ছাগলনাইয়ার বাঁশপাড়াতে ও জেলার অন্যান্য হিন্দু প্রধান অঞ্চলে কিছুটা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গা এখানে ভয়াবহ রূপ নিতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের হস্তক্ষেপের ফলে।

ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[২২]

পাকিস্তান আমলের শুরুতে ফেনীর দু'জন কৃতীসন্তান পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীসভায় আসন লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছর ফেনীতে রাজনৈতিক দল বলতে ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ। এটা আবার গুটি কয়েক রাজনৈতিক নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। ফলে স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেখা দিয়েছিল স্থবিরতা ও শূন্যতা। এ পটভূমিতে ফেনী কলেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ফেনী কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ১৯৪৮ সালে ছাত্র মজলিস গঠনের উদ্যোগ নেন।

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এখানে সরকার বিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এক সমাবেশে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে সেখানে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছিল তা ফেনী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে দেরি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অনুকরণে ফেনী কলেজে ১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ফেনীতে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের শাখা স্থাপিত হলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এখানকার জনমত আরো চাঙ্গা হয়ে উঠে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফেনী কলেজ ছাত্র মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জিয়াউদ্দিন আহ্‌মেদ। তাঁর নেতৃত্বে তৎকালীন মহকুমা হাকিমের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফেনীর ছাত্র-জনতা ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে শহরে হরতাল পালন করে, বিক্ষোভ মিছিল করে এবং কলেজ প্রাঙ্গণে জনসভা করে। শুধু ফেনীতে নয় এখানকার ছাত্র, যুবসমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ ফেনীর বাইরে ঢাকাতেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফেনীর মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার দ্রুত বিকাশ ঘটে। দেশে আইন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চুয়ান্ন সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হলে ফেনী তথা নোয়াখালী অঞ্চলে রীতিমতো গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্টের বিখ্যাত 'একুশ দফা' কর্মসূচি প্রচারে এখানে ছাত্র সমাজের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের জন্য বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলেও দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী আন্দোলন তথা গণ-অভ্যুত্থানকালে এখানে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এতই জোরদার হয়েছিল যে, ছাগলনাইয়ার সাতজন স্কুল ছাত্রকে কুখ্যাত জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঐসব ছাত্রের বয়স ছিল তেরো থেকে পনেরো বছর।[২৩]

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ফেনীর মুক্তিকামী জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘ. জনবসতির পরিচয়

পণ্ডিতদের মতে ফেনী অঞ্চলে আদি শিকারী যুগের মানুষের বসতি ছিল। সম্ভবত যাযাবর শিকারী যুগ থেকে এক সময় পাহাড়িয়া 'জুম চাষ' তথা কৃষি সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।[২৪]

ফেনী-মুহুরী-কহুয়া নদীর গতিপ্রকৃতি ও ছোটো ফেনী নদী, কালিদাস-পাহালিয়া খালের খরস্রোত, নদী ভাঙন, বন্যা, চরাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের নোনা হাওয়া, ছাগলনাইয়া অঞ্চলের পাহাড়ি লালমাটি ফেনী জেলার মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, ভাষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ অঞ্চলের মানুষগুলো ধর্মভীরু-সহজ-সরল-অতিথিপরায়ণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ অঞ্চলের মানুষের মজ্জাগত।

নাথ সম্প্রদায়ের লোকজন পরশুরামের আদি বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়। নাথরা বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক। এই এলাকায় এদের মূল পেশা হচ্ছে পাটি বোনা। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে যোগী বলা হয়। তাদের পূর্বপুরুষরা যোগ সাধনা করতো। তাই মৃত্যুর পর এদেরকে দাহ না করে কবর দেওয়া হয়। যোগাসনে বসার মতো ভঙ্গিতে এদেরকে কবরে রেখে মাটি দেওয়া হয়। নাথ সম্প্রদায়ের লোকজন নিজেদেরকে দেবের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। তাই নামের শেষে তারা দেবনাথ ব্যবহার করে। এদের পূজার পুরোহিত আলাদা। কিছু ব্রাহ্মণ আছেন যারা পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই লেখাপড়া শিখেছে। অনেকের নিজস্ব জায়গা-জমি আছে। দক্ষিণ ও উত্তর কোলাপাড়া, অনন্তপুর এই তিন গ্রামে নাথরা বেশি। শীল সম্প্রদায়ের (নাপিত) ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ একই গোত্রীয়।

ফেনী জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানা সোনাগাজী। সোনাগাজীর পূর্বদিকে বড়ো ফেনী নদী এবং পশ্চিম দিকে ছোটো ফেনী নদী প্রবাহিত। বড়ো ফেনী নদী এবং ছোটো ফেনী নদীর মোহনা সোনাগাজীর দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। বড়ো ফেনী নদীর উপকূলীয় এলাকায় লোকজনের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ এবং নদী থেকে সামুদ্রিক মাছ আহরণ। তাছাড়া চরাঞ্চলে লোকজন মহিষ, গরু, ভেড়াসহ পশুপালন করে। মহিষের দুধ ও গরুর দুধ চরাঞ্চল থেকে অন্য এলাকায়

www.pathagar.com

সরবরাহ করা হয়। চরে উৎপাদিত মহিষের দুধ ও দই বিখ্যাত। চরাঞ্চলে লোকজন টিনের ঘরে বাস করে।

চরের মানুষের জীবনে জলদস্যুদের উৎপাত ও আক্রমণ একটি নিত্য দিনের ঘটনা। অনেক সময় মৎস্যচাষী, জেলে ও পশুপালনকারীদের ওপর তারা হামলা চালায়। টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঝে মাঝে অভিযান চালায়। এসময় জলদস্যুরা পালিয়ে সন্দ্বীপ, হাতিয়া এসব এলাকায় চলে যায়।

এখানকার চরাঞ্চলের মধ্যে চরচান্দিয়া, চরখোন্দকার, চরনারায়ণ উল্লেখযোগ্য। বড়ো ফেনী নদী ও মুহুরী নদীর ভাঙনের ফলে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি, জনবসতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। চরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের নিজস্ব জমি আছে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ কৃষক অন্যের জমি চাষ করে। তারা বর্গাচাষী নামে পরিচিত। জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। এখানে স্কুল-মাদ্রাসা রয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে। চরাঞ্চল এখন অনেক উন্নত। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সিএনজি, অটো রিক্সা, মিনিবাস যাতায়াত করে সোনাগাজী থেকে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফেনী অনগ্রসর জনপদ। এখানে জনসংখ্যার তুলনায় শিল্প-কারখানা তেমন নেই। তাই এখানকার মানুষ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক ফেনীর পরিচয় তার ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত নেই। এখানকার কর্মবীর মানুষের মধ্যে ফেনীর প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে। তারা দেশ-বিদেশের কলকারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।[২৫]

ফেনীর জনগণের রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। এখানে আগমন ঘটেছে সাধু, ফকির, দরবেশ, জ্ঞানী, গুণী মানুষের। জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) মোট : ১৪,৯৬,১৩৮ জন, পুরুষ : ৭,২২,৬২৬ জন, নারী : ৭,৭৩,৫১২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব : ১৪৫১ জন (প্রতি বর্গ কিমি.)।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

ফেনীর প্রধান নদী হচ্ছে : ফেনী নদী, ছোটো ফেনী নদী, মুহুরী নদী, সিলোনিয়া নদী, কহুয়া ও কালিদাস-পাহালিয়া খাল। এগুলো ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

উৎপত্তিস্থল ভারতের ত্রিপুরার পাহাড় থেকে নেমে এসে ফেনী নদী জেলার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ছাগলনাইয়া থানায় প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই নদী জেলার পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলাকে বিভক্ত করেছে শুভপুরে। এই নদীর ওপর উল্লেখযোগ্য তিনটি সেতু রয়েছে : শুভপুর সড়ক সেতু, মুহুরীগঞ্জ সড়ক সেতু ও ধুমঘাট রেলওয়ে সেতু।

www.pathagar.com

মুহুরী নদী ভারতীয় সীমান্তশহর বিলোনিয়ার পশ্চিমদিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে দুই দেশের সীমান্তরেখা বরাবর কিছুটা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ফেনী-বিলোনিয়া রেল ও সড়কপথে চিথলিয়া ব্রিজের নিচ দিয়ে কখনো পূর্বে কখনো উত্তরে মোড় পরিবর্তন করে চাঁদগাজী, রেজুমিয়া, ফাজিলপুর পার হয়ে আরো দক্ষিণে সোনাগাজী থানায় প্রবেশ করে ফেনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুহুরী নদীর একটি শাখা বিলোনিয়ার পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে কিছুটা দক্ষিণে আবার পূর্বদিকে ঘুরে ফুলগাজীর পাশ দিয়ে আরো পূর্বে এসে পুনরায় মূল মুহুরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। স্থানীয়ভাবে এটি কহুয়া খাল নামে পরিচিত। এই নদীর ওপর উল্লেখযোগ্য সেতু হচ্ছে চিথলিয়া রেল ও সড়ক সেতু, চাঁদগাজী সেতু, রেজুমিয়া সেতু, ফাজিলপুর রেল ও সড়ক সেতু।

সিলোনিয়া নদীটি ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলায় অবস্থিত। নদীটির উৎপত্তি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা হতে এবং পতিত হয়েছে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলায় অবস্থিত মুহুরী নদীতে গিয়ে। নদীটির গতিপথ ফেনীর সদর, ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ৫৬.০০ কিমি., প্রস্থ ২৮.০০ মিটার, গভীরতা ৪.০০ মিটার এবং অববাহিকা ৩০০.৬২ বর্গ কিমি.। নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রকল্পগুলো হলো পাউবো প্রকল্প এবং মুহুরী সেচ প্রকল্প। নদীর পাড়ে অবস্থিত পৌরসভা শহর ফুলগাজী ও পরশুরাম পৌরসভা।[২৬]

সিলোনিয়া নদী

ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে ডাকাতিয়া নদী কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার দক্ষিণে গুণবতী পরিকোট রেলসেতু অতিক্রম করে দুটি শাখায় বিভক্ত

www.pathagar.com

হয়েছে। ডাকাতিয়া নদীর যে শাখা ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া থানার সিন্দুরপুর দিয়ে প্রবেশ করেছে তা ছোটো ফেনী নদী নামে পরিচিত। এই নদী আবার কিছুটা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বিরলী ব্রিজের দক্ষিণে এসে দুই শাখায় বিভক্ত হয়। মূল শাখা পূর্বদিকে এসে আবার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। অপর শাখা পশ্চিমদিকে গিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মাংতারহাটের কাছে গিয়ে উভয় শাখা এক হয়ে কাজীরহাটের পশ্চিমপাশ দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। উভয় শাখাই ছোটো ফেনী নদী নামে পরিচিত। ছোটো ফেনী নদীর মোহনায় কাজীরহাট স্লুইস গেইট সেচ প্রকল্পের জন্য নির্মিত হয়েছে। ছোটো ফেনী নদীর দুই শাখার ওপর উল্লেখযোগ্য সেতু হচ্ছে বিরলী সেতু, ছিলোনিয়া সেতু, মাতুভূঁইয়া সেতু এবং কুঠিরহাট সেতু।

ফেনী জেলার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদী ছাড়াও কয়েকটি সংযোগ খাল রয়েছে, যেগুলো সাধারণত সেচকাজে ব্যবহৃত হয়। তবে বর্ষাকালে এসব খাল দিয়ে নৌকা চলাচল করে।

সোনাগাজী মুহুরী সেচ প্রকল্প

১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে শুরু হয়ে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সেচ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

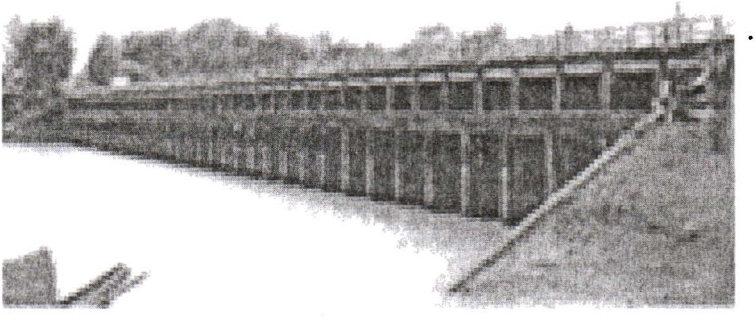

সোনাগাজী মুহুরী সেচ প্রকল্প

ফেনী নদী, মুহুরী নদী এবং কালিদাস-পাহালিয়া নদীর সম্মিলিত প্রবাহকে আড়ি বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ৪০ ফোর্ট বিশিষ্ট একটি বৃহদায়কার পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী, সোনাগাজী এবং

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার কিয়দংশ এলাকায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার প্রকোপ কমানো ও আমন ফসলের অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল মুহুরী সেচ প্রকল্প। সিডা, ইইসি, বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তায় জাপানের সুমুজ কোম্পানি ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেচ প্রকল্প নির্মাণ করে। এর ফলে ২০,১৯৪ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা এবং ২৭,১২৫ হেক্টর এলাকা সম্পূরক সেচ সুবিধার আওতায় আসে। মুহুরী সেচ প্রকল্পকে ঘিরে গত আড়াই দশকে গড়ে ওঠে বিনোদন ও পিকনিক স্পট। শীত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে ভ্রমণ পিপাসু লোক এবং পর্যটক বেড়াতে আসে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মুহুরী রেগুলেটরের চারদিকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা কৃত্রিম জলরাশি, বনায়ন, মাছের অভয়ারণ্য, পাখির কলকাকলি, বাঁধের দুপাশে নীচ থেকে পাথর দিয়ে বাঁধানো এবং উপরদিকে দূর্বাঘাসের পরিপাটি বিছানা। মুহুরীর জলরাশিতে নৌভ্রমণের সময় খুব কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস এবং প্রায় ৫০ জাতের হাজার হাজার পাখির দেখা পাওয়া যায়।[২৭]

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা ব্যবস্থায় ফেনী জেলার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ফেনীতে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তনে ১৮৮৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর। কবি নবীন চন্দ্র সেন তখন ফেনীর মহকুমা হাকিম। তাঁকে ফেনীতে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তনের অগ্রদূত বলা চলে। তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৮৮৬ সালে মহকুমা শহরের প্রথম এনট্রান্স স্কুল (আধুনিক ফেনী পাইলট স্কুল) স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে এটি ছিল মাইনর স্কুল। এ স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফেনীর প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে এটা অল্প দিনের মধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। ১৯১০ সালে ফেনী হাই স্কুলের দোতলা ভবন নির্মিত হয়। একই বছর শহরে নোয়াখালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নীর নামানুসারে 'সরলা বালিকা বিদ্যালয়' চালু হয়। এটি ফেনীর প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৩২-৩৩ সালে এটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়।

শহরের বাইরে ফেনীর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মঙ্গলকান্দি, ছাগলনাইয়া ও আমিরাবাদ হাই স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এগুলো ছিল ফেনীর উচ্চ বিদ্যালয়। মঙ্গলকান্দি বক্সী পরিবারের প্রদত্ত ভূমিতে ১৯১৪ সালে 'মঙ্গলকান্দি হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খগেন্দ্র মজুমদার ছিলেন এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টার। বাঁশপাড়া সাহা পরিবারের জয় কুমার সাহা, স্থানীয় শিক্ষাবিদ নিশি কান্ত মজুমদার, সমাজসেবী বি.আর. মজুমদার প্রমুখের উদ্যোগে ১৯১৫ সালে 'ছাগলনাইয়া হাই স্কুল' চালু হয়। আদিতে এটা ছিল একটি মাইনর স্কুল। ছাগলনাইয়া হাই স্কুল হচ্ছে ছাগলনাইয়া-পরশুরাম এলাকার সর্বাধিক প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফেনীর দক্ষিণে 'আমিরাবাদ হাই স্কুল' পত্তনে জমিদার লাহা পরিবার বিশেষ আর্থিক সাহায্য ও ভূমিদান করেছিল। ১৯১৭ সালে স্কুলটি চালু হয়েছিল। ১৯১৬ সালে পাঁচগাছিয়াতে মহকুমা হাকিম এ. জে. খানের নামানুসারে একটি মাইনর স্কুল চালু হয়।

www.pathagar.com

১৯০৬ সালে মুন্সীর হাটে এবং ১৯১২ সালে দাগনভূঁইয়াতে মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যে উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীতে ভরে উঠে এবং আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখে।

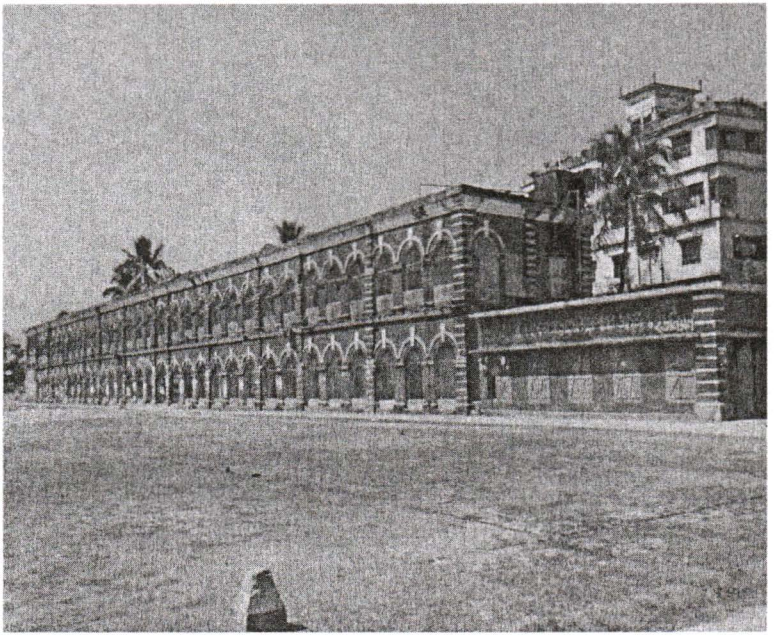

ফেনী পাইলট স্কুল

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে 'ফেনী কলেজ' একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২২ সালে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণে চট্টগ্রাম কলেজ ও উত্তরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জনপদের এ কলেজটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফেনী কলেজ স্থাপনের আগে এ অঞ্চলের অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ও কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে যেতেন। কিন্তু ফেনীতে নতুন কলেজ স্থাপনের ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে গত শতাব্দীর তিরিশের দশক ফেনীর ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২৭ সালে ফুলগাজীতে 'ফুলগাজী হাই স্কুল' চালু হয়। ফেনী শহরের 'জি এ একাডেমী' ১৯৩২-৩৩ সালে চালু হয়েছিল। এ শিক্ষালয়ের স্থপতি ও উদ্যোক্তা গিরিশ চন্দ্র মালাকার ও অক্ষয় কুমার মজুমদারের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী জি এ একাডেমীর নামকরণ হয়েছিল। তাছাড়া ফেনী শহরের 'বারিক মিয়া হাই স্কুল' একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটি 'সেন্ট্রাল হাই স্কুল' নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

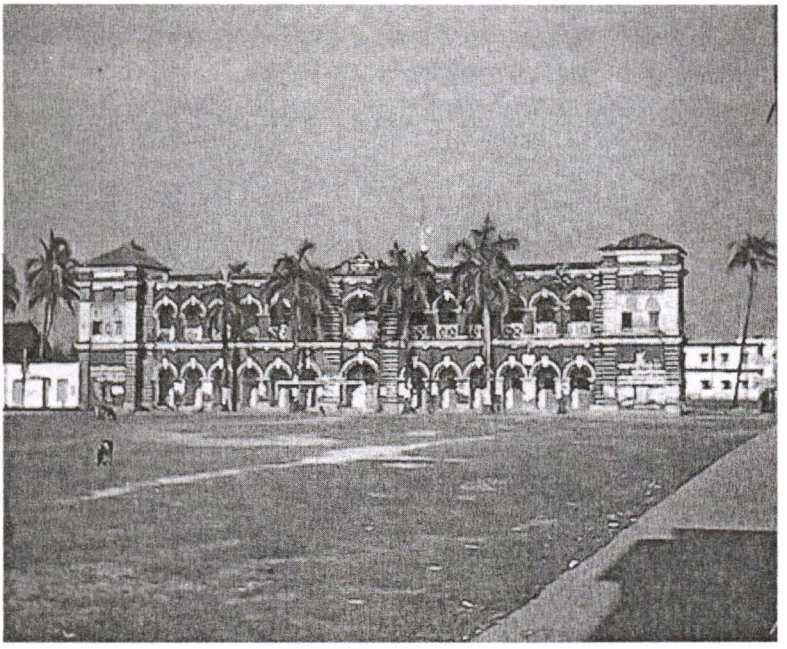

ফেনী কলেজ

ছাগলনাইয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'করৈয়া হাই স্কুল'। ১৯৩২-৩৩ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুল হিসেবে চালু হয়েছিল। মুন্সীর হাটের খান সাহেব আহমেদ আযম চৌধুরী তাঁর মরহুম পিতা আলী আযমের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯০৬ সালে একটি মাইনর স্কুল পত্তন করেন। অতঃপর এটি স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের প্রচেষ্টায় হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৩৪ সালে খণ্ডলের দানবীর চন্দ্রনাথ বৈদ্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিবারণ চন্দ্র এম.এ (প্রতিষ্ঠাতা হেড মাস্টার) প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'খণ্ডল হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহ্যবাহী ফেনী কলেজ ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে রয়েছে ফেনী মহিলা কলেজ, ছাগলনাইয়া কলেজ, পরশুরাম কলেজ, ফুলগাজী কলেজ, হাজী মনির আহমেদ কলেজ (জি.এম.হাট), সোনাগাজী কলেজ, দাগনভূঁইয়া ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ, শেখ শহীদুল ইসলাম কলেজ (বেক্তারমুন্সী) ইত্যাদি।[২৮]

বর্তমানে (২০১১) ফেনীতে সাক্ষরতার হার ৫৯%, ডিগ্রি কলেজ : ১১টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ : ১০টি, গার্লস ক্যাডেট কলেজ : ১টি, পলিটেকনিক : ১টি, কম্পিউটার ইনস্টিটিউট : ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৫৫টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৯টি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫২৮টি।

www.pathagar.com

ছ. হাটবাজার

ফেনী সদর

ভূঁইয়ারহাট (মোটবী), লস্করহাট, ফাজিলপুর বাজার, কালিদহ বাজার, পশ্চিম ছিলোনিয়া বাজার, পাকিস্তান বাজার (বর্তমান বাংলা বাজার), ছনুয়া বাজার, লেমুয়া বাজার, ধলিয়া বাজার, পাঁচগাছিয়া বাজার, তেমুহনী বাজার, বালুয়া চৌমুহনী বাজার, কৃষ্ণ মন্দার হাট, আফতাব বিবির হাট, বালিগাঁও, ভোরবাজার, বিরলী বাজার, লক্ষ্মীয়ারা বাজার, শর্শাদী বাজার, মোহাম্মদ আলী বাজার, আমতলী বাজার, রানির হাট ইত্যাদি।

ছাগলনাইয়া

শুভপুর বাজার, দারোগার হাট, করৈয়া বাজার, জঙ্গলমিয়া বাজার, জমাদ্দার বাজার, মৃধার হাট, জিনারহাট, চাঁদগাজী বাজার ও মনুর হাট, পানুয়াঘাট বাজার ইত্যাদি।

ফুলগাজী

জি এম হাট, পুরান মুন্সিরহাট, নতুন মুন্সিরহাট, কালিরহাট, ফুলগাজী বাজার ইত্যাদি।

পরশুরাম

পরশুরাম বাজার, বক্স মাহমুদ, চিথলিয়া বাজার, শুভারবাজার, শালধর বাজার, বিলোনিয়া রেলস্টেশন, গুতুমা চৌধুরী বাজার, অলকা কালির বাজার, রাজশপুর বাজার, খণ্ডল বাজার ইত্যাদি।

সোনাগাজী

কুঠিরহাট, বক্তারমুনশি বাজার, মঙ্গলকান্দি, ওলামা বাজার, সওদাগর হাট, ভৈরব চৌধুরী বাজার, মনগাজী বাজার, সোনাগাজী বাজার, আমিরাবাদ বাজার, নবাবপুর, ভোরবাজার, কাজীর হাট, নাড় মিয়ার হাট, বাঘের হাট, করামিয়া হাট, মুতিগঞ্জ বাজার, কাশ্মির বাজার ইত্যাদি।

দাগনভূঁইয়া

দরবেশের হাট, কোরশ মুন্সিবাজার, রাজাপুর বাজার, সিন্দুরপুর বাজার, ছিলোনিয়া বাজার, বেকের বাজার, দুধমুখা বাজার, মাতুভূঁইয়া বাজার, দাগনভূঁইয়া বাজার, তুলাতলী বাজার, ফাজিলের ঘাট বাজার, বৈরাগীর হাট, আমুমিয়া হাট, গজারিয়া বাজার, মৃদ্ধার হাট, এতিমখানা বাজার, কবিরের হাট ইত্যাদি।

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

নোয়াখালীর আদি জনপদের নাম ভুলুয়া। ঐতিহাসিকদের মতে নিম্নগঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত ভুলুয়া ছিল একটি প্রাচীন বন্দর। চীনের পর্যটক ফা হিয়েন ভুলুয়া বন্দরের খ্যাতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাগরের ভাঙাগড়ার কারণে সে প্রাচীন জনপদ বিলীন হয়ে গেছে।[২৯]

www.pathagar.com

ফেনীর চম্পকনগরে ছিল প্রাচীন চাকমাদের রাজ্যপাট। নোয়াখালীর উত্তরে কুমিল্লা অঞ্চল ছিল প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী। ফেনীর উত্তরে দেউলবাদী গ্রামে সপ্তম শতাব্দীর সমতট রাজ্যের খড়্গ বংশীয় রানি প্রভাবতী দেবীর নাম উৎকীর্ণ একটি 'সর্বাণী' মূর্তি পাওয়া গেছে।

ফেনী শহরের অদূরে লালমাটির টিলা বা পোড়ামাটির টিলাকে প্রাচীন বন্দর ও রাজ্যপাটের ধ্বংসাবশেষ বলে ধারণা করা হয়। এর আদি নাম ছিল রোহিতাগিরি। ফেনীর উত্তরে বাঘাউড়া মৌজাতে একটি বিষ্ণুমূর্তি এবং নারায়ণপুরে একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো পাল বংশীয় রাজা মহীপালের সময়কার বলে ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন। ফেনীতে রয়েছে মহীপাল নামে জনপদ ও মহীপাল দিঘি।[৩০]

ফেনী-কুমিল্লা মহাসড়কের পাশে নোয়াপাড়া গ্রামে একটি প্রাচীন ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটাকে কেউ কেউ সপ্তম শতাব্দীর একটা বিহারের স্মৃতিচিহ্ন বলে মনে করেন।[৩১]

জগন্নাথ কালী মন্দির

এটি ছাগলনাইয়া উপজেলায় অবস্থিত। শমসের গাজী তার বাল্যকালের লালনকর্তা জগন্নাথ সেনের স্মৃতিতে এ মন্দির ও কালী মূর্তি নির্মাণ করেন।[৩২]

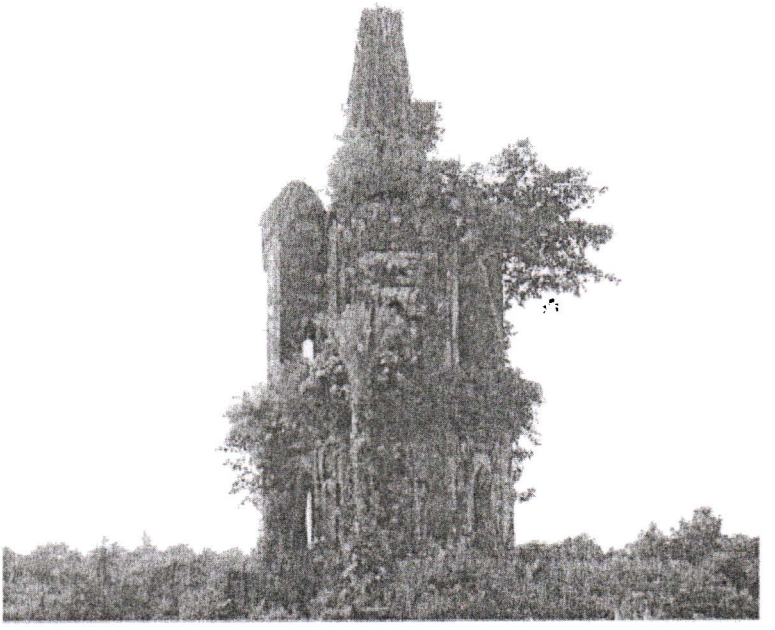

জগন্নাথ কালী মন্দির

www.pathagar.com

গান্ধী আশ্রম

নতুন মুন্সিহাট বাজারে (সাবেক বীরেন্দ্রগঞ্জ বাজার) অবস্থিত গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট-এর একটি টিন সেড ঘর আছে। ঘরের ভেতর প্রশিক্ষণের সরঞ্জামাদি সংরক্ষিত আছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবদ্দশায় ১৯২১ সালের ৩১ আগস্ট ফেনীতে আগমন করেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে সভা করেন। ঐদিন ফুলগাজী উপজেলার নতুন মুন্সিহাট-এর খাদি প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় তিনি সশরীরে বর্তমান আশ্রমের স্থলে ছিলেন।[৩৩]

শিলুয়ার শিলামূর্তি

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ফেনী শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে শিলুয়া নামক গ্রামে একটি অতি প্রাচীন স্থান রয়েছে। এখানে একটি অনুচ্চ, সমতল ঢিবি আছে। সে ঢিবির উপরে একটি প্রাচীন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মূর্তিটির একটি স্তম্ভমূল (pedastal) আছে। প্রস্তর নির্মিত এই প্যাডেস্টেলের উপরে মূর্তিটির পাদদেশের অতি সামান্য অংশই বর্তমানে টিকে আছে। বাকি অংশের কোনো সন্ধান বহুকাল আগে থেকেই পাওয়া যায় না। মূর্তিটির পাদদেশের এই অংশটুকু থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, এটি ছিল একটি বিরাট আকারের মূর্তি।

শিলামূর্তির গায়ে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে প্রচলিত ব্রাহ্মী হরফের লিপি থেকে এখানে আর্য সভ্যতা বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমল থেকে এ প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নটি প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৪]

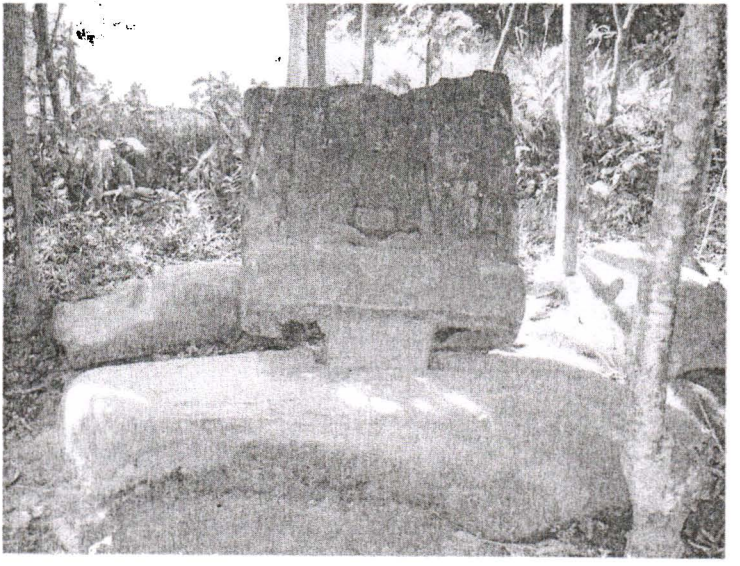

শিলুয়া গ্রামে শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ

www.pathagar.com

চাঁদগাজী মসজিদ

চাঁদগাজী ফেনীর পূর্বদিকে আধুনিক ছাগলনাইয়া ও ত্রিপুরা সীমান্তে একটি বহুল পরিচিত জনপদ। মোগল আমলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন চাঁদগাজী ভূঞা। তাঁর নামানুসারে চাঁদগাজী বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাঁদগাজী বাজারের নিকটে মাটিয়াগোধা গ্রামে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদগাজী ভূঞা মসজিদ। মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী চুন, সুড়কি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দ্বারা তৈরি এ মসজিদের দেয়ালগুলো বেশ চওড়া। মসজিদের ছাদের উপর রয়েছে তিনটি সুদৃশ্য গম্বুজ। মসজিদের সামনে একটি কালো পাথরের নামফলকে এ মসজিদের নির্মাণকাল ১১২২ হিজরি উল্লিখিত আছে। গম্বুজ ও প্রবেশ পথের নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে কুমিল্লা শহরের সুজা বাদশা মসজিদের মিল রয়েছে। চাঁদগাজী ভূঞা ছিলেন বাংলার বারভূঞাদের কোনো এক বংশের উত্তরসূরী। অন্য একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ছিলেন একজন সাধক। ধর্মপ্রাণ মানুষ এই মসজিদের উদ্দেশ্যে 'মানত' করেন। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ।[৩৫]

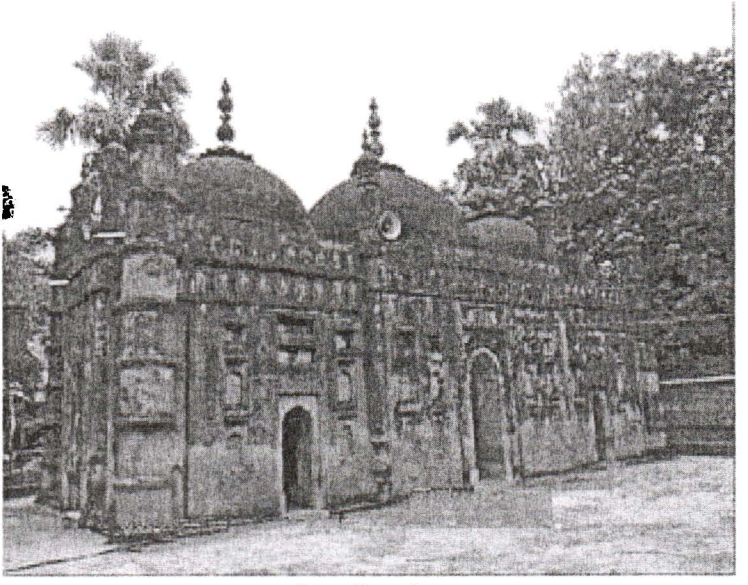

চাঁদগাজী মসজিদ

শর্শাদী গ্রামের প্রাচীন মসজিদ

ফেনী জেলার শর্শাদী গ্রামে সুলতানি আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। ৩ দরজা ও ৩ মিহরাব বিশিষ্ট মসজিদের বাঁকানো প্যারাপোটের নিচে আছে জোড়া কার্নিশ এবং তাও বাঁকানোভাবে নির্মিত। ভিতরের দুটি স্তম্ভ এবং চারপাশে দেয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে ৬টি ছোটো গম্বুজ। গম্বুজগুলি সুলতানি আমলের গম্বুজের মত। চারকোণে আছে চারটি মিনার।[৩৬]

www.pathagar.com

শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবী মন্দির

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়ষী ভূবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা বগলা সিদ্ধ
বিদ্যাশ্ব মাঁতঙ্গী কমলাত্মিকা এতাদশ মহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী শ্রী কালী মাতার মহামহাবিদ্যার অন্যতম শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর বিগ্রহ ফেনী জেলার পরশুরাম থানাসদরস্থ পরশুরাম বাজারে প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও এলাকায় লোকমুখে বহু কিংবদন্তি এবং কথার প্রচলন রয়েছে। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে এই এলাকাধীন বাউর খুমা প্রকাশ দুবলাচাঁদ গ্রামে বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত এবং পরমধার্মিক শ্রীযুক্ত রাম সুন্দর ভট্টাচার্য্যের বাস ছিল। কথিত আছে যে, তিনি একবার এই মর্মে স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যে, বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মাঁতঙ্গীছড়া কালক্রমে মতাইছড়া নামক স্থানে শ্রী শ্রী মায়ের বর্তমান বিগ্রহটি উদ্ধার করে পরশুরাম এলাকায় স্থাপন করার জন্য। সেকালে মাঁতঙ্গীছড়া বা মতাইছড়া নাম প্রচলিত ছিল না। তিনি স্বপ্নযোগে এমন নির্দেশপ্রাপ্ত হন যে, বর্তমান পরশুরাম থেকে ৪০/৪৫ কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চলে নদী পথে গভীর অরণ্যে মুহুরী নদীর একটি বাঁকে বালুচরে বিগ্রহটি রয়েছে। শ্রীযুক্ত রামসুন্দর ভট্টাচার্য্য এরূপ একটি স্থানের চিত্র স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্নযোগে যে স্থানের দৃশ্য দেখেছেন তার অবস্থান গভীর অরণ্যের মধ্যে। সেকালে ঐ অঞ্চল ছিল লোকালয় থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে। সেখানে সচরাচর লোক চলাচল ছিল না।

পরশুরাম এলাকার নাথ সম্প্রদায়ের ২৫/৩০ জন মানুষ নদী সন্নিকটে অবস্থিত বিভিন্ন ছরাতে মত্তাক (পাটি পাতা নামে পরিচিত এক জাতীয় গাছ যা দ্বারা পাটি তৈরি করা হয়) সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ১৫/২০ দিনের জন্য নদীপথে গভীর অরণ্য মধ্যে দল বেঁধে প্রবেশ করে। তারা মত্তাক সংগ্রহ করে ১৫/২০ দিন পর ফিরে আসে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মত্তাক সংগ্রহকারীদের কাছে স্বপ্নে দেখা স্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা অরণ্য মধ্যে ঐরূপ একটি স্থান তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে মর্মে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অবহিত করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন মত্তাক সংগ্রহকারীদেরকে স্বপ্নে দেখা মতে নদীতীরে ঐ বালুচরে কোনো বিগ্রহ রয়েছে কি-না খোঁজ করে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। মত্তাক সংগ্রহকারীরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বর্ণিত স্থানে উপস্থিত হয়ে বালিরাশির নিচে শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর বিগ্রহ খুঁজে পান। কিন্তু ২০/১৫ জন মত্তাক সংগ্রহকারী অনেক চেষ্টা করেও ঐ পাথরের বিগ্রহটি এতটুকু নড়াতে সক্ষম হন নাই। মত্তাক সংগ্রহকারীগণ দেশে ফিরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিস্তারিত অবগত করে বিগ্রহের বর্ণনা করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিভাবে বিগ্রহ পরশুরাম আনয়ন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি আবারো স্বপ্নযোগে এই মর্মে আদিষ্ট হন যে তিনি স্বয়ং গেলে শ্রী শ্রী মাঁতঙ্গী দেবী পরশুরাম আসবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মত্তাক সংগ্রহকারীদের সঙ্গে নিয়ে মতাইছড়া উপস্থিত হয়ে শ্রী শ্রী মায়ের বিগ্রহ স্পর্শ করলে ৮/১০ জন মত্তাক সংগ্রহকারীর চেষ্টাতেই বিগ্রহ নৌকায় উঠাতে সক্ষম হন। এই ঘটনায় সবাই আশ্চর্য হন। যে স্থানে শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর পাথরের মূর্তিটি পাওয়া যায় সে স্থানটি প্রথমত মাঁতঙ্গীছড়া এবং পরবর্তীকালে মতাইছড়া নামে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

এখন যেখানে পরশুরাম ডাকবাংলো অবস্থিত সেইখানে সর্বপ্রথম শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। তখন ডাকবাংলোয় পরশুরাম বাজার বসতো। মুহুরী নদীও তখন ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে এবং বর্তমান পরশুরাম বাজারের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হতো। কালক্রমে মুহুরী নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ বর্তমান পরশুরাম ডাকবাংলোতে শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর সেবা ও পূজা চলতে থাকাবস্থায় বর্তমান পরশুরাম বাজারের উত্তর প্রান্তে নদীর ধারে শ্রী শ্রী মায়ের বিগ্রহ মন্দির স্থাপন করা হয়। বর্তমান স্থানে মন্দির স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই পরশুরাম বাজার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ডাকবাংলো থেকে বাজার বর্তমান স্থানে চলে আসে।

শ্রী রাম সুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্দির স্থাপনপূর্বক শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর সেবা ও পূজা আরম্ভ করেন প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে। ক্রমান্বয়ে শ্রী রাম সুন্দর ভট্টাচার্য্যের সর্বশেষ বংশধর শ্রী রাম রাম ন্যায়রত্ন সেবা ও পূজা পরিচালনা করা অবস্থায় তৎভাগ্নিয় শ্রী অন্নদা চরণ চক্রবর্তীকে মন্দিরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। শ্রী অন্নদা চরণ চক্রবর্তী মহাশয় দেশ বিভাগের পর শ্রী সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তীকে মন্দিরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। শ্রী সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী মন্দিরের দায়িত্বসহ শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবীর সেবা ও পূজার দায়-দায়িত্ব শ্রী অমূল্য চরণ চক্রবর্তী মহাশয়কে অর্পণ করেন। এরপর অমূল্য চরণ চক্রবর্তীর পুত্র সাধন চক্রবর্তী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অদ্যাবধি তা পালন করে আসছেন।

শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবী মন্দির

www.pathagar.com

পূর্বে এই মন্দির বাঁশের বেড়ার দেয়ালসহ চৌচালা টিন দ্বারা নির্মিত ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তাসহ এলাকার ভক্তপ্রাণ নরনারীর সক্রিয় সহযোগিতায় মন্দিরের ভিটিসহ দেয়াল পাকা করা হয়েছে। চারদিকের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম দিকের সীমানা প্রাচীর পাকা করা হয়েছে। এই মন্দিরে দুই বেলা নিয়মিত পূজা-অর্চনা করা হয়। মন্দিরে প্রত্যহ অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে। প্রতি বৎসর এই মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব, শ্যামা পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী পূজা, জগন্নাথ দেবের পূজা ও ধর্মসভাসহ ষোল প্রহর নামযজ্ঞ ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৩৭]

পাগলা মিঞাঁর মাজার

দরবেশ পাগলা মিঞাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আমীর উদ্দিন (রঃ)। ১৮২৩ সালে ফাজিলপুর ছনুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৮৮৭ সালে মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

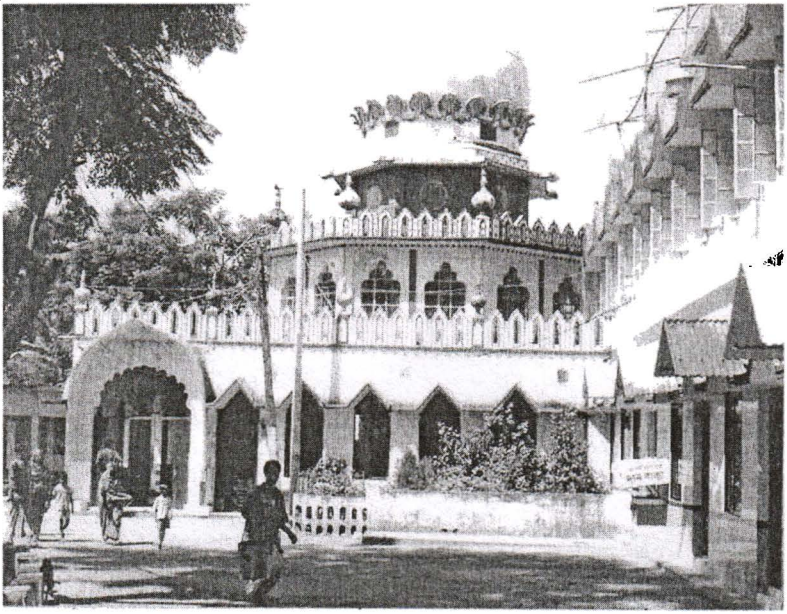

পাগলা মিঞাঁর মাজার

তাঁর মাজারটি ফেনী শহরের তাকিয়া রোডে ফেনী বড়ো বাজার সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার (তাঁর জন্মদিনে) তাঁর মাজারে ওরস হয়। সেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। তিনি আধুনিক ফেনী জনপদের মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর অপরিসীম প্রভাব রেখে গেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে ফেনী অঞ্চলে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

এখনো প্রতিদিন তাঁর মাজারে মানুষ ফাতেহা পাঠ করে, জেয়ারত করে এবং মানত করে।[৩৮]

বাঘা মামার মাজার

বাঘা মামার আসল নাম আব্দুল খালেক। লোকে বলে বাঘা মামা। এই বাঘা মামার মাজার পরশুরাম উপজেলার বিলোনিয়া এলাকায় অবস্থিত। মাজারের খাদেম মোহাম্মদ আবুল খায়ের বলেন, "উনার জন্ম ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনিয়া জেলার মতাইল থানায় কাটাবিল। উনি মজজুর ছিলেন। লাল লুংগি পরতেন। মাজার ওপরে রশি বাঁধা থাকত। উদিলা বা খলি গা। কথাবার্তা কম বলতেন। সবসময় কান্নাকাটি করতেন। সকলের দেওয়া খানা খেতেন না, যারটা মর্জি হতো খেতেন। ফোটকা মরিচ, তেতই, কাগজি বেশি খেতেন। চা খেতেন বেশি। বেলা বিস্কুট ঢেলে দিতেন চায়ের মধ্যে। মামু ইন্ডিয়া বিলোনিয়া মসজিদে থাকতেন। জিকির করতেন। ভক্তরা আসি বেপারি বাড়িতে জায়গা দেখাই দে। মামু এখানে থাইকব কইছে। ইন্ডিয়ারতুন আসি মামু আমাদের বাড়িতে ১৭ দিন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি বলতেন, পইখের গণ্ডগোল ঠুস আরম্ভ হইছে। উনার ওরস হয় ফেব্রুয়ারি মাসের ৮/৯ তারিখ। জুন মাস ইন্তেকালের তারিখ। ১৯৯০ সালের দিকে হজল বেপারি বাড়িতে উনার ইন্তেকাল হয়।"

বাঘা মামার মাজার

www.pathagar.com

তিনি আরো জানান, "নিয়ত করে মানুষ এখানে আসে। হিন্দু মুসলমান সবাই আসেন। মহিলারা বেশি আসেন। সন্তান, রোগমুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করেন মামুর নিকট।"[৩৯]

ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ভাষাশহিদ আবদুস সালাম

ভাষাশহিদ আবদুস সালাম ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ সালে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার লক্ষ্মণপুর (বর্তমানে সালাম নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফাজিল মিয়া এবং মাতার নাম দৌলতের নেছা। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভে আবদুস সালাম যোগ দেন।

তাঁর জ্যেঠতুতো ভাই মাহমুদুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী সালাম ছিলেন একহারা লম্বাটে গড়নের। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা। আবদুস সালামের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় লক্ষ্মণপুরের কৃষ্ণরামপুর প্রাইমারি স্কুলে। লেখাপড়ায় তিনি ভালোই ছিলেন। পাশাপাশি খেলাধুলায়ও আগ্রহী ছিলেন। স্কুলের বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর সালাম ভর্তি হন আতাতুর্ক হাই স্কুলে। বর্তমানে স্কুলটির নাম দাগনভূঁইয়া মডেল হাই স্কুল। সালামের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। তিনি নিয়মিত হেঁটে স্কুলে যেতেন এবং এবং ক্লাশে ফাঁকি দিতেন না। তাই শিক্ষকদেরও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু দশম শ্রেণিতে ওঠার পর আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

সালাম শান্ত স্বভাবের এবং দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন। লেখাপড়া শেষে নিজে রোজগার করে সংসারের দৈন্যদশা লাঘবের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু অভাবের কারণে পড়াশোনা করতে না পারায় তাঁর মনে খুব কষ্ট ছিল। তাই বাড়ির কাউকে না জানিয়ে একদিন গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কলকাতা চলে যান জীবিকার সন্ধানে।

সেখানে তাঁর জ্যেঠতুতো বোনের স্বামী আবদুল কাদের বাস করতেন মোটিয়াবুরুজ এলাকায় এবং কলকাতা বন্দরে কাজ করতেন। সালাম তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। জানা যায় যে, আবদুল কাদের তাঁকে একটি কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল করিমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সালাম প্রায় পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাতেন। তাঁর ছোটো বোন বলকিয়তের নেসার স্বামী সানু মিয়াও তাঁর সঙ্গে কলকাতা পোর্টে কাজ করতেন এবং তাঁরা একই জায়গায় থাকতেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের পরপরই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সালামকে চলে আসতে হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর তিনি ঢাকায় এসে চাকরির চেষ্টা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মিন্টো রোডে অবস্থিত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প দপ্তরে রেকর্ড কিপারের পদে যোগ দেন। জানায় যায়, চাকরি পেয়ে সালাম নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাতেন এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বাড়িতে গেলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি ঢাকার আজিমপুর অঞ্চলে একটি মেসে থাকতেন। এটি নীলক্ষেত ব্যারাক নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন যখন ব্যাপকভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের পক্ষ থেকে তখন আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সমাবেশ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আবদুস সালাম

ভাষা আন্দোলনে যোগদান এবং শাহাদাত বরণ

সালামের প্রতিবেশী নূর আহমদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সালাম কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে যান এবং ছুটি কাটিয়ে আবার ঢাকায় তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসেন। সেই তাঁর শেষবারের মতো বাড়ি যাওয়া। এদিকে তখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকা উত্তাল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশপ্রেমিক বাঙালি ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনের রাস্তায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেদিন ছাত্রদের বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন সর্বস্তরের মানুষ। অফিস আদালত বর্জন করে সবাই যোগ দেন বিক্ষোভ-মিছিলে। সেই মিছিলে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতার সারিতে শিল্প দপ্তরের রেকর্ড কিপার আবদুস সালামও ছিলেন। সেদিন আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ বর্বরোচিতভাবে গুলিবর্ষণ করে। আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, রফিকউদ্দীন আহমদসহ জানা-অজানা অনেকের সঙ্গে সালামও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। বিকেল সাড়ে তিনটায় মেডিকেল কলেজের সামনে সালাম গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৯৫২ সালের ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। তাঁর শহিদ স্মৃতি পরবর্তীকালে বাঙালির জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রতকরণে দিশারি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

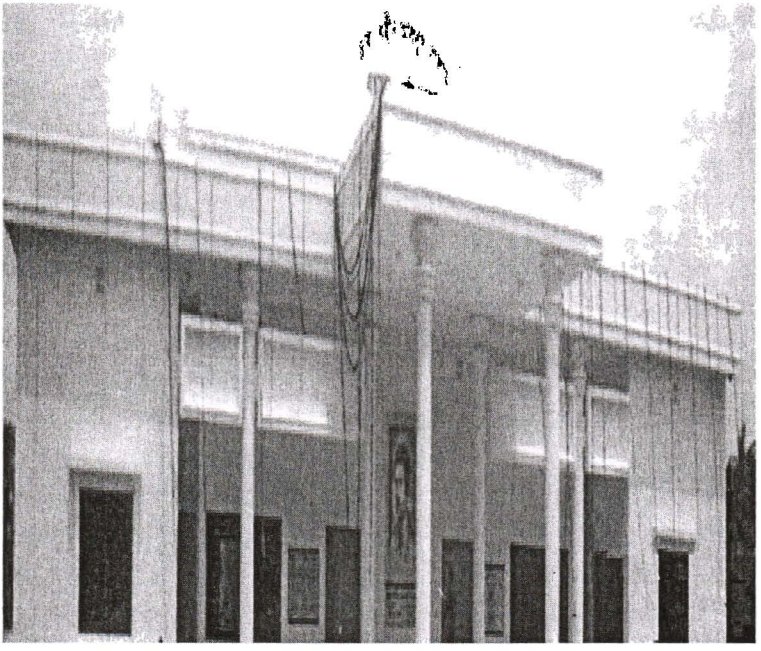

ভাষাশহিদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর

ভাষাশহিদ আবদুস সালাম-এর স্মৃতি রক্ষায় স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২ জৈষ্ঠ্য ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ মে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ ফেনী

www.pathagar.com

জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার সালাম নগরে "ভাষা শহীদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর" প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪০]

আধুনিক ফেনীর স্থপতি কবি নবীন চন্দ্র সেন

কবি নবীন চন্দ্র সেন ১৮৪৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম স্কুল থেকে ১৮৬৩-তে প্রবেশিকা, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৫-তে এফ.এ. এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৬৮-তে বি.এ. পাস করেন। কর্মজীবনের প্রথমে কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৬৮-তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে চাকরি লাভ করেন।[৪১]

ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠার প্রথম আট বছর অতিবাহিত হবার পর ১৮৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর কবি নবীন চন্দ্র সেন ফেনীর মহকুমা হাকিম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাকে নব প্রতিষ্ঠিত ফেনী মহকুমার যথার্থ স্থপতি বলা চলে। তাঁর গঠনমূলক কাজের জন্য অনেকে তাকে ফেনীর প্রথম মহকুমা হাকিম বলে ভুল করে থাকে। মহকুমা প্রতিষ্ঠাকালে কবি নবীন চন্দ্র সেন ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব। তাঁর একান্ত উদ্যোগের ফলে ফেনী মহকুমার পত্তন হয়েছিল এবং দিঘির পাড়ে স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ফেনীতে আগমন করেছিলেন।

কবি নবীন চন্দ্র সেন ফেনী মহকুমার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মহকুমা সদরে একটা বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে ফেনী শহর পত্তনের প্রাথমিক উপকরণ। জেলা বোর্ডের আর্থিক সাহায্যে মহকুমা হাকিম ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম পাশে কিছু জমি ক্রয় করেন। বাজারকে কেন্দ্র করে এখানে শহর পত্তন হতে থাকে।

ফেনী শহরের প্রধান আকর্ষণ প্রাচীন একটি দিঘি যেটি স্থানীয়ভাবে রাজাজীর দিঘি বা রাজারঝি দিঘি নামে পরিচিত। রাজাজীর দিঘির পাড়গুলো ছিল উঁচু ও জঙ্গলাকীর্ণ। কবি নবীন চন্দ্র সেনের উদ্যোগে পাড়গুলো কেটে নিচু ও প্রশস্ত করা হয়। কবি নিজেই রাজাজীর দিঘিকে শহরের প্রাণ ও শোভা বলে বর্ণনা করেছেন। দিঘির পাড়ের নির্মিত বাঁশের ঘর বা বাঁশের কুটির যে এমন সুন্দর হতে পারে তা ছিল মানুষের কল্পনাতীত। এসব ঘর-বাড়ি দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে ফেনীতে অনেক লোকের ভিড় হতো।

মহকুমা প্রতিষ্ঠার সময় ফেনী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাতায়াত ও পরিবহনের প্রধান ব্যবস্থা হিসেবে বর্ষাকালে নৌকা, সাম্পান, কলাগাছের ভেঙ্গুরা, পালকি ও গরুর গাড়িই ছিল একমাত্র বাহন। মহকুমা হাকিম নবীন চন্দ্র সেন ফেনী-সোনাগাজী এবং ফেনী ছাগলনাইয়া সড়ক গরুর গাড়ি চলার উপযোগী করে নির্মাণ ও সংস্কার করেন। তাঁকে ফেনীতে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অগ্রদূত বলা যায়। তাঁর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই ফেনী অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান চালু হতে থাকে। তাঁর অমর কীর্তি ফেনী এনট্রান্স স্কুল বা ফেনী হাই স্কুল।[৪২]

www.pathagar.com

নবীন চন্দ্র সেন ছাত্রাবস্থায় কবিতা রচনা করে প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক কবিতা সংকলন 'অবকাশ রঞ্জনী' (১৮৭১) নবীন চন্দ্র সেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) নামক ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) এই কাব্যত্রয়ীতে তাঁর কবি-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর আত্মজীবনী *আমার জীবন* একটি সুখপাঠ্য বই এবং তা এদেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি প্রামাণিক দলিল। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : *ক্লিওপেট্রা*, *ভানুমতী*, *প্রবাসের পত্র*, *খৃষ্ট* ও *অমিতাভ*, গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ। তিনি ২৩ জানুয়ারি ১৯০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৩]

সুফি ফকির ও দরবেশ পাগলা মিঞাঁ

আধুনিক ফেনীকে দরবেশ পাগলা মিঞাঁর দেশ বলা হয়। ফেনীর জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা এবং আধ্যাত্মিক দর্শন প্রচার ও প্রসারে তিনি অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। সুফি ফকির হিসেবে জীবিতকালে যেমন তাঁর আস্তানায় হাজার হাজার ভক্তের ভিড় হতো, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের শত বছর পরেও ফেনী শহরে অবস্থিত পাগলা মিঞাঁর মাজারে প্রতিদিন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য লোকের ভিড় হয়। সমাজসচেতন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এই ফকির আধুনিক ফেনী শহরের প্রতিষ্ঠায় এক অসাধারণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের কোনো কোনো সাধু, ফকির ও দরবেশের জীবনকাহিনি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এদের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে তৈরি হয়েছে অসংখ্য কাহিনি ও কিংবদন্তি। লোকমুখে এসব কাহিনি বংশপরম্পরায় প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু পাগলা মিঞাঁ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ফেনী অঞ্চলের মানুষের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁকে ফেনী শহরের আধ্যাত্মিক স্থপতি বলা যায়। সমকালীন মহকুমা প্রশাসক কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর স্মৃতিকথায় পাগলা মিঞাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

দরবেশ পাগলা মিঞাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ আমির উদ্দিন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ বশির উদ্দিন এবং মায়ের নাম সৈয়দা ময়মুনা খাতুন। ১২৩০ বঙ্গাব্দ তথা ১৮২৩ সালে ফাজিলপুর-ছনুয়া গ্রামে পাগলা মিঞাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত সৈয়দ কুতুবুল আলম (রঃ) ছিলেন সিলেটের আধ্যাত্মিক সাধক ফকির হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর অন্যতম সহযাত্রী।

গ্রাম্য মক্তবে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করার পর সৈয়দ আমির উদ্দিন তেরো/চৌদ্দ বছর বয়সে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু মাদ্রাসার গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতে অধিক পছন্দ

www.pathagar.com

করতেন। এক পর্যায়ে তিনি ঘর-বাড়ি লোকালয় ত্যাগ করেন। তিনি পাগলের বেশে বহুদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। অনেক সময় আপন মনে আবোল তাবোল কথাবার্তা বলতেন এবং অস্থিরভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটাছুটি করতেন।

প্রশাসনিক দফতর তথা মহকুমার শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও সামাজিক অশান্তি লেগেই ছিল। মানুষের জীবনে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। সমাজের এই পটভূমিতে ফেনীর জনপদে পাগলা মিঞাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চোর ডাকাতদের বাড়িতে চলে যেতেন এবং আস্তানা স্থাপন করতেন। যে বাড়িতে তিনি যেতেন সেখানে অসংখ্য মানুষ আসতো। ভক্তবৃন্দ প্রচুর উপঢৌকন, টাকা-পয়সা, খাদ্যদ্রব্য, কাপড় নিয়ে আসতেন। এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চোর ডাকাতরা ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে পাগলা মিঞাঁর ভক্ত হয়ে যান। তাঁকে নিয়ে আস্তানা তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

পাগলা মিঞাঁর ফেনীতে আগমন এবং বাজারের পাশে তাঁর দরগাহ স্থাপন ফেনীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ফেনীতে আসতে থাকে। ক্রেতা-বিক্রেতার সমাবেশের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। পাগলা মিঞাঁর আশীর্বাদপুষ্ট ফেনীর বহু ব্যবসায়ী অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। নবীন চন্দ্র সেন লিখেছেন, পাগলা মিঞাঁর ভক্ত ছাগলনাইয়ার বাঁশপাড়ার সাহাদের ছিল ক্ষুদ্র মুদী দোকানের ব্যবসা। পাগলা মিঞাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তারা এক পুরুষের মধ্যেই ফেনী অঞ্চলে বিরাট ধনী পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একদিন পাগলা মিঞাঁ ট্রাঙ্ক রোডে ছুটাছুটি করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ধর দড়ি টান, সাহাদের নৌকা ডুবে যাচ্ছে।" তিনি নিজেই রাস্তার উপর দড়ি টানার মত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলে উঠলেন—যা যা রক্ষা পেয়েছে। উপরোক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নবীন চন্দ্র সেন কয়েকদিন পর জানতে পারেন যে, বাঁশপাড়ার সাহাদের একখানা বাণিজ্যতরী সাগরে ঝটিকাগ্রস্থ হয়ে অল্পের জন্য অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিল।

ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ পাগলা মিঞাঁ আধুনিক ফেনী জনপদের মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর অপরিসীম প্রভাব রেখে গেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে ফেনী অঞ্চলে অসংখ্য কাহিনি এবং কিংবদন্তি চালু আছে। বর্তমানেও প্রতিদিন তাঁর মাজারে সব ধর্মের অসংখ্য নারী পুরুষের ভিড় হয়। মনস্কামনা পূরণের জন্য তারা 'মানত' করে।

ফেনী ও পার্শ্ববর্তী জনপদের মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী এই মহাপুরুষ মাত্র ৬৩ বছর বয়সে ১৮৮৭ সালে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) ইন্তেকাল করেন। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে (তাঁর জন্মদিন) ফেনী শহরে অবস্থিত তাঁর মাজারে ওরস হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ মাজারে সমবেত হন।

www.pathagar.com

শমসের গাজী

ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট ও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত কেচ্ছা-কাহিনি, কিংবদন্তি এবং গ্রামগঞ্জ, মসজিদ, মন্দির, দিঘির নামকরণের সঙ্গে শমসের গাজী ও তাঁর সমকালীন ইতিহাসের নানা তথ্য ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজা-মহারাজার নামে এত বেশি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, দিঘি নেই যা শমসের গাজীর নামে ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে।

আধুনিক ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণাঞ্চল পরগনা হিসেবে 'দক্ষিণশিক' নামে পরিচিত। এখানে শমসের গাজীর জন্ম এবং কর্মজীবনের সূচনা। কোনো কোনো লেখকের মতে আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফেনী নদী ও মুহুরী নদী বেষ্টিত নিজকুঞ্জরা মৌজায় (বর্তমানে গোপাল ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত) শমসের গাজীর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিল পীর মুহাম্মদ মতান্তরে পেয়ার মুহাম্মদ। শমসের গাজীর পৈতৃক পরিচয় ও পিতার আদি নিবাস সম্পর্কে কবি শেখ মনোহরের 'গাজীনামা' পুথিতে বলা হয়েছে—

'ওমরাবাদে ছিল বজরা কাছারী
ছিলেন আবদুল্লাহ খান তার অধিকারী
পীর মুহাম্মদ খান ছিলেন সোদর তাঁহান
বেদরাবাদে আসেন তেজী সেইস্থান।'

শমসের গাজীর সময়কালে এই অঞ্চলে অসংখ্য বড়ো বড়ো দিঘি খনন করা হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন দিঘি ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানেও যেসব দিঘি রয়েছে তা শমসের গাজীর সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সমাজসেবামূলক কাজ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

ছাগলনাইয়ার কৈয়্যারা গ্রামের কৈয়্যারা দিঘি এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দিঘি। তাঁর মায়ের নামানুসারে কৈয়্যারা দিঘি, কৈয়্যারা বাজার ও কৈয়্যারা গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। পুণ্যবতী এই মহিলার ইচ্ছানুসারে খননকৃত এই দিঘি স্বচ্ছ পানির জন্য বিশেষ খ্যাত।

পরশুরামের সাতকুচিয়া গ্রামে শমসের গাজী একটি বিশাল দিঘি খনন করেছিলেন। এই দিঘির পাড়ে তাঁর ভ্রাম্যমান দরবার বসত। তাঁর অমাত্যদের নামে বলভপুর গ্রামে আলীয়া গাজীর দিঘি, পূর্ব ছাগলনাইয়ার দেওয়ান আব্দুর রাজ্জাকের দিঘি, তাঁর কন্যা তনু বিবির নামে হরিপুরে তনু বিবির দিঘি, কুমিল্লার ফুলতলীতে মনু বিবির দিঘি, জগন্নাথ সোনাপুরে তাঁর কেল্লা ও আদি বসতির আশে পাশে বিরাট বিরাট দিঘি, গড় বা পরিখা শমসের গাজীর অমর কীর্তির নিদর্শন। তখনকার দিনে বড়ো বড়ো দিঘিতে সংরক্ষিত পানির সাহায্যে গ্রীষ্মকালে বা অনাবৃষ্টিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হতো।

শমসের গাজী রাজসম্মান লাভ করার পরও তাঁর বাল্যকালের আশ্রয়দাতা শ্রী জগন্নাথ সেন ও তাঁর স্ত্রী সোনা দেবীকে ভুলেন নি। রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে ফেনী নদীর তীরে যেখানে তিনি প্রধান কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেছিলেন সেই মৌজার

www.pathagar.com

নামকরণ করেছেন—'জগন্নাথ-সোনাপুর'। আগে ঐ এলাকা চম্পকনার মৌজার অংশ ছিল। তাঁর আশ্রয়দাতার স্মরণে তিনি শুভপুরে জগন্নাথ কালী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

শমসের গাজী ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি পারিবারিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশধরদের মুখে জানা যায়, তিনি নিজামপুরের কাঠগড় জমিদার দানিয়াল মুহাম্মদ চৌধুরীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের ফলে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ স্ত্রীর গর্ভে মনু বিবি ও তনু বিবি নামে দুই কন্যার জন্ম হয়। প্রাচীন পুথিসূত্রে জানা যায় যে, শমসের গাজীর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন তাঁর সামরিক উপদেষ্টা ছাদু পালোয়ানের বোন। এ স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি। গাজীর অপর এক স্ত্রীর নাম ছিল শিখা রানী। তিনি ছিলেন জয়পুর-মন্দিয়া নিবাসী মনু সরকারের কন্যা। শমসের গাজীর একমাত্র পুত্র নূর বক্স শিখা রানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শমসের গাজী স্থানীয় কৃষক-প্রজাদের সমর্থনে বলীয়ান হয়ে নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে বাংলার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে রৌশনাবাদ ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং বারো বছর প্রজাকল্যাণের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

শমসের গাজী বেশির ভাগ সময় থাকতেন রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে ফেনী নদী বেষ্টিত জগন্নাথ-সোনাপুরস্থ তাঁর প্রধান কেল্লা ও রাজপ্রাসাদে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে গাজীর কেল্লা আক্রমণ করে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার সময় গুলির আঘাতে শমসের গাজী আহত হন এবং শত্রুর হাতে বন্দি হন। শমসের গাজীর জীবনাবসান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। বিশিষ্ট লেখক এ এফ এম আবদুল জলিলের মতে শমসের গাজীকে ১৭৬৮ সালে হত্যা করা হয় (*পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ*)।[৪৪]

মুহাম্মদ আলী চৌধুরী

কোম্পানি রাজত্বের শুরুতে ইংরেজদের সীমাহীন জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে ফেনীর এক বীর সন্তান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন; তাঁর নাম মুহাম্মদ আলী চৌধুরী। তিনি ছিলেন দাঁদরা-এলাহাবাদ পরগণার বিখ্যাত জমিদার ও বিশিষ্ট সাধক পুরুষ আল্লামা ফাজেল মুহাম্মদ চৌধুরীর বংশধর। তাঁর পিতার নাম ছিল জমিদার ফতেহ মুহাম্মদ চৌধুরী। মুহাম্মদ আলী চৌধুরী ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ। তিনি ফেনী-নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারী কৃষক প্রজাদের উপর কোম্পানির আমলা ও দালালদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশেষে নবাব মীর কাশিম ১৭৬২ সালে মুহাম্মদ আলী চৌধুরীকে নবাবের প্রতিনিধি তথা নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ইংরেজ বেনিয়াদের নিকট থেকে বিগত কয়েক বছরের (জুলাই ১৭৫৭ সাল থেকে জুন ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত) বকেয়া শুল্ক ও অন্যান্য কর দাবি করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইংরেজ কুঠিয়ালদের আটক করতে থাকেন এবং তাদের কুঠিতে প্রাপ্ত মালামাল নবাবের নামে বাজেয়াপ্ত করতে থাকেন। কুঠিয়ালগণ দিশেহারা হয়ে

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের শরণাপন্ন হতে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ আলী তা উপেক্ষা করে এখানে নবাবের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হন।

জমিদার মুহাম্মদ আলী নিজের জমিদারি স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাশিম পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হলে মুহাম্মদ আলীর জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। ১৭৬৫ সালে দিল্লির বাদশার নিকট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি বা রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরও তিনি কোম্পানির রাজকোষে খাজনা প্রদানে অস্বীকার করেন। ফলে দাঁদরাস্থ তাঁর জমিদারি কোম্পানির 'খাসে' চলে যায়। সরকারি কাগজপত্রে তাঁর জমিদারি 'খাস' হয়ে গেলেও মুহম্মদ আলী বহুদিন স্বীয় এলাকার উপর প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন একজন প্রজাদরদী জমিদার। কোম্পানির রাজত্বের প্রথমদিকে বাংলাদেশে সংঘঠিত মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় জমিদার মুহাম্মদ আলী চৌধুরী স্থানীয় মানুষদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ উদারহস্তে দান করে দেন।

জমিদার মুহাম্মদ আলী আজীবন ইংরেজ কোম্পানির আমলা ও কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। স্থানীয় কৃষকদের কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও বহুদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অবশেষে তাঁর দেওয়ান নুর মুহাম্মদের পুত্র গাউস মুহাম্মদ ও ওয়াসেক মুহাম্মদ জমিদারি লাভের আশায় মুহাম্মদ আলী চৌধুরীকে ধরিয়ে দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার চলাকালে তিনি ১৭৯৩ সালে ইন্তেকাল করেন। কারো কারো মতে তিনি কোম্পানির বিচার মানতে অস্বীকার করে আত্মহত্যা করেছিলেন।

শর্শাদীর নিমতলিতে জমিদার মুহাম্মদ আলী চৌধুরী নির্মিত বসতবাড়ি এখনও রয়েছে। তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ বংশধর ছিল না। তাঁর বসতবাড়ির সামনে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা মসজিদ, তাঁর উদ্যোগে খননকৃত বিশাল একটি দিঘি এবং তাঁর নামে পরিচিত মুহাম্মদ আলী বাজার (ফেনী-কুমিল্লা সড়কের পাশে) এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।[৪৫]

কুকী বিতারক বিজয়ী বীর গুনাগাজী

কুকী বিতারক বিজয়ী বীর গুনাগাজী মজুমদার ১৭৮১ সালে দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। গুনাগাজী, মুনাগাজী ও রওশন গাজী এই তিন ভাই ফেনী শর্শাদী থেকে আসেন। পিতা জীবন গাজী শর্শাদী গ্রাম থেকে দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে আগত কুকী দস্যুদের উপর্যুপরি হামলা ও লুণ্ঠনে ছাগলনাইয়া-পরশুরাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা লুটতরাজ করতো, মানুষকে মেরে মৃতদেহ খেতো, নারীদের ওপর নির্যাতন চালাতো। কুকী দস্যুরা কোলাপাড়া গ্রাম আক্রমণ করতে এলে

www.pathagar.com

সে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি গুনাগাজী মজুমদার দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে কুকী দস্যুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। গুনাগাজী গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি ঢাল তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি তিনমাস যুদ্ধ করেন। ১০টি মৌজা থেকে কুকীদের তাড়িয়ে দেন। গ্রামগুলো হলো—কোলাপাড়া, গুতুমা, বাঁশপদুয়া, দুবলার চর, বাউরখুমা, বাউর পাথর, বেড়াবারিয়া, মুন্সির খিল, জমিয়ারগাঁও, বক্স মাহমুদ ও খাজুইরগা। দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ ইব্রাহিম মজুমদার (৮৫) গুনাগাজীর বীরত্ব সম্পর্কে একটি প্রচলিত গান উল্লেখ করেন। গানের কয়েকটি লাইন হচ্ছে—

গুনাগাজী আসল সাজি
সিপাহি সঙ্গে করি
তিরপা ঝুকি দৌড়াইল।
বন্দুক আওয়াজ করি।

দক্ষিণ কোলপাড়া গ্রামে গুনাগাজী মজুমদারের কবর রয়েছে। পাকা কবরের গায়ে গুনাগাজীর মৃত্যুর সন ১২৯২ বাংলা তথা ১৮৮৬-৮৭ সাল উল্লেখ আছে। ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি তলোয়ারের উপর গুনাগাজীর নাম অঙ্কিত আছে।[৪৬]

গুনাগাজীর সমাধির সামনে তাঁর কয়েকজন বংশধরের সাথে প্রধান সমন্বয়কারী

www.pathagar.com

আবদুল গোফরান, খানবাহাদুর

আবদুল গোফরান খানবাহাদুর ২৯ জানুয়ারি ১৮৮৮, ফেনী জেলার শর্শাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ব্যবসায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৬-তে নোয়াখালী আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২০-এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং নোয়াখালীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগের নোয়াখালী জেলা শাখার একাধিকবার সভাপতি হন। নোয়াখালী জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ৪ বার নির্বাচিত হন। ১৯৩৩-তে খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৬-এ বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ও ১৯৪৩-এ খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬-এ নোয়াখালীর দাঙ্গা নিরসনে ভূমিকা পালন এবং রামগঞ্জে মহাত্মা গান্ধীকে সার্বক্ষণিক সঙ্গদান। এলাকার অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ৯ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।[৪৭]

সেনাপতি নাথ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরশুরামের কৃতী সন্তান বাবু সেনাপতি নাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরশুরাম থানার অনন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিলোনিয়া বি কে স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেন। কলকাতার দমদম জেল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন বলে জানা যায়।

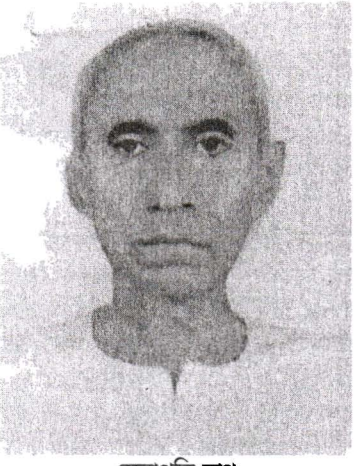

সেনাপতি নাথ

তিনি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন বিলোনিয়া শাখার সম্পাদক ছিলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ফণীভূষণ মজুমদার, পুলীন দে, বসরাজি মণ্ডল, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিং, খাজা আহমদ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী

www.pathagar.com

আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কুমিল্লা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং কলকাতা দমদম জেলে দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর কারাজীবন ভোগ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিলোনিয়া, পরশুরামে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। তিনি মুজাফফর ন্যাপের পরশুরাম থানার সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। তিনি পরশুরাম হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে অমলকান্তিনাথ বর্তমানে জীবিত। তিনি কৃষিকাজ করেন।[৪৮]

হামিদুল হক চৌধুরী

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী ফেনী জেলার রামনগর গ্রামে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অঙ্কে ডিসটিংশনসহ বি.এসসি. পাস করেন (১৯২৫)। ল' ডিগ্রি লাভের পর ১৯৩০-এ কলকাতা বারে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভারত পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের র‍্যাডক্লিফ কমিশনের (১৯৪৭) সদস্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯৪৯-এ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৫৩-তে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে কৃষক-শ্রমিক পার্টির গঠন এবং এ দলের সহসভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫৫-তে কৃষক-শ্রমিক পার্টির মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণ-পরিষদে সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) যুক্তফ্রন্ট-মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্রের খসড়া বিল প্রণয়ন ও গণ-পরিষদে তা পাস করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৫৮-র ১৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। একই বছর ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত এবং গ্রেফতার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এন. ডি. এফ.-১৯৬২)-এর অন্যতম সংগঠক এবং কোষাধ্যক্ষ (১৯৬৪-১৯৬৯)। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিরোধিতাকারীদের অন্যতম। ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক সংকট মীমাংসাকল্পে রাওয়ালপিণ্ডিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ ১৯৬৯) এন. ডি. এফ.-এর প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা পালন। ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) কিছু দিন পূর্বে ঢাকা ত্যাগ করে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। প্রায় আট বছর

www.pathagar.com

সে দেশে বাস। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মুজিব-সরকার কর্তৃক তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল (১৯৭২)। ১৯৭৮-এ তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তান থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এদেশে সংবাদপত্রকে শিল্পে পরিণত করার অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৪৯-এর ১১ মার্চ তৎকর্তৃক ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' (বর্তমানে বাংলাদেশ অবজারভার) প্রতিষ্ঠা। ঢাকা হাইকোর্টে শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী। ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। মৃত্যু. ঢাকা. ১৮ জানুয়ারি ১৯৯২।[৪৯]

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী

জন্ম. গুথুমা গ্রাম, ফেনী, ১৯০৬। রাজনীতিবিদ ও লেখক। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে জন্ম। পিতা মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী। শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর বোন। তিন বছর বয়সে পিতৃহীন হন। মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে শৈশব ও কৈশোরকাল কাটান। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২২), চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এস.সি. (১৯২৪) ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯২৮) পাস। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত (১৯২৭)। ১৯৩১-এ কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব 'বি' টিমের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত। তাঁর অধিনায়কত্বে এটি 'এ' টিমে উন্নীত। ১৯৩২-এ আই.পি.এস. (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সূর্য সেনের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অভিযোগে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ থাকায় চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত। ছোটোবোন শামসুন নাহারের যুগ্ম-সম্পাদনায় চতুর্মাসিক সাহিত্যপত্র 'বুলবুল' (১৯৩৩) প্রকাশ। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিকপত্রে রূপান্তরিত। ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৩৮-এ আনোয়ারা হকের (পরবর্তীকালে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী) সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৩৯-এ সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটির সহ-সহসভাপতির পদ লাভ। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে এই কমিটির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ১৯৪০-এ লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান। এ সম্মেলনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত (২৩ মার্চ ১৯৪০)। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (আপার হাউস) সদস্য নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪৫-১৯৪৬)। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ফেনীর পরশুরাম এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। নির্বাচনের সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দক্ষিণহস্ত হিসেবে কর্ম সম্পাদন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের মূলে তাঁর অবদান যথেষ্ট। কলকাতা পোর্ট হজ কমিটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন (১৯৪৬-১৯৪৮)। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণ ও সিলেট রেফারেন্ডামে অংশগ্রহণ (জুলাই ১৯৪৭)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর পূর্ব-

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত। মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনকালে মশক নিধন অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা। ঢাকা শহরকে মশকমুক্ত করার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় প্রদান। ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৪৮) অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। পূর্ব-পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের (১৯৫১) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৩-র ৬ এপ্রিল ব্লাডপ্রেসার স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ ও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। বিশিষ্ট গদ্য লেখক। *ওমর ফারুক*, *আমীর আলী*, *মোহম্মদ আলী জিন্নাহ*, *পাকিস্তান* প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ভক্ত-শিষ্য'। হবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণে কবির ১৯২৬-এ প্রথমবার ও ১৯২৯-এ দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে আগমন এবং বাহারের মাতামহের বাড়ি 'আজিজ মঞ্জিলে' অবস্থান। নজরুল কর্তৃক তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোল' (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থ বাহার-নাহার-এর নামে উৎসর্গ। রাজনীতি, সাংবাদিকতা, খেলাধুলা, সাহিত্য সর্বত্রই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. ঢাকা, স্ট্রোকে, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬।[৫০]

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর ছবি সম্বলিত ডাকটিকিট

শামসুন নাহার মাহমুদ

জন্ম. গুথুমা গ্রাম, ফেনী, ১৯০৮। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। বাবা মৌলভী মুহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুন্সেফ এবং মা আছিয়া খাতুন চৌধুরী ছিলেন গৃহিণী। এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে জন্ম। ছয় মাস বয়সে পিতৃহীন হন। মাতামহ খানবাহাদুর আব্দুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত। শিক্ষাজীবনের সূচনা চট্টগ্রাম শহরের ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। পরবর্তীকালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিক পাস (১৯২৬)। ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। কলকাতার ডায়েসিমন কলেজে ভর্তি। ১৯২৮-এ আই.বি.এ. ১৯৩২-এ বি.এ. এবং ১৯৪২-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম.এ. পাস। ১৯৪৪-এ

www.pathagar.com

এম.বি.ই ডিগ্রি লাভ। ১৯৪৩-এ বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। কলকাতা সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ ও ঢাকা ইডেন কলেজে বাংলার অধ্যাপিকা। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) সম্মেলনে (১৯৩৯)-এর মহিলা শাখার সভাপতি ও সমিতির পরবর্তী সম্মেলনে (১৯৪১)-এর শিশুসাহিত্য শাখার সভানেত্রী। এছাড়া ১৯৪৮-এর নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী, ১৯৫৮-তে পূর্ব-পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী ও ১৯৬২-তে ঢাকা লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী নির্বাচিত। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিচরণ ছিল। ১৯৬২-১৯৬৪ পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম : *পুণ্যময়ী* (১৯২৫), *রোকেয়া জীবনী* (১৯৩৭), *বেগম মহল* (১৯৩৮), *শিশুর শিক্ষা* (১৯৩৯), *নজরুলকে যেমন দেখেছি* (১৯৫৮), *ফুল বাগিচা*, *আমার দেখা তুরস্ক* ইত্যাদি। বড়ো ভাই হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় কলকাতা থেকে '*বুলবুল*' (১৯৩৩) নামে চতুর্মাসিক পত্র প্রকাশ। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিক পত্রে রূপান্তরিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও এদেশের যে কজন মহিলা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাদের অন্যতম। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ-সকল গুণাবলীর জন্য কবি নজরুল ইসলামের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ। নজরুল কর্তৃক তাঁর 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থ 'বাহার-নাহার'-এর নামে উৎসর্গ। মৃত্যু. ঢাকা, ১০ এপ্রিল ১৯৬৪।[৫১]

জননেতা খাজা আহমদ

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সমাজসেবক খাজা আহমদ ১৯২০ সালের ২৬ মার্চ ফেনী শহরের রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফেনী মডেল ও ফেনী হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বামপন্থী রাজনীতি দিয়েই তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ছোটোবেলায় স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন খাজা আহমদ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ফেনী থেকে কলকাতায় যান।

১৯৪৭ সালে East Bengal Legislative Assembly নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে ফেনীর যুবসমাজ সংগঠিত হয়ে হবীবুল্লাহ বাহারকে ফেনীর আসন থেকে নির্বাচিত করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলায় নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। খাজা আহমদ প্রথমে ফেনীতে এবং পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ফেনীতে ভাষা আন্দোলনে যুবনেতা খাজা আহমদের উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সংগ্রাম' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৪৭ সালে প্রকাশনার পর থেকে 'সংগ্রাম' স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং তা সমাধানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা, পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার

www.pathagar.com

যৌক্তিকতা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস পায়। মুসলিম লীগ সরকারের অব্যাহত হয়রানি, পত্রিকার কপি বাজেয়াপ্ত করা, জামানত তলব, পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা, সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও খাজা আহমদের পত্রিকা 'সংগ্রাম' ছিল আপোষহীন। 'সংগ্রাম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ফেনীতে একটি প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠে। এদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে সৃজনশীল প্রতিভা ও সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আজীবন সংগ্রামী জননেতা চিরকুমার এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফেনীর মুক্তিযুদ্ধে একজন অনন্যসাধারণ সংগঠক হিসেবে তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জনগণ স্মরণ করে। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, বিচক্ষণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কৌশলের কারণে ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীর পিটি আই ও কাজীচরাগের পলিটেকনিক্যালে সংগঠিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ফেনী মহকুমার মোহাম্মদ আলী বাজার, শুভপুর ব্রিজ দাগনভূঁইয়ার বামনগরে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের জন্য চেকপোস্ট বসিয়েছিলেন। ফেনীকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত হানাদারমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের পর তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীতে অবস্থানরত পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জননেতা খাজা আহমদ একজন প্রগতিশীল পরমতসহিষ্ণু আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। এই জন্যই ফেনীর আবাল, বৃদ্ধ, কৃষক, শ্রমিক-যুবকের নিকট তিনি ছিলেন ফেনীর রাজা খাজা আহমদ।

১৯৭৬ সালের ২৯ মে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যবরণ করেন।[৫২]

জহুর হোসেন চৌধুরী

জন্ম. চট্টগ্রাম শহর, ২৭ জুন, ১৯২২। সাংবাদিক। পৈতৃক নিবাস রামনগর, ফেনী। পিতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাদাত হোসেন চৌধুরী। মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজ। দুই বছর বয়সে মাতৃহীন হন। মাতামহী কর্তৃক লালিত-পালিত। ১৯৪২ এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. পাস। কর্মজীবন শুরু ১৯৪৫-এ কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। 'দৈনিক আজাদ' ও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কমরেড'-এ কিছুদিন সাংবাদিকতা, কয়েক বছর বাংলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান। ১৯৫১-তে 'সংবাদ' পত্রিকায় যোগদান এবং দীর্ঘকাল এই পত্রিকার সম্পাদক ১৯৫৪-'৭১। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি। 'পাক-চীন মৈত্রী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সোভিয়েত আদর্শের

www.pathagar.com

একজন দৃঢ় সমর্থক। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর 'কাউন্টার পয়েন্ট' নামে একটি ইংরেজি সাময়িকী প্রকাশ। কিছুকাল পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে 'সংবাদ'-এ 'দরবারে জহুর' নামে নিয়মিত কলাম লিখে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ১৯৮১-তে জেবুন্নেসা-মাহবুবউল্লাহ স্বর্ণপদক এবং ১৯৮২-তে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ। জহুর হোসেন চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচিতি হন এবং তাঁর প্রেরণায় বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচারের জন্যে সচেষ্ট হন। তাঁর কিছু রচনা হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বুলবুল'-এ প্রকাশিত হয়। দেশে পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী চক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। সমকালীন রাজনীতির উপর তাঁর তির্যক ও বিশ্লেষণমূলক রচনার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন। বিশেষ করে ১৯৬৬-১৯৬৭-তে ধারাবাহিকভাবে 'সংবাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'দেশ কোন পথে' শিরোনামে সম্পাদকীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। মৃতু. ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮০।[৫৩]

শহীদুল্লা কায়সার

জন্ম. মজুপুর গ্রাম, ফেনী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক (পরে ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ) মওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ তাঁর পিতা। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৪২)। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। এ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৪) ও অর্থনীতিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. (১৯৪৬) ডিগ্রি লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি। একই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি। রাজনীতিতে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়ায় কিছুকাল পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে মার্কবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ঢাকায় আগমনের পর কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যোগদান। গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান। এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় ৩ জুন (১৯৫২) গ্রেফতার। প্রায় সাড়ে তিন বছর কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৫-তে পুনরায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। ১৯৫৬-র ৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে ১৪ অক্টোবর (১৯৫৮) আরেকবার গ্রেফতার। প্রায় চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২-র সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯) পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ। ১৯৫৮-তে দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্তি। ষাটের দশকে এ পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক পদে উন্নীত। এতে দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা' শীর্ষক

www.pathagar.com

উপসম্পাদকীয় রচনা। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডা. আর. আহমদের কন্যা কমিউনিস্ট কর্মী জোহরা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৫৮)। একই বছর ১৪ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক শহীদুল্লা কায়সার গ্রেফতার হলে জোহরা বেগমের ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় গমন এবং শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক ত্যাগ। ১৯৬৯-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি পান্না চৌধুরীর (পান্না কায়সার) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। জনজীবনের আলেখ্য রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় প্রদান। বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। *সারেং বৌ* (১৯৬২) ও *সংশপ্তক* (১৯৬৫) তাঁর দু'খানি বিখ্যাত উপন্যাস। *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২) তাঁর স্মৃতিকথা। *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* (১৯৬৬) ভ্রমণবৃত্তান্ত। *সারেং বৌ* উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) ও উপন্যাসে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২) লাভ। ভাষা-আন্দোলনের বিশিষ্ট সৈনিক। এদেশের প্রতিটি প্রগতিশীল তথা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক। মৃত্যু. মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দিন কয়েক পূর্বে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক তাঁর ঢাকার কায়েতটুলীর বাসভবন থেকে অপহৃত। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৫৪]

শহীদুল্লা কায়সার

গাজীউল হক

ভাষাসংগ্রামী, গীতিকার ও আইনজীবী গাজীউল হক-এর জন্ম ১৯২৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফেনীর ছাগলনাইয়ার নিচিন্তা গ্রামে। তাঁর পিতা মওলানা সিরাজুল হক ছিলেন কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের কর্মী এবং মা নূরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। তিনি প্রথমে গ্রামের মক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে কাশিপুর স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪১-এ বগুড়া

www.pathagar.com

জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি শিক্ষক সুরেনবাবুর সান্নিধ্যে এসে দেশপ্রেমে দীক্ষিত হন। ১৯৪৬-এ এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। এরপর বগুড়া আজিজুল হক কলেজে আই.এ. ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হয়েই অধ্যক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংস্পর্শে এসে বাম রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ঐ বছর কুষ্টিয়ার নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৪৬-এ তিনি ধুবড়িতে অনুষ্ঠিত আসাম মুসলিম লীগ কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে মাওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা এবং নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪৭-এ তিনি পূর্ব-পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের ঈশ্বরদী কনফারেন্সে উত্তরবঙ্গ শাখার যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছর ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের দুদিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে গাজীউল হক বগুড়ার পাঠচক্র 'শিল্পায়ন'-এর সদস্যদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৪৮-এ তিনি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সংগ্রাম শুরু হয়। ১১ মার্চ গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে ছাত্রদের মিছিল নিয়ে বগুড়া শহর প্রদক্ষিণ করেন। বগুড়া জেলা স্কুল ময়দানে সেদিনের সভায় সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। ১৯৪৮-এ গাজীউল হক বগুড়া কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ে অনার্স ভর্তি হন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হন। এসময় তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে কারাবরণ করেন। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন-বেতনের কর্মচারীগণ ধর্মঘট আহ্বান করলে ছাত্রনেতাদের সাথে তিনিও এর সমর্থন করেন। ১৯৪৯-এর দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় তিনি কাজ করেন। ১৯৫১-এ বি.এ. অনার্স পাস করে এম.এ. ভর্তি হন। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে তা ভঙ্গকারীদের অন্যতম ছিলেন গাজীউল হক। সেদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। গাজীউল হকের 'ভুলব না ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' গানটি গেয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রভাতফেরি করা হতো।

১৯৫৩-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে ভর্তি হন। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি বগুড়ার মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেন এবং কাগমারী সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনে আওয়ামী লীগের সর্বাঙ্গীণ প্রতিকূলতা প্রতিরোধে মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন বন্ধের জন্য সরকার ধরপাকড় শুরু করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি গাজীউল হকসহ কয়েকজন নেতাকর্মীকে বগুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। এবার প্রায় ২৯ মাস তাকে কারাগারে থাকতে হয়। ১৯৫৬-এ তিনি একসঙ্গে ১১ পেপার আইন পরীক্ষা দেন। ১৯৫৭-এ বগুড়া বারে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে গাজীউল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩-এর মার্চ মাসে পূর্ব-পাকিস্তান ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের সনদ লাভ করেন। ১৯৬৪-এ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠক হিসেবে ও পরে হিলিতে পাকসেনাদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে একটি খণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার বিক্রয় বিভাগের দায়িত্বসহ আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রণাঙ্গনের সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২-এ তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে যোগ দেন। ১ মার্চ ১৯৭৩ থেকে ১৫ মে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির আইন উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৯৬ থেকে চার বছর বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বোচ্চ আদালতের একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি রাষ্ট্রভাষা পদক ও সম্মাননা স্মারক, শেরেবাংলা জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : *জেলের কবিতা* (১৯৫৯), *এখানে ও সেখানে*, *একটি কাহিনী*, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (১৯৭১), *এগিয়ে চলো* (১৯৭১), *Bangladesh Unchained* (১৯৭১), *Media Laws & Regulation in Bangladesh* (১৯৯২), *মোহাম্মদ সুলতান* (১৯৯৪), *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন* (১৯৯৬)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব লজ, পাবনা থিয়েটার পুরস্কার ১৯৭৭, বগুড়া জিলা স্কুলের ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংবর্ধনা ১৯৭৯, অন্নদাশঙ্কর রায় পুরস্কার ১৯৯৭, বগুড়া প্রেস ক্লাব সংবর্ধনা ১৯৯৭, চট্টগ্রাম ইয়ুথ কেয়ার ভাষাসৈনিক পদক ১৯৯৭, বগুড়ার ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু পরিষদ সোনালী ব্যাংক সংবর্ধনা ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ ১৯৯৯, তমুদ্দিন মজলিস মাতৃভাষা পদক ২০০০, দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ সংবর্ধনা ২০০০, একুশে পদক ২০০০, জাহানারা ইমাম পদক ২০০১, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রদত্ত ভাষা-আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মাননা পদক ২০০৩, বঙ্গবন্ধু পদক ২০০৩, শের-ই-বাংলা জাতীয় পুরস্কার ২০০৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সম্মাননা পদক ২০০৬ লাভ করেন। তিনি ২০০৯ সালের ১৭ জুন মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫]

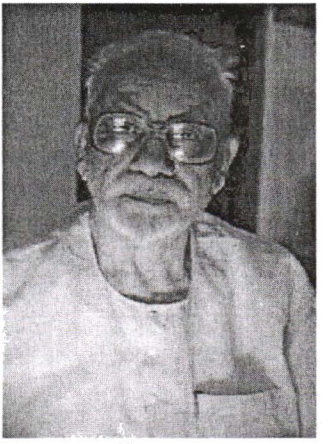

গাজীউল হক

www.pathagar.com

শহিদ সেলিনা পারভীন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই গৌরবময় ইতিহাসে ১৬ ডিসেম্বর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বাঙালির বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের রক্তাক্ষরে লিখিত আর একটি দিন ১৪ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী।

সেলিনা পারভীন

সেলিনা পারভীন ১৯৩১ সালে নোয়াখালীর রামগঞ্জের কল্যাণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মৌলভী আবিদুর রহমান উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বিএবিটি পাস করেন এবং টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মা সাজেদা খাতুনও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। বাড়িতে তিনি লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। মা-বাবার প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা পরিবেশে সেলিনা পারভীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১০/১২ বছরের সেলিনা তাঁর বাবা মা'র সঙ্গে গ্রামে চলে যান। তিনি গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন, কবিতা লিখতেন, ফুলগাছ লাগাতেন এবং আসবাবপত্রে ঘর সাজাতেন। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার স্নেহের। ১৪ বছর বয়সে তাঁর অমতে গ্রামে বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি স্বামীর গৃহে যাননি। অবশেষে তিনি তালাকপ্রাপ্ত হন। তিনি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাস করতে পারেননি। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বইপত্র পড়াশোনা করেন। তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য তিনি নার্সিং-এ ভর্তি হন। ভালো না লাগায় নার্সিং ট্রেনিং ছেড়ে দেন।

www.pathagar.com

বারবার তিনি চাকরি বদল করেছেন। তিনি ছিলেন আত্মসচেতন। তিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে চাকরি করেন মেট্রন পদে। এখানে তিনি দু'বছর চাকরি করেন ১৯৫৮-১৯৫৯ পর্যন্ত। পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের চাপে ১৯৬২ সালে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার মর্যাদা পেলেন না। তাই তিনি পুত্র সুমনকে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে একঘেয়ে সংসারজীবন ত্যাগ করেন। সেলিনা পারভীন সলিমুল্লাহ এতিমখানায় ও আজিমপুর বেবী হোমে এবং 'বেগম' পত্রিকায়ও চাকরি করেন। তাঁর কাছে সাহিত্যচর্চা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তিনি অসংখ্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। তবে তাঁর প্রকাশিত লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

অতঃপর সেলিনা পারভীন 'ললনা' পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি কবিতা, গল্প, আলেখ্য লিখতে চাইলেও পত্রিকায় তাঁকে বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ দেয়া হয়। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ তাঁর অপছন্দ ছিল। তবু জীবিকার জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তিনি নিজে 'শিলালিপি' শিরোনামে একটি অনিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন। এজন্য তিনি বারবার পেশা বদল করেছিলে। তবে তাঁর একটা স্নেহপরায়ণ হৃদয় ছিল। ভাইবোনের কাছে তিনি আদরের ছিলেন। তিনি ভাইবোনদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন। সাদা রং তাঁর পছন্দ ছিল। তিনি সব সময় সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, সাদা মোজা পরতেন। তিনি কম দামের শাড়ি পরতেন, মোজা জুতো পরতেন দামী। তিনি সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো পরিবেশ পছন্দ করতেন। 'ললনা' অফিসের সম্পাদনার টেবিল তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন।

'ললনা' পত্রিকা প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক মনোভাবাপন্ন ছিল। সেলিনা পারভীন এসময় সিদ্ধেশ্বরীতে ছেলে সুমন ও দূর সম্পর্কের ছোটোভাইকে নিয়ে থাকতেন। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতেন। ১৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় কয়েকজন লোক সেলিনা পারভীনের ভাড়াটে বাসায় এসে বলে এখনি তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে। উনি বলেছিলেন কারফিউ শেষ হলে যাবেন। কিন্তু তারা সময় দিল না। তার ৮ বছরের ছেলে সুমন সাথে যেতে চেয়েছিল তাতে সম্মতি মেলেনি। ওরা বলেছিল সেলিনা পারভীনকে ওরা নিয়ে যাচ্ছেন ওরাই বাড়িতে দিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। অনুসন্ধান করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। সুমন তাঁর নানা-নানি, খালা-মামাদের আশ্রয়ে বড়ো হয়।

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশ সনাক্ত করেছিলেন তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। সাদা শাড়ি, ব্লাউজ, সাদা মোজা জুতা পরিহিতা বোন সেলিনা পারভীনকে সনাক্ত করেন ভাইয়েরা। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা প্রাক্কালে তিনি শহিদ হন। মগবাজার চৌরাস্তা মোড় থেকে মৌচাক-এর রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে "শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক"।[৫৬]

www.pathagar.com

জহির রায়হান

জন্ম. মজুপুর গ্রাম, ফেনী, ১৯ আগস্ট ১৯৩৫। পিতা কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক (পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ) মওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বাল্যে ও কৈশোরে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও আলিয়া মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা। দেশভাগের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৫০-এ মেট্রিক ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩-তে আই.এস.সি পাস। সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে বিজ্ঞান ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি। ১৯৫৮-তে বি.এ. অনার্স পাস। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৫২-তে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় গ্রেফতার। মুক্তিলাভের পর ফটোগ্রাফি শেখার জন্য কলকাতায় প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে ভর্তি। ১৯৫৬-র শেষের দিকে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ। ১৯৬১-তে চিত্রনায়িকা সুমিতা দেবী এবং ১৯৬৮-তে চিত্রনায়িকা সুচন্দার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। ১৯৬১-তে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'কখনো আসেনি'। এরপর থেকে একে একে পরিচালনা করেন 'সোনার কাজল' (১৯৬২), 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'বাহানা' (১৯৬৫), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'আনোয়ারা' (১৯৬৭), 'সঙ্গম' (১৯৬৪), 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)। শুরু করেছিলেন ইংরেজি ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট'। এর কাজ শেষ না হতেই শুরু হলো স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৯৭১)। চলে গেলেন কলকাতা এবং তৈরি করলেন বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide'। একজন মসিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। Bangladesh Liberation Council of Intelligensia-এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত (১৯৭১)। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর স্বল্প সময়ে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম সম্পাদন। তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে তৎকর্তৃক প্রথম রঙিন (টেকনিকালার) ছবি 'সঙ্গম' তৈরি। আবার প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবিও তাঁর সৃষ্টি। উর্দু ছবি 'বাহানা' তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি। তাঁর 'কাঁচের দেয়াল' শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে 'নিগার'সহ একাধিক পুরস্কার লাভ করে। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে আবহমান বাংলার জনজীবন, 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাসে সংগ্রামমুখর নাগরিক জীবন ও একুশ উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা এবং 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) উপন্যাসে বিপর্যস্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'আর কত দিন' (১৯৭০), 'কয়েকটি মৃত্যু' (১৯৬৫) ও 'তৃষ্ণা' (১৯৫৫) তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং স্থানে স্থানে কাব্যগুণমণ্ডিত। অনেক সরস ছোটোগল্পেরও রচয়িতা। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্পগুলোতে আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫) তাঁর সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ। 'হাজার বছর

www.pathagar.com

ধরে' উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪-তে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৭২-এ উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান। সাহিত্য মাসিক 'প্রবাহ' এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক 'এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ছাত্রজীবনে। স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় আগমন। এসেই শুনতে পান অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার নিখোঁজ। আল-বদর বাহিনীর শিকার হয়েছিলেন তিনি। দেশের আরও বুদ্ধিজীবীর মর্মান্তিক হত্যায় মর্মাহত হন। তাঁরই চেষ্টায় গঠিত হয় বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি। নিজেই তদন্তের কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে ক্যামেরায় তুলতে থাকেন ছবি। মৃত্যু. ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। লাশও পাওয়া যায় নি।[৫৭]

জহির রায়হান

ড. এন. এ. এম. ফয়জুল মহী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এন. এ. এম. ফয়জুল মহী ১০ আগস্ট ১৯৩৯ ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফেনী সরকারি হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫-তে মেট্রিক, ফেনী কলেজ থেকে ১৯৫৭-তে আই.এ. ও ১৯৫৯-এ বি.এ. পাস করেন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৬২-তে বি.এড. এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান কালোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫-তে এম.এ. ও ১৯৬৮-তে ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬২-১৯৬৫ পর্যন্ত ফেনী জি.এ. একাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৮-র ২৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিল্পকলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। ঐ বছর ১১ ডিসেম্বর সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ফয়জুল মহী ছিলেন কৃতী ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

www.pathagar.com

খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি অনুরাগী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এন. এ. এম. ফয়জুল মহী

তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সমর্থক। মুক্তিযোদ্ধাদের ও পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত অনেক পরিবারকে তিনি আর্থিক সাহায্য দান করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক-সৈন্যদের সহযোগী আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাস থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঢাকার মিরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে।[৫৮]

সেলিম আল দীন

নাট্যকার ও শিক্ষাবিদ সেলিম আল দীন-এর জন্ম ১৮ আগস্ট ১৯৪৯ সালে ফেনী জেলার সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামে। তাঁর পিতা মফিজউদ্দিন আহমেদ এবং মাতা ফিরোজা খাতুন। বাবার চাকরি-সূত্রে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ফেনী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রংপুরের বিভিন্ন স্থানে। ১৯৬৪-এ ফেনী সেনেরখিলের মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৬৬-এ ফেনী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। টাঙ্গাইলের করোটিয়ায় সরকারি সাদত কলেজ থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৯৫-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। তিনি ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৮১-১৯৮২-তে নাট্যনির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফের সঙ্গে গ্রাম থিয়েটার গঠন। প্রথম রেডিও নাটক 'বিপরীত তমসায়' ১৯৬৯-এ। টেলিভিশনে প্রথম নাটক আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় 'লিব্রিয়াম' (পরিবর্তিত নাম 'ঘুম নেই') প্রচারিত ১৯৭০-এ। আমিরুল হক চৌধুরী নির্দেশিত এবং বহুবচন প্রযোজিত প্রথম মঞ্চনাটক 'সর্প বিষয়ক গল্প' (১৯৭২)। বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'বিটপী'তে কপিরাইটার

www.pathagar.com

হিসেবে চাকরি জীবনের শুরু। ১৯৭৪-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান। তিনি আমৃত্যু ঐ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাট্যগ্রন্থগুলো হলো : 'সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক' (১৯৭৩), 'জভিস ও বিবিধ বেলুন' (১৯৭৫), 'বাসন' (১৯৮৫), 'মুনতাসির', 'শকুন্তলা', 'কিত্তনখোলা' (১৯৮৬), 'কেরামতমঙ্গল' (১৯৮৮), 'যৈবতী কন্যার মন' (১৯৯৩), 'চাকা' (১৯৯১), 'হরগজ' (১৯৯২), 'প্রাচ্য' (২০০০), 'হাতহদাই' (১৯৯৭), 'নিমজ্জন' (২০০২), 'ধাবমান', 'স্বর্ণবোয়াল' (২০০৭), 'পুত্র', 'স্বপ্ন', 'রজনীগণ' ও 'উষা উৎসব'। রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত নাটক : 'বিপরীত তমসায়' (রেডিও পাকিস্তান, ১৯৬৯), 'ঘুম নেই' (পাকিস্তান টেলিভিশন, ১৯৭০), 'রক্তের আঙ্গুরলতা' (রেডিও বাংলাদেশ ও বিটিভি), 'অশ্রুত গান্ধার' (বিটিভি, ১৯৭৫), 'শেকড় কাঁদে জলকণার জন্য' (বিটিভি, ১৯৭৭), 'ভাঙনের শব্দ শুনি' (আয়না সিরিজ, বিটিভি, ১৯৮২-৮৩), 'গ্রন্থিকগণ কহে' (বিটিভি, ১৯৯০-৯১), 'ছায়া শিকারী' (বিটিভি, ১৯৯৪-৯৫), 'রঙের মানুষ' (এনটিভি, ২০০০-২০০৩), নকশীপাড়ের মানুষেরা' (এনটিভি, ২০০০), 'কীত্তনখোলা' (আকাশবাণী কলকাতা, ১৯৮৫)। 'চাকা' নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৯৪, 'কীত্তনখোলা' নাটক থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ২০০০-এ। 'একাত্তরের যীশু' চলচ্চিত্রের জন্য সংলাপ রচনা করেন ১৯৯৪ সালে। পুরস্কার ও সম্মাননা : নাটকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৪; ঋষিজ সংবর্ধনা, ১৯৮৫; কথক সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৩; একুশে পদক, ২০০৭; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৯৩; অন্য থিয়েটার (কলকাতা) সংবর্ধনা; নান্দিকার পুরস্কার (কলকাতা) ১৯৯৪; শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার, ১৯৯৪; খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (একাত্তরের যীশু, শ্রেষ্ঠ সংলাপ) ১৯৯৪; মুনীর চৌধুরী সম্মাননা, ২০০৫। মৃত্যু. ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি ২০০৮।[৫৯]

সেলিম আল দীন

www.pathagar.com

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর জন্ম ১৯৩২ সালের ৯ মার্চ বর্তমান ফেনী জেলায়। বাবা আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সহকারী রেজিস্ট্রার ছিলেন। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে ঘুরেছেন দেশের বহু জায়গায়। পত্রিকা ও গ্রন্থপাঠ এবং চলচিত্র ও সংগীতের প্রতি পিতার আগ্রহের ফলে বাল্য বয়স থেকে কাইয়ুম চৌধুরীও এসবের প্রতি অনুরাগী হন, যা তাঁর রুচিশীল মানস গঠনে সহায়ক হয়। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই বইয়ের প্রতি গড়ে উঠে তাঁর তীব্র আকর্ষণ। তখন থেকেই বইয়ের প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ইলাস্ট্রেশন তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তাকে জাগিয়ে তোলে। তিনি বলতেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর মনের মধ্যে ছবি আঁকার ইচ্ছেটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা আর্ট কলেজ (বর্তমানে চারুকলা ইন্সটিটিউট) থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা আর্ট কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে তেহেরা খাতুনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬০ সালে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ডিজাইন সেন্টারের একজন ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। এক বছর পর তিনি ডিজাইন সেন্টার ত্যাগ করে অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশনের প্রধান অঙ্কন শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা আর্ট কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের বইয়ের প্রচ্ছদে যুগান্তকারী বিপ্লবের রূপকার তিনি। ছয় দশক ধরে এই শিল্পী বাংলাদেশের প্রকাশনার জগতকে তাঁর বিপুল সৃষ্টির মাধ্যমে যেভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন, তার কোনো তুলনা মেলে না। ১৯৭৭ সালে প্রথম চিত্রকর্মের প্রদর্শনী করেন। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে কৃষক-শ্রমিকসহ সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ তাকে বার বার আন্দোলিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনুভূতি নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর শিল্পকর্মে মুক্তিযোদ্ধার ইমেজ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

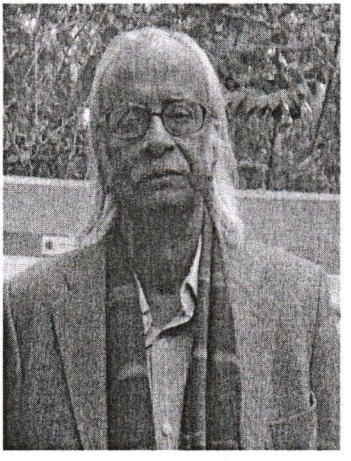

কাইয়ুম চৌধুরী

www.pathagar.com

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতাকেন্দ্রিক এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সব সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে তিনি সক্রিয় থেকেছেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের চারু ও কারুশিল্পীদের যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তার যুগ্ম আহক্ষায়ক ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর। এই সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেই ১৯৭১-এর মার্চে 'স্বাধীনতা' শীর্ষক চারু-কারুশিল্পীদের একটি ঐতিহাসিক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্বৈরতন্ত্র, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সব আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা দেশের সব গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী শিল্পী হিসেবেই তিনি স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছেন।

শিল্প ও সংস্কৃতির সব ধারা থেকে রস আহরণ করে কাইয়ুম চৌধুরী নিরন্তর পরিপুষ্ট করেছেন নিজ সৃজনশক্তিকে। আর এর স্বীকৃতিও পেয়েছেন রাষ্ট্র, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তিনি ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার এবং ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে তিনি দু-দুবার রেলওয়ের টাইমটেবলের প্রচ্ছদের জন্য সেরা পুরস্কার (১৯৫৯, ১৯৬১), শিল্পকলায় পাকিস্তানের জাতীয় পুরস্কার (১৯৬১-৬২), পঞ্চম তেহরান বিয়েনাল থেকে রাজকীয় দরবার পুরস্কার (১৯৬৬), ১৯৬০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ২৯ বার শিল্পকলা একাডেমী অ্যাওয়ার্ড, বাংলাদেশের প্রচ্ছদশিল্পের জন্য সাতবার গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৪-৭৬) এবং ১৯৭৫ সালে ন্যাশনাল বুক সেন্টার আয়োজিত প্রচ্ছদ প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো মনোনিত হন এবং সুফিয়া কামাল পদক, শহিদ আলতাফ মাহমুদ পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন।[৬০]

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ফেনীতে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ

১৯৭০-এর পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তানি শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল গঠন করবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ। ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখও নির্ধারিত ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণ দেখিয়ে সে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান। ১ লা মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা শোনার পর পরই সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় উত্তাল মার্চ। আর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা মূলক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন–"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বাঙালি জাতি ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ৮ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি শাসক বাঙালিদের

www.pathagar.com

উপর অপারেশন সার্চলাইট চালাবার নির্দেশ দেয়। নিরস্ত্র বাঙালি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর চালানো হয় অপারেশন সার্চ লাইট। চালায় তারা বর্বরোচিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ।

বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। এরপর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওইদিন বিকেলের দিকে চট্টগ্রাম থেকে কিছু লোক ফেনীতে আসতে সক্ষম হয়। তাদের নিকট থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার সাইক্লোস্টাইলকৃত কপি পাওয়া যায়। এই কপি ব্যাপকভাবে ফেনীর জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য খাজা আহমদ সাহেব ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্যবস্থা নিতে বলেন। ফেনী কলেজের তৎকালীন ক্লার্ক ধর্মপুরের করিম সাহেবকে দিয়ে ফেনী কলেজের সাইক্লোস্টাইল মেশিন খাজা আহমদের বাঁশপাড়াস্থ অফিসে নিয়ে আসা হয়। করিমকে দিয়ে স্টেনসিল কেটে এই মেশিনে সাইক্লোস্টাইল করে শত শত কপি থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামে-গঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাইকযোগেও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করা হয়।

২৬ মার্চ আনুমানিক বেলা দুইটা-আড়াইটার দিকে ধর্মপুর, কাজিরবাগ এবং সুলতানপুর এলাকার কয়েকজন লোক শহরে এসে খাজা সাহেবের অফিসে খবর দেয় যে, ফেনী বিমানবন্দর সংলগ্ন সিও (উন্নয়ন)-এর অফিসে পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছে এবং যে-কোনো সময় ফেনীতে আক্রমণ চালাবে। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতারা তাৎক্ষণিক এক জরুরি সভায় মিলিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করার পূর্বেই তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে। এইজন্য মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটিভোগরত বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর এবং আনসারদের খুঁজে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন দিকে লোক পাঠানো হয়। ফেনী থানার মালখানায় যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল সেগুলো জড়ো করে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হয়।

২৬ মার্চ সারারাত কোনো পক্ষ থেকেই কোনো গোলাগুলি হয়নি। ২৭ মার্চ সকালে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ফেনীবাসী প্রথমদিকে খুব বেশি সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। তাদের কাছে ৩০৩ রাইফেল ছাড়া অন্য কোনো আধুনিক অস্ত্রও ছিল না। অপরপক্ষে, পাকিস্তানিরা মেশিনগান, এসএমজি, এলএমজি ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল। ২৭ মার্চ সারাদিন এবং রাতে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সময়ের মধ্যে প্রায় সাতাশজন আনসার শহিদ হন এবং আনুমানিক পঞ্চাশজন আহত হন।

২৮ মার্চ ভোর নাগাদ ফেনীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাত-আটজন অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটিভোগরত সৈনিক এসে যুদ্ধে যোগ দেয়। এই নিয়মিত বাঙালি সৈনিকদের যোগ দেবার পর যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়। বাঙালি সৈনিকরা ক্রলিং করে সিও অফিসে পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে। সকাল দশটার মধ্যে নয়জন

www.pathagar.com

পাকিস্তানি সৈন্য সিও অফিসের দোতলা থেকে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধ থেমে যায়। চারদিকে সমবেত হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ সিও অফিসের দিকে ছুটে আসে এবং যুদ্ধরত বাঙালি সৈনিক, আনসারদের কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে নয়জন পাকিস্তানি সৈন্যকে পিটিয়ে হত্যা করে। জনতা তাদের লাশ টেনে-হিঁচড়ে মিছিল সহকারে ফেনী শহরে নিয়ে আসে। খাজা আহমদ, এবিএম তালেব আলী ও ছাত্রনেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় জনতাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের লাশগুলো রাজারঝি দিঘির পূর্বপাড়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ফেনীতে সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

ফেনীতে সশস্ত্র পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে প্রথম সরাসরি এই যুদ্ধের মধ্যদিয়ে সত্যিকার অর্থে আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত একটি দলের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা সঞ্চয় করে। এতে করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে জয়লাভ করতে হলে কী ধরনের প্রশিক্ষণ ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রয়োজন এবং সেজন্য কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সেই সম্পর্কে ফেনীর রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। সেজন্য সম্মিলিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে, যে-কোনো সময় চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে হানাদার বাহিনী ফেনী দখল করার জন্য আসতে পারে। সেজন্য ফেনী জেলার বিভিন্ন সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। ফেনী-ছাগলনাইয়া সড়কে চানপুর কাঠের ব্রিজ আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়। যেসব রাস্তা পাকিস্তানি সৈন্যরা ফেনীতে আসার জন্য ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করা হয় সেসব স্থানে একের পর এক ব্যারিকেড তৈরি করতে থাকে ছাত্রজনতা। যেসব বাঙালি সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র সিও অফিস যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়।

সিও অফিস থেকে প্রচুর পরমাণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। সেসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ফেনীতে পি.টি.আই. মাঠে, ফেনী কলেজ মাঠে এবং পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। এছাড়াও, যুদ্ধের প্রস্তুতিসরূপ ফেনীতে দুটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়। নিয়ন্ত্রণকক্ষসমূহের দায়িত্ব ছিল পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ তদারক করা, হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য ফেনী আক্রমণ প্রতিহত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, রাজনৈতিক মটিভেশনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা এবং মনোবল চাঙা রাখা। ২৬ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যার পর এবং চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর নির্যাতনে বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে পায়ে হেঁটে ফেনী জেলার ওপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছিলেন সেইসব সহায়সম্বলহীন, ক্ষুধার্ত এবং অসুস্থ নারীপুরষ ও শিশুদের খাদ্য, পানীয় এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফেনীতে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণকক্ষসমূহের তত্ত্বাবধানে জেলার বিভিন্নস্থানে লঙ্গরখানা ও প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ফেনীতে হানাদার বাহিনীর আগমন

এপ্রিলের অবশিষ্ট কয়েকদিন দখলদার বাহিনী ফেনীতে তাদের অবস্থান সুসংহত করে। তারা ফেনী কলেজ, ফেনী পাইলট হাইস্কুল, ফেনী বিমানবন্দরস্থ পরিত্যক্ত কিছু ভবন, সিও অফিস, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, জুনিয়র টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, দোস্ত টেক্সটাইল মিল, জিএ একাডেমী, ফেনী স্টেডিয়াম, রেলওয়ে স্টেশন, দেওয়ানগঞ্জ মোক্তারবাড়ি এলাকা, মোহাম্মদ আলী বাজার, পাঁচগাছিয়া কৃষি খামার, মহিপাল বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের রেস্টহাউজ প্রভৃতি স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং ট্রেঞ্চ ও বাংকার নির্মাণ করে। মুক্তিবাহিনী কর্তৃক উড়িয়ে দেয়া মাতৃভূঁইয়া ব্রিজের স্থানে একটি বেইলি ব্রিজ স্থাপন করে ফেনী চৌমুহনী হয়ে লাকসাম পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত করে। উর্ধ্বতন সেনা অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় ফেনী দিঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত তৎকালীন সার্কিট হাউস এবং মহিপালে বিদ্যুৎ বিভাগের রেস্টহাউজে। তারা সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, ডি ডি টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

জামায়াতে ইসলামীর কিছু লোকের নেতৃত্বে ফেনী জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী এবং ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা, চরলক্ষীগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসা, আফতাব বিবিরহাট মাদ্রাসা, দাগনভূঁইয়া মাদ্রাসা, ছিলোনিয়া মাদ্রাসাসহ জেলার অন্যান্য মাদ্রাসার কিছুসংখ্যক তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রসহ প্রায় ২০০ রাজাকারের একটি বাহিনী মে মাসের মধ্যে গড়ে তোলা হয়। তাদেরকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সাত থেকে দশদিনের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরা প্রত্যেকে রাইফেল চালাতে পারত। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কালভার্ট, ব্রিজ, রেললাইন ও বাজারসমূহ পাহারার কাজে এদেরকে নিয়োগ করা হয়।

ফেনী শহরের ট্রাংক রোডে অবস্থিত গোলকানন্দ ঔষধালয়ের বিল্ডিং-এ রাজাকার বাহিনীর ফেনী জেলা হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফেনী শহরের জগন্নাথবাড়ি রোড, রেলওয়ে স্টেশন, তাকিয়া রোড, গুদাম কোয়ার্টার, পাঁচগাছিয়া রোডসহ আরো কয়েকটি স্থানে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি ও মন্দিরে রাজাকারদের গোপন নির্যাতন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। জুলাই-আগস্ট মাসেও জামাত ও মুসলিম লীগ সমর্থক যুবকদের ফেনী জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে এনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রায় এক হাজার যুবককে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাদেরকে ফেনী জেলার বিভিন্ন অধিকৃত অঞ্চলে নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে মোতায়েন করা হয়।

এসব রাজাকার নিজ নিজ ক্যাম্পের আওতাধীন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক লোকজনের বাড়িতে হানা দিয়ে লুটতরাজ, গরু-ছাগল, মুরগি ইত্যাদি নিয়ে এসে ক্যাম্পে উল্লাস করে ভূরিভোজন করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের খোঁজখবর পেলে হানাদার বাহিনীকে পথ দেখিয়ে ঐসব স্থানে আক্রমণের জন্য নিয়ে যেত। গ্রাম থেকে যুবতী মেয়েদেরকে ধরে হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করতো। দলমত নির্বিশেষে অবস্থাসম্পন্ন লোকজনকে ধরে ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন করে হত্যার ভয় দেখিয়ে মুক্তিপণ আদায় করতো। যেসব পরিবারের সন্তানগণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে সেসব

www.pathagar.com

পরিবারের সদস্যদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। শান্তিকমিটিসমূহ রাজাকারদের যাবতীয় অপকর্মে মদদ জোগাত, রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তির কাজে সহায়তা করতো।

ভারতে ফেনীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুব প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন

২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ফেনী দখলের পূর্বে খাজা আহমদ, এবিএম তালেব আলী, রুহুল আমিন, নূরুল ইসলাম হাজারী, সৈয়দ মিয়া, একেএম শামসুল হক, আবদুর রহমান বি কম, ইউনুস চৌধুরী, ছাত্রলীগের জহির উদ্দিন বাবর, মোহাম্মদ মুসা, শাজাহান কবির, শ্যামলকান্তি বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মাওলা, সুবেদার আবু আহম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট শামসুল হক, সুবেদার সিদ্দিক আহমদ, হাবিলদার সাইফুল্লা, ডাক্তার জুলফিকার সহ প্রায় তিনশতাধিক নেতাকর্মী ও প্রতিরোধ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ফেনীর নিকটবর্তী ভারতীয় বিএসএফ-এর ক্যাম্প-সংলগ্ন একিনপুর বাজারে ও বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে ওঠেন। প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যরা সশস্ত্রভাবে একিনপুরের পশ্চিমে ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড, দক্ষিণ-পূর্বদিকে আমতলী বিওপি-এর ওপর নজর রাখতে থাকে। ফেনী থেকে আগত ছাত্র যুবদেরকে প্রশিক্ষণের কাজও চলতে থাকে। ভারতীয় বিএসএফও এসব কাজে সহায়তা করতে থাকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য একিনপুর ক্যাম্প স্থাপন করা কৌশলগত কারণে উপযোগী নয় বিবেচিত হওয়ায়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় একিনপুর-বিলোনিয়া সড়কের পাশে একিনপুর থেকে চার মাইল উত্তরে চোত্তাখোলা বাজারের পশ্চিমপাশে উঁচু পাহাড় ও গাছগাছালি পরিবেষ্টিত চোত্তাখোলা ভৈরবটিলায় ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ ফেনী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল, চৌদ্দগ্রাম ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা থেকে কয়েক হাজার ছাত্র-যুবক চোত্তাখোলায় এসে সমবেত হয়। প্রতিদিনই শত শত যুবক একিনপুর ও চোত্তাখোলা আসতে থাকে। ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষ নিজেরাই দা, কুড়াল, খন্তা ধরে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ব্যারাক ও রাস্তা নির্মাণ, প্রশিক্ষণের জন্য মাঠ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করে। চোত্তাখোলা ইয়ুথ ক্যাম্পটিতে প্রায় পাঁচশতাধিক ছাত্র-যুবকের থাকা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ফেনী, বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চল ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রায় তিনহাজার ছাত্র-যুবক চোত্তাখোলায় এসে সমবেত হয়।

ফেনী জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের, বিশেষ করে ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী ও ফেনী থানায় (বর্তমান দাগনভূঁইয়া থানাসহ) বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুবক যারা ছাগলনাইয়ার অদূরে ভারতীয় সীমান্তের শ্রীনগর ইয়ুথ ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবককে প্রাথমিকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে রাইফেল, গ্রেনেডসহ হানাদার বাহিনীর দালাল ও রাজাকারদের উপর ছোটো ছোটো গেরিলা অপারেশনের জন্য ছাগলনাইয়া থানা ও সোনাগাজী থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে এসব গেরিলাদল ছাগলনাইয়া

www.pathagar.com

থানার জঙ্গল মিয়ার হাট, জিনার হাট, করৈয়া, শুভপুর, গোপাল, মুহুরীগঞ্জ ও সোনাগাজী থানার নবাবপুর, আহম্মদপুর, মজলিশপুর, বগাদানা, চরদরবেশ, চরচান্দিয়া, মুতিগঞ্জ এবং ফেনী থানার ফাজিলপুর, লেমুয়া, ছনুয়া, মোটবী, ধলিয়া, কালিদহ প্রভৃতি এলাকায় হানাদার বাহিনীর অনেক দালালের বাড়িতে ও স্থানীয় রাজাকারদের উপর অনেকগুলো অপারেশন পরিচালনা করে।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২নং সেক্টরের অধীনে সাবসেক্টর-২ গঠিত হয় ফেনী জেলার মুহুরী নদীর পশ্চিমতীর ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা নিয়ে। এ ২নং সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে। তিনি ১৯৭১ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থানরত পদাতিক বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লার কসবা সীমান্ত অতিক্রম করে ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানি তাঁকে বিলোনিয়া সাবসেক্টরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।

ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ফেনীর প্রতিরোধবাহিনীর সকল সদস্য এবং একিনপুরে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার একটি অংশ এবং আরো কিছু যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজনগর সংলগ্ন বড়কাসারীতে ক্যাম্প স্থাপন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

অপরদিকে ফেনী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বতীর এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সমগ্র পার্বত্যাঞ্চল নিয়ে ১নং সেক্টর গঠিত হয়। ১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। ১নং সেক্টরের অধীন মুহুরী নদীর পূর্বপ্রান্তে শুভপুর ও ছাগলনাইয়া এলাকার ফেনী অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছিলেন ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান প্রমুখ।

মুন্সিরহাট ডিফেন্সে বিলোনিয়া অঞ্চলে নিয়মিত বাহিনীর প্রথম সম্মুখযুদ্ধ

পাকিস্তানি বাহিনীর ফেনী দখল করার পর ফেনীর উত্তরে টেকনিক্যাল কলেজ ও দোস্ত টেক্সটাইল মিল পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর উত্তরে বন্ধুয়া থেকে বিলোনিয়া সীমান্ত পর্যন্ত তারা তখনো পৌঁছাতে পারেনি। মাঝে মাঝে তারা তাদের দালাল ও রাজাকারদেরকে ঐ অঞ্চলে পেট্রলিং-এ পাঠাতে থাকে। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, তারা খুব শীঘ্র সীমান্ত শহর বিলোনিয়া পর্যন্ত দখলে নেয়ার জন্য অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তাঁর অধীনস্থ সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ফেনীর উত্তরে মুন্সিরহাট এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি ডিফেন্স স্থাপন করেন। এই ডিফেন্স ছিল একটি সামরিক ও কৌশলগত প্রস্তুতি এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ। মুন্সিরহাটে মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সের অবস্থান সম্পন্ন করার আগে ফেনী থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত যে রেললাইন রয়েছে তার উপর দিয়ে ট্রেনযোগে যাতে হানাদার বাহিনী সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও

www.pathagar.com

রসদ সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারে সেজন্য জাফর ইমামের নেতৃত্বে পাইওনিয়ার প্লাটুন ফুলগাজী ও বন্ধুয়া ব্রিজ বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সরাসরি নেতৃত্বে পাইওনিয়ার প্লাটুন জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানিদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে এ দুটি ব্রিজে বিস্ফোরক লাগানোর কাজ সম্পন্ন করে।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা মে মাসের শেষ দিক পর্যন্ত সমগ্র মুন্সিরহাট অঞ্চল জুড়ে প্রতিরক্ষা ডিফেন্স স্থাপন করে। মুন্সিরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের ডিফেন্সের পজিশন ছিল দক্ষিণে ফেনী শহরের দিকে মুখ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পজিশন ছিল ফেনী শহরের বাইরে আনন্দপুর ইউনিয়ন ও কালিরবাজার এলাকায়। ফেনী শহরে ছিল তাদের হেডকোয়ার্টার। মুক্তিযোদ্ধাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স ও হানাদার বাহিনীর অবস্থানের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক থেকে দেড় মাইল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় হানাদার বাহিনী ফেনী শহর থেকে আক্রমণ পরিচালনা করছিল। ঝটিকা আক্রমণ এবং সার্বক্ষণিক মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স পজিশনের উপরে তাদের আর্টিলারি আক্রমণ অব্যাহত ছিল। তাদের এ বিচ্ছিন্ন আক্রমণের মাধ্যমে হানাদারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদেরকে সংগঠিত হতে না দেওয়া।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স থেকে প্রায় এক মাইল ব্যবধানে সমগ্র কালিরবাজার এলাকাজুড়ে হানাদার বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষামূলক পজিশন (defensive position) গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের defensive position-এর সামনে খুব ঘন এন্টিপারসোনাল মাইনফিল্ড সৃষ্টি করেন এবং ফেনী-বিলোনিয়া রাস্তায় ও অন্যান্য রাস্তায় এন্টিপারসোনাল পুঁতে রাখেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেন হঠাৎ করে সরাসরি মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সিভ পজিশনের উপর আক্রমণ চালাতে না পারে। দক্ষিণে ফেনী শহরমুখী ডিফেন্সিভ পজিশন ডানদিকে ভারত সীমান্ত থেকে বামে অর্থাৎ পূর্বে মুহুরী নদীর তীরে শনিরহাট পর্যন্ত প্রায় পাঁচমাইল প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল। এ ডিফেন্সের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অবস্থান ছিল ডিফেন্সের মাঝামাঝি স্থান মোক্তারবাড়ির পুকুরপাড়ে, যার সংলগ্ন ছিল ফেনী-বিলোনিয়া সড়ক ও রেললাইন।

মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুনের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কয়েকদফা মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে এক ব্যাটালিয়নের অধিক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সিভ পজিশনের সামনে প্রায় এক মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ঘন এন্টিপারসোনাল মাইন (thick mining) থাকায় মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সের তিন থেকে চারশো গজের মধ্যে তারা অগ্রসর হওয়ার পরই শুরু হতো মুক্তিবাহিনীর পুঁতে রাখা মাইনের বিস্ফোরণ। এ সময়ে তারা কিছুতেই মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সের সামনে ৩০০ গজ-এর ঘন মাইনফিল্ড অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। যতবারই তাদের এ আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল তারাও ততবার পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়। এর ফলে তারা মুক্তিবাহিনীর ওপর একটি ব্যাপক ও বড়ো আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ ধারণা করছিলেন। ১৯৭১ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সমগ্র বিলোনিয়া অঞ্চলের ধানক্ষেত এবং নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হয়ে যায়। এর ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে ঠিকমতো রণকৌশল অবলম্বন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা এ অবস্থায় খোলা রাস্তাঘাট দিয়ে অগ্রসর হয়ে দিনের বেলায় আক্রমণ পরিচালনা করায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপরদিকে মুক্তিবাহিনী সমগ্র মুন্সিরহাট ডিফেন্সে সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সার্বক্ষণিকভাবে প্রতিরক্ষা অবস্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়োজিত রাখে। বাংকারের ভেতর থেকেই প্রতিরক্ষার দৈনন্দিন কার্যক্রম চলতে থাকে। হানাদার বাহিনী দিনরাত মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। ১৭ জুন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পনেরো-বিশ মিনিট পরপর হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওপর হালকা ও ভারী আর্টিলারি শেলিং অব্যাহত রাখে।

১৯৭১ সালের ২০ জুন পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ ছাড়া সমগ্র বিলোনিয়া অঞ্চলে মোটামুটি শান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। ২১ জুন সকাল থেকে সারাদিন অবিরাম শেলিং ও কাউন্টার শেলিং-এর কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানি কমান্ডো ছত্রীবাহিনী সেদিন রাত আটটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের চারদিকে তাদের আক্রমণের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। তবে কোনো সরাসরি আক্রমণ তখনো পরিচালনা করেনি। শুধু মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের দিকে মাঝে মাঝে চারদিক থেকে হালকা অস্ত্রের ফায়ারিং চালাচ্ছিল।

রাত প্রায় দুটার দিকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ নিশ্চিত হন যে, পাকিস্তানি বাহিনী ভোর হওয়ার আগেই তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে এবং ভোর হওয়ার মুহূর্তেই চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনীর উপর বড়ো রকমের আক্রমণ পরিচালনা করবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পাকবাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করার আগেই মুক্তিবাহিনী ডিফেন্স প্রত্যাহার করে পিছনে বিকল্প জায়গায় সরে যাবে। এভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুপক্ষের এনকাউন্টার এড়িয়ে কোনোপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধারা পিছনে বিকল্প স্থানে নিরাপদে চলে যেতে সক্ষম হয়। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বিলোনিয়া অঞ্চলের মুন্সিরহাট ডিফেন্স থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের এ পশ্চাদপসরণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য একটি সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

মুন্সিরহাট ডিফেন্স থেকে জুনের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে ভারতের সীমান্তবর্তী ক্যাম্পগুলোতে আশ্রয় নেয়ার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ অঞ্চলটি তাদের দখলে নিয়ে বিলোনিয়া সীমান্ত চৌকি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সকল দিক দিয়ে সীমান্ত অবরোধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ এলাকায় বেশ সতর্কাবস্থায় থাকে এবং বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন

www.pathagar.com

করে সমগ্র বিলোনিয়া এলাকায় সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত থাকে। এভাবে বিলোনিয়ার প্রথম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দুই নম্বর সাবসেক্টরের দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী কার্যক্রম

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে মুন্সিরহাট ডিফেন্স প্রত্যাহার করে বিলোনিয়া অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পরবর্তী প্রায় চারমাস সময় ধরে পাকিস্তানি বাহিনী এ অঞ্চলের সর্বত্র তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান সুসংগঠিত করে। অপরদিকে ১নং সেক্টর ও ২নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকরা ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত তাদের ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এ এলাকায় শত্রুর অবস্থানগুলোর ওপরে হয়রানিমূলক ঝটিকা আক্রমণ চালাতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই চন্দনা-পরশুরাম এলাকায় মুহুরী নদীর অপরপাড় পর্যন্ত এবং ভারত সীমান্ত হয়ে ফুলগাজী থানার নিলক্ষী গ্রাম দিয়ে ফুলগাজী বাজারে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থানের উপর আক্রমণ ও চাপ সৃষ্টি করা হয়। এ বাজার থেকে হানাদার বাহিনী যেন এ এলাকার গ্রামগুলোতে ঢুকে অত্যাচার চালাতে না পারে এবং কোনো কৌশলগত অবস্থান নিতে না পারে সেজন্য জাফর ইমামের নেতৃত্বে সামরিক অভিযানের পাশাপাশি গেরিলা তৎপরতাও অব্যাহত রাখা হয়।

সামরিক ও গেরিলা অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভারতের রাজনগর ও বড়কাসারিতে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দুটি ট্রেনিং ক্যাম্প নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য চালু করা হয়। এর ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন ২নং সাবসেক্টরে ইতিপূর্বেকার মুন্সিরহাট ডিফেন্সের তুলনায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্রাক্তন বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও রেলপুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদেরকে নিয়ে তাঁর অধীনে একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠে। এ নিয়মিত বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নির্দেশে অক্টোবর মাসে বিলোনিয়া রণাঙ্গনে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয়। এ দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক হিসাবে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে অক্টোবর মাসের দিকে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এ অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর রাজপুত ও গুর্খা রেজিমেন্ট এগিয়ে আসে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এ রেজিমেন্টসমূহ মুক্তিবাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী পাক হানাদার বাহিনীর ওপর আর্টিলারি শেলিং অব্যাহত রাখত। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ২নং সাবসেক্টর কমান্ডার বিলোনিয়া পকেটের পরশুরাম ও চিথলিয়ায় হানাদার বাহিনীর অবস্থানের দিকে মুখ করে মির্জানগর ইউনিয়ন থেকে পরশুরামের মুহুরী নদীর পাড় পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর একটি ডিফেন্সিভ অবস্থান রাখে। এ ডিফেন্সের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষ পরশুরাম ও চিথলিয়া এই দুটি বাজারে যে মজবুত ঘাঁটি গড়েছিল সেখান থেকে তারা যেন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর দিকে বেরিয়ে আসতে না পারে এবং ফুলগাজী, পরশুরাম ও চিথলিয়া এ তিনটি বাজারে যেন তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকে; বাইরের ব্যাপক অঞ্চল যেন মুক্তিবাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মুক্ত

www.pathagar.com

এলাকা হিসাবে চিহ্নিত থাকে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী এ অঞ্চলের দশটি ইউনিয়ন চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত মুক্ত এলাকা হিসাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছিল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এ মুক্ত এলাকা থেকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত ছিল এবং সামরিক অভিযানও পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনী শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক ডিফেন্সের মাধ্যমে এ সময় শত্রুপক্ষকে চিথলিয়া ও পরশুরামে তাদের দুইটি অবস্থানের বাইরে, এমনকি এ দুই অবস্থানের মধ্যেও তাদের চলাচল সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

হানাদার বাহিনীকে চিথলিয়া ও পরশুরামে কোণঠাসা অবস্থায় দেখে জাফর ইমামের তত্ত্বাবধানে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সদ্য ভারতীয় মিলিটারি একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট দিদার ও লেফটেনেন্ট মিজানের নেতৃত্বে দুই-কোম্পানি সৈন্য ও ভারতীয় রাজপুত ও গুর্খা রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি সৈন্যসহ যৌথভাবে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ফুলগাজীতে হানাদার বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ও মজবুত ঘাঁটির ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এসময় ফুলগাজী বাজারে হানাদার বাহিনীর অবস্থান থেকে নিলক্ষী গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান পর্যন্ত মাঝামাঝি প্রায় এক মাইল এলাকা জুড়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই পক্ষের এ আক্রমণ পরিচালনার প্রাক্কালে উভয়দিক থেকে বৃষ্টির মতো আর্টিলারি শেলিং অব্যাহত ছিল। যদিও সেদিন ফুলগাজী ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধারা দখলে আনতে পারেনি তবুও মুক্তিবাহিনীর নিলক্ষীর অবস্থান থেকে অদূরে ফেনী-বিলোনিয়া রাস্তায় হানাদারদের মুভমেন্টের ওপর অব্যাহত সামরিক ও গেরিলা আক্রমণ ফেনী থেকে ফুলগাজীতে তাদের সৈন্য ও রসদ সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করে এবং ফুলগাজীতে তাদের অবস্থানকে কোণঠাসা অবস্থায় রাখতে সক্ষম হয়।

ইতোমধ্যে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ কয়েকবার সুবারবাজারে মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্সিভ এলাকা বড়কাসারি ও রাজনগরে প্রশিক্ষণ শিবির এবং নিলক্ষী এবং বিলোনিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান পরিদর্শন করেন এবং শত্রুর ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য জাফর ইমামকে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ফেনী-বিলোনিয়া সীমান্তে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত চূড়ান্ত আক্রমণ

অক্টোবর মাসের শেষার্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল হিরা ২নং সেক্টরের কমান্ডারের মাধ্যমে সাবসেক্টর কমান্ডার জাফর ইমামকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর পাঠান। জাফর ইমাম আগরতলার অদূরে একটি ভারতীয় সেনাশিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে জানান। জেনারেল হিরা তাকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরশুরাম ও চিথলিয়া ঘাঁটির মাঝদিয়ে রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করে দুটি ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে এ দুটি ঘাঁটির চারদিকে ভোর হওয়ার আগেই ডিফেন্সিভ অবস্থান গ্রহণ করে সময় ও সুযোগ বুঝে পরবর্তীতে আক্রমণ পরিচালনার সম্ভাবনার কথা জানান।

www.pathagar.com

জেনারেল হিরার সঙ্গে আলোচনা অনুযায়ী তিনদিন পর ২নং সাবসেক্টর কমান্ডার জাফর ইমাম তাঁর সহযোগী ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদ, লে. ইমামুজ্জামান, লে. শহীদুল ইসলাম, লে. দিদার, লে. মিজান, ক্যাপ্টেন গোলাম মোরশেদকে নিয়ে জেনারেল হিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ও অন্যান্য অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। তারা দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাইকে নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন।

১৯৭১ সালের ২৭ অক্টোবর জাফর ইমাম সেকশন-পর্যায়ের সকল কমান্ডারকে নিয়ে প্রথমে রেকি দল গঠন করেন। রেকি দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুর অবস্থানের ফাঁকা স্থান দিয়ে অনুপ্রবেশ করে সমগ্র এলাকায় বিস্তারিতভাবে রেকি সম্পন্ন করে। ১৯৭১ সালের ২ নভেম্বর আক্রমণের দিন হিসাবে স্থির করা হয়। ব্যাটালিয়নের সকল দল রাজনগরে সমবেত হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

৩১ অক্টোবর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশকারীরা একটি বাড়তি সুযোগ পেয়ে যায়। অনবরত বৃষ্টির মাঝে ২ নভেম্বর সূর্যাস্তের পরই সৈনিকরা সীমান্ত অতিক্রম করে আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। যুদ্ধের এ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা ছিল সব দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ অভিযানে দশম বেঙ্গল ও দ্বিতীয় বেঙ্গলের ৮০% সৈন্যই ছিল পুরনো বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সদস্য। অবশিষ্ট ২০% সদস্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক। তাছাড়া এ অভিযানে মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিল। অনবরত বৃষ্টির মাঝে রাতের অন্ধকারে মুহুরী নদী ও ছিলোনিয়া নদীর কোথাও কোমর পানি, কোথাও বুক পানি, আবার কোথাও বা পিচ্ছিল কর্দমাক্ত রাস্তার বাধা পেরিয়ে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থানগুলো অবরোধের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যরা অনেকটা নিশ্চিন্ত অবস্থায় এ সময় তাদের বাংকারে অবস্থান করছিল। মধ্যরাতের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট অবস্থানগুলোতে পৌঁছে যায়। মুক্তিযোদ্ধা দলগুলো রেশন, গোলাবারুদ এবং বাংকার ও ট্রেঞ্চ খনন করার যন্ত্র ইত্যাদি বহন করে নিয়ে আসে। এভাবে ২ নভেম্বর মাঝরাতের মধ্যেই চন্দনা, সলিয়া, গুথুমা সাধারণ রেখা বরাবর মুক্তিবাহিনীর অবস্থান গ্রহণের ফলে সমগ্র বিলোনিয়ার উত্তরাংশ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর সেকশনগুলোকে সামনের দিকে ও পিছনের দিকে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে উভয়দিকে মুখ করে মোতায়েন করা হয়।

৩ নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুক্তিবাহিনীর সকল কোম্পানি বাংকার ও ট্রেঞ্চ খননসহ প্রতিরক্ষার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। বৃষ্টির কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এমনকি তাদের টহলদলও বাংকার ছেড়ে বাইরে না-আসায় সকাল সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ ও তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে কোনোকিছুই জানতে পারেনি।

www.pathagar.com

বিলোনিয়া থেকে রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ফেনী পর্যন্ত চলে আসা রাস্তাটি তখন কাঁচা ছিল। এ রাস্তার পাশে মুক্তিবাহিনীর বেশকিছু বাংকার গড়ে উঠেছিল। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর আনুমানিক সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে হঠাৎ দূর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা অস্পষ্টভাবে একটি ট্রলির আওয়াজ শুনতে পায়। শব্দটা চিথলিয়ার দিকে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। রেললাইন ও সড়কের কাছের বাংকারে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে নায়েক সুবেদার এয়ার আহমদ ছিলেন খুবই সাহসী। হানাদার বাহিনীর ট্রলিটি এয়ার আহমদের বাংকারের আনুমানিক পঁচাত্তর গজ দূরত্বের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রলির ওপর এয়ার আহমদ এলএমজি দিয়ে প্রচণ্ডবেগে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ট্রলিভর্তি সকল পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয় এবং ট্রলিটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। শত্রুবাহিনীর একটি রকেট লাঞ্চার, একটি এসএমজি ও তিনটি রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ট্রলির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে। এয়ার আহমদ ও তাঁর সঙ্গীরা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে শত্রুর অস্ত্রগুলো হস্তগত করার জন্য 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে বাংকার থেকে বের হয়ে ট্রলির দিকে ছুটতে থাকে।

ইতোমধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিথলিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা মনে করল তাদের ট্রলিটা হয়তোবা মুক্তিবাহিনীর কোনো গেরিলাদলের আক্রমণের মুখে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি। তারা দুদিক থেকেই মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করে। ঠিক সেই মুহূর্তে হানাদার বাহিনীর চিথলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে এয়ার আহমদ-এর মাথায় বিদ্ধ হলে তিনি সেখানেই শহিদ হন। পড়ে-থাকা অস্ত্রগুলো পরে মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

ইতোমধ্যে উভয়পক্ষের প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে। তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করে। সলিয়ার দক্ষিণদিকে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর এবং একই সঙ্গে উত্তরদিকে পরশুরাম ঘাঁটি থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। তারা বারবার প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার ফলে তারা উভয়দিক থেকে আসা শত্রুর ফায়ার মোকাবেলা করে তাদের সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

পরশুরাম থেকে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আকার ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। পাকিস্তানি বাহিনী বুঝতে পারে যে তারা মুক্তিবাহিনীর জালে আটকা পড়েছে। এ জাল থেকে বের হওয়া তাদের জন্য জীবনমরণ সমস্যা। তাই তারা প্রাণপণে লড়ে যেতে থাকে। উভয়পক্ষের মধ্যে সারাদিন গুলি বিনিময় হতে থাকে। এ অবস্থার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের বাংকার খনন এবং যোগাযোগ-ট্রেঞ্চ তৈরি করে প্রতিরক্ষা অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতে থাকে। সারারাত উভয়দিক থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকার ধ্বংস করার জন্য এ সময় ১০৬ মিলিমিটার (আর আর) রাইফেল ব্যবহার করে। পরবর্তী দুদিন ধরে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে বারবার আক্রমণ চালায় ও উত্তরে

www.pathagar.com

অবস্থিত তাদের সৈন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যা প্রতিবারই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এদিকে উত্তরে আটকে-পড়া পাকিস্তানি সৈন্যরাও রাতের অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর দিয়ে বিলোনিয়ার দক্ষিণদিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এতে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে হতাহত হয়।

৪ নভেম্বর বিকেল আনুমানিক চারটার দিকে হঠাৎ চারটি পাকিস্তানি এফ-৮৬ স্যাবর জেটবিমান আকাশে দেখা যায়। স্যাবর জেটবিমানগুলো এ এলাকার চারদিকে দুবার ঘুরে এবং পালাক্রমে দুটো জেট নিচে নেমে এসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর স্ট্রাপিং (Straping) ও বোমাবর্ষণ শুরু করে। এ বোমাবর্ষণের ফলে এলাকার অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র দিয়ে জেটবিমানগুলোর ওপর পাল্টা গুলি চালায়। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা বিমানগুলোকে লক্ষ্য করে শেষরক্ষা হিসাবে এমএমজি ব্যবহার করে। তাছাড়া দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি হতে একটি চাইনিজ ভারী মেশিনগান বিমানধ্বংসী অবস্থায় স্থাপন করা হয়। এ রেজিমেন্টের সুবেদার মোমিন যখন এ মেশিনগানটি চালাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে একটি জেট এসে ভারী মেশিনগান এলাকার ওপর একটি গ্রিন ট্রেসার ফেলে। পরক্ষণেই দ্বিতীয় জেটটি এসে মেশিনগান এলাকার ওপর স্ট্রাপিং করে। কিন্তু সুবেদার মোমিন সাহসিকতার সঙ্গে জেটটির ওপর পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। পরবর্তীতে আর একটি জেটের বোমা নিক্ষেপে ভারী মেশিনগানটি ধ্বংস হয় এবং সুবেদার মোমিন ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। ইতিমধ্যে শহিদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সুবেদার মোমিনের মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে একটি বিমান টলতে টলতে এলোমেলোভাবে কোনোরকমে ভূপতন এড়িয়ে পালিয়ে যায়। এরপর অপর পাকিস্তানি জেটগুলো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সারারাত উভয়পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় হতে থাকে। ৫ নভেম্বরেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। ৫ নভেম্বর বিকেলের দিকে আবার তিনটি পাকিস্তানি জেটবিমান মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে পুনরায় বিমান আক্রমণ চালায়। প্রায় একঘণ্টা যাবৎ স্ট্রাপিং করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হানাদার বাহিনী দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের অবস্থান থেকে সরাতে ব্যর্থ হয়। বিমান-আক্রমণের পর হানাদার বাহিনী কয়েকবার মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করে উত্তরদিকে আটকে-পড়া তাদের বাহিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দেয়।

সালধর বাজার সীমান্ত চৌকি ধনিকুণ্ডার দক্ষিণে মুহুরী নদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত ছিল। সেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ৬ নভেম্বর সূর্যোদয়ের সময় ধনিকুণ্ডা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুক্তিবাহিনীর দশম ইস্ট বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি সালধর বাজার সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঐদিন সকালে এ এলাকার ওপর প্রতি-আক্রমণ চালায়, যা মুক্তিযোদ্ধারা কার্যকরভাবে প্রতিহত করে। ঐদিন বিকালবেলা পাকিস্তানি একটি বিমান থেকে আকাশ-পর্যবেক্ষণের

www.pathagar.com

মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর গোলন্দাজবাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড সীমান্ত বরাবর সমবেত হয়। ভারতীয় কমান্ডারগণ এ এলাকা পরিদর্শন করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় শুরু করেন। তারা বিলোনিয়ার যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পরীক্ষানিরীক্ষা করে মুক্তিবাহিনীকে সমগ্র এলাকা দখলের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ মনে করেছিলেন যে, বিলোনিয়ার উত্তরে আটকে-পড়া পাকিস্তানি বাহিনী কয়েকদিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু ৬ নভেম্বর পর্যন্ত যখন দেখা গেল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আটকে পড়া অবস্থার মধ্যেও তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে তখন সম্পূর্ণভাবে সমগ্র এলাকাটি মুক্ত করার জন্য বিলোনিয়া-পরশুরাম এলাকায় সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৭ নভেম্বর মধ্যরাতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী কর্তৃক সমন্বিত আক্রমণ শুরু করার আগে সমগ্র এলাকায় ৮৪ মাউন্টেন ডিভিশনের ডিভিশনাল আর্টিলারি দ্বারা আধঘণ্টা যাবৎ একনাগাড়ে গোলাবর্ষণ করা হয়। যখন শত্রুর অবস্থানগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রবাহিনীর ৩ ডোগরা রেজিমেন্ট উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে আরআরও রকেট লাঞ্চার-এর সাহায্যে শত্রুর বেশকিছু বাংকার ও শক্তিশালী অবস্থান ধ্বংস করা হয়। তুমুল যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং সমগ্র পরশুরাম-বিলোনিয়া এলাকা ৮ নভেম্বর ভোরে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয়।

১৯৭১ সালের ৮ নভেম্বর আনুমানিক পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত পরশুরাম-বিলোনিয়া এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। যদিও তখন পর্যন্ত সলিয়ার দক্ষিণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান ছিল। তবুও তারা বিলোনিয়া এলাকা পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টা চালায়নি।

এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সফল বিজয়ের মধ্যদিয়ে পরশুরাম থানায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বেসামরিক প্রশাসন এ এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কমান্ডারগণ একই কায়দায় ব্যাপক আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে বিলোনিয়ার অবশিষ্ট অংশ দখল করে সামনের দিকে এগিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর ফেনীর উত্তর পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি দখল করার জন্য প্রথম পর্যায়ের আক্রমণের মতো সীমান্তের উভয়দিক থেকে অনুপ্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে মিত্র বাহিনীর ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড কুমিল্লা এলাকায় চূড়ান্ত আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্য বিলোনিয়া থেকে চৌদ্দগ্রাম যায়। অপরদিকে হেডকোয়ার্টার কিলো ফোর্স ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১ জাট রেজিমেন্ট ও ৩২ মাহার রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক ২১ কিংবা ২২ নভেম্বর রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ট্যাংকের সাহায্যপুষ্ট হয়ে সীমান্তের উভয়দিক থেকে বন্ধুয়া দৌলতপুর পাঠাননগরে প্রবেশ করে এবং বিলোনিয়া পকেটের দক্ষিণপ্রান্ত অবরুদ্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

অবরুদ্ধ করার প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি বলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনা জেনে যায়। ফলে হানাদার বাহিনীকে এখানে আটকানোর পূর্বেই সমগ্র বিলোনিয়া পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তাদের সকল অবস্থান পরিত্যাগ করে তারা ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে। ২২ নভেম্বর সূর্যোদয়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী এখানে অবরোধ স্থাপন করে। কিন্তু দেখা যায় যে, তার আগেই সমগ্র বিলোনিয়া পকেট তথা ফেনীর উত্তরাংশ থেকে সমস্ত পাকিস্তানি বাহিনী পালিয়ে গেছে। এরপর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী বিলোনিয়া পকেটের দক্ষিণপ্রান্ত বরাবর একটি দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলে যাতে করে ফেনী থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর যে-কোনো ধরনের প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এ অবস্থায় জাফর ইমামের নেতৃত্বাধীন দশম ইস্ট বেঙ্গলকে পাঠাননগরে নতুন অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সালদা নদী থেকে আগত ৪ ইস্ট বেঙ্গলকে কিলোফোর্সের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থানে এসে এর শক্তিবৃদ্ধি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবে মুক্তিবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন এবং মিত্রবাহিনীর দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন বিলোনিয়ার মুখ বন্ধ করে বঙ্গুয়া দৌলতপুর-কালিরহাট-পাঠাননগর বরাবর একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলে।

অবশেষে ৩ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সেক্টরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ফেনীর ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করে। ইতোমধ্যে উত্তরদিক থেকে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ ও চাপের মুখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে ৬ ডিসেম্বর ভোর হওয়ার আগেই ফেনী ত্যাগ করে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ চৌমুহনী হয়ে ক্রমশ লাকসামের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভোরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সমগ্র ফেনী জেলা হানাদারমুক্ত করতে সক্ষম হয়।[৬১]

ফেনী কলেজ মাঠে গণকবর

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে ফেনী কলেজে অবস্থিত সৈন্য ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং অমানুষিক নির্যাতন করে বন্দিদের হত্যা করা হতো। ধৃত লোকদের দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে ঐ গর্তে লাশ পুঁতে ফেলা হতো। অনেক লাশ একসঙ্গে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো। ফেনী কলেজ মাঠ ছিল সর্ববৃহৎ গণকবর। ফেনী কলেজ মাঠে বধ্যভূমি সম্পর্কে অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ফেনী কলেজ মাঠে বধ্যভূমি ছিল। মাঠের গোলপোস্টকে ফাঁসির কাষ্ঠ বানিয়েছিল পাকহানাদার বাহিনী। ফাঁসি দিয়ে লোকজনকে ওখানে মাটি চাপা দিয়ে রাখত। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পরপরই ফেনী কলেজ মাঠ থেকে একাধিক গর্ত খুঁড়ে কয়েক হাজার মানুষের কঙ্কাল ও মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়েছে।[৬২]

সুলতানপুর কালিবাড়ি গণকবর

ফেনী শহরের উত্তরে সুলতানপুর গ্রাম। ফেনী স্টেডিয়াম থেকে উত্তর পশ্চিমে সুলতানপুর কালিবাড়ি অবস্থিত। কালিবাড়ির দক্ষিণপাশেই ফেনী সিও অফিস।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ধরে সিও অফিসে নিয়ে যেত। অমানুষিক নির্যাতন করে রাতের বেলা সুলতানপুর কালিবাড়িতে নিয়ে ধৃত লোকদের দিয়ে গর্ত করে সবাইকে মাটিচাপা দিত। ফেনী হানাদার বাহিনী মুক্ত হওয়ার পর সুলতানপুর কালিবাড়ির বটগাছের নিচে মন্দিরের সামনে মাঠ থেকে অসংখ্য কঙ্কাল, মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার রেজুমিয়া, মুহরীগঞ্জ রেলওয়ে ব্রিজ, ফেনীর কালিদহ, লালপুর পুল, ভুরভুরিয়া ঘাট, শর্শাদী রেলওয়ে স্টেশন, শর্শাদী কোলদিঘীর পাড়, দাগনভূঁইয়ার খোনারপুকুর পাড়, মাতুভূঁইয়া ব্রিজ, ওরবানের ঘাট আমতলা, সোনাগাজীর কাজীরহাট স্লুইস গেইট, বিষ্ণুপুর কালিবাড়ি, কুঠিরহাট ব্রিজ প্রভৃতিস্থানে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব গণকবরে শত শত লোকের কঙ্কাল, মাথার খুলি, হাড়গোড় পাওয়া যায়।[৬৩]

পরশুরাম হাইস্কুল বন্দিশিবির ও নির্যাতনকেন্দ্র

পাক হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা পরশুরামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরশুরাম হাইস্কুলে মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দিশিবির ও নির্যাতনকেন্দ্র স্থাপন করে। রাজাকার, আলবদর ও শান্তিকমিটির লোকজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের স্থানীয় জনগণকে ধরে এনে বন্দিশিবিরে আটক করে নির্মমভাবে নির্যাতন ও হত্যা করে।

ফুলগাজী খাদ্যগুদাম বন্দিশিবির ও নির্যাতনকেন্দ্র

ফুলগাজী রেলস্টেশনের পশ্চিমদিকে ফুলগাজী খাদ্যগুদাম অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এই খাদ্য গুদামে মজুদ চাউল মুক্তিযোদ্ধাদের রসদের জন্য চোত্তাখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এই খাদ্যগুদামে পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও শান্তিকমিটির সদস্যরা একত্রিত হয়ে সভা-সমাবেশ করতো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজনকে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করতো। এখানে পরশুরাম, ফুলগাজী এলাকার লোক ছাড়াও ফেনীসহ বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৬৪]

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফেনীর প্রয়াত লোককবি আবদুল বারিক

০১.০২.২০১৪ তারিখ ফেনীর পশ্চিম ছিলোনিয়া গ্রামে লোককবি আবদুল বারিক-এর ছেলে মোমিনুল হকের সঙ্গে আলাপ হয়। লোককবি আবদুল বারিক এই এলাকায় পল্লিকবি নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ৯২ বছর বয়সে ১৩.০১.১৯৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পশ্চিম ছিলোনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাইজবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন। তাঁর পিতা দার বক্স একজন কৃষক ছিলেন। মা রাবেয়া খাতুন ছিলেন গৃহিণী। সংসারে অভাব অনটনের কারণে তিনি লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি পানির টিউবওয়েলের একজন মিস্ত্রির কাজ করতেন।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের বিখ্যাত লোককবি রমেশ শীলের নিকট তিনি গান শিখেছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান শিখতেন। ফেনীর জননেতা খাজা আহমদ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতেন। খাজা আহমদের জনসভায় তিনি গান গাইতেন। জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতেন।

আবদুল বারিক

আবদুল বারিক কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপণ, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উন্নয়নমূলক গান গেয়েছেন। সরকারি কর্মসূচিতে তিনি এসব গান গেয়েছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে একবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফেনীতে আসেন। ফেনীর সুরত সিনেমা হলে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে তিনি গান করেন। বঙ্গবন্ধু কবি বারিকের কাঁধে হাত রেখে কবিকে শ্রদ্ধা জানান।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলায় ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহের উপস্থিতিতে আবদুল বারিক 'এপার বাংলা ওপার বাংলা আমরা হিন্দু-মুসলমান' এই গানটি গেয়ে শুনান। তিনি সেদিন ১৩০০ ভারতীয় রুপি বখশিশ পেয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে ভারত চলে যান। শরণার্থী শিবিরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কবি নূরুল আমিন, আকতারুজ্জামান, আলাউদ্দিন-এই তিনজন বিখ্যাত।

এটিএম ফারুক

পরশুরামের একটি জনপ্রিয় নাম। তাঁর রচিত গান ও নাটক দর্শকদের মনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে বহুকাল। তাঁর রচিত বিখ্যাত গান, "ঝমঝম করি ছইলতো ভাইরে বিলোইন্নার গাড়ি/হেই গাড়িয়ান বন্দ অইছে ক্যাননে যামু বাড়ি" এবং "চিওন হাডি চিড়া দিমু, দিমু বেতের লাই/আন্ডা বাড়ি হেনির হরশুরাম একবার যাইও ভাই।"

www.pathagar.com

এটিএম ফারুক

এখনো পরশুরামের মানুষ মুখে মুখে নিয়ে ফেরে সেই আঞ্চলিক গীতিকা। তাঁর উদ্যোগে পরশুরামের স্থানীয় শিল্পীরা বারবার অংশগ্রহণ করেছে বিটিভির অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠান 'নিবেদন'-এ। যেখানে পরিবেশিত হয়েছে তাঁর রচিত গানগুলো। যেমন : 'উলডাহালডা কইও না কতা তুই/উডি গেলে আঁর চাঁইয়া/চেতি গেলে বুইঝব্যা কারে কয়/ইতি হরশুরামের মাইয়া' অথবা 'সই বাতাসির বিয়ারে/খুশিতে মন যায় যায়রে/দুলা সাইজ্যে কালুরে'। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্ম ১৬ আগস্ট ১৯৪১ ইং এবং মৃত্যু ২১ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং পরশুরামের অনন্তপুর গ্রামে।[৬৫]

ফরিদ মাঝি

গীতিকার ফরিদ মাঝির বাড়ি দাগনভূঁইয়া উপজেলায়। তিনি কিছুকাল পরশুরাম উপজেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সময় তিনি অনেক আঞ্চলিক গান রচনা করেন। এই গানগুলি বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্প্রীতি নিকেতনের শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই গানগুলো পরিবেশন করেন। বিভিন্ন জাতীয় দিবসেও এই গানগুলো বর্তমানে পরিবেশিত হয় বলে জানা যায়।

আব্দুল বারী

সকলের কাছে তিনি বারীভাই নামেই পরিচিত। এ জনপদের জেলে, তাঁতি, কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষক-ছাত্র সকলেই তাঁর সমান অনুরাগী। পরশুরামের এক অপরিহার্য নাম 'আব্দুল বারী'। তিনি ছিলেন এটিএম ফারুকের সহকর্মী এবং নিজেও ছিলেন একজন গীতিকার। তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'আঁই ক্যামনে কইতাম ঘরের কতা/শরমে কললা যার কাডি/রাইত করি ঘরে গেলে/জালে না হিতি চাডি।'

www.pathagar.com

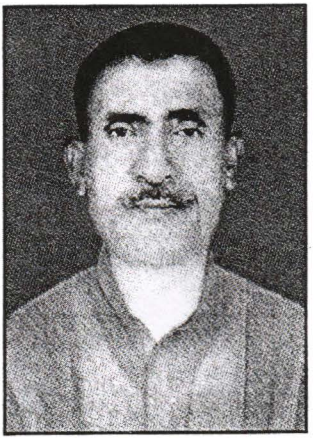

আব্দুল বারী

তাঁর সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, মহামানবের অনেক গুণই বারীভাই-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এই মহান পুরুষের জন্ম ১ জুন ১৯৪৬ ইং এবং মৃত্যু ১২ আগস্ট ২০০৯ ইং পরশুরামের কাউতলী গ্রামে।[৬৬]

তথ্যনির্দেশ

১. http://www.feni.gov.bd/node/1275857
২. http://www.feni.gov.bd/node/498715
৩. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১২
৪. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৩
৫. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪
৬. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৫
৭. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬
৮. ৭ নং দ্রষ্টব্য
৯. http://www.feni.gov.bd/node/1275857; জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৯
১০. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৩৫-১৩৬
১১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৩৯-১৪৩
১২. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪৪-১৪৭
১৩. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪৮-১৫১
১৪. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৫৯
১৫. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৫৯

www.pathagar.com

১৬. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬০
১৭. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬০-১৬১
১৮. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬২-১৬৩
১৯. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬৪
২০. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬৫
২১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬৬
২২. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬৬-১৭১
২৩. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৭৫-১৮২
২৪. জমির আহমেদ, ফেনীর ইতিহাস, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৯৫
২৫. http://www.feni.gov.bd/node/498682
২৬. http://www.feni.gov.bd/node/641845
২৭. http://www.feni.gov.bd/node/944847
২৮. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : সমতট প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ.২১৫-২১৮, ২২৭
২৯. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪
৩০. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪-১৫
৩১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ৩৪
৩২. http://www.feni.gov.bd/node/1275863
৩৩. http://www.feni.gov.bd/node/1275863
৩৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৬৮২; http://www.feni.gov.bd/node/780155
৩৫. http://www.feni.gov.bd/node/1275863
৩৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৬৮২-৬৩৮
৩৭. শ্রী স্বাধীনচন্দ্র মজুমদার (অ্যাডভোকেট), শ্রী শ্রী মা মাঁতঙ্গী দেবী মন্দির পরিচালনা কমিটি, পরশুরাম বাজার, ফেনী
৩৮. http://www.feni.gov.bd/node/780110
৩৯. মোহাম্মদ আবুল খায়ের, পেশা : মাজারের খাদেম, গ্রাম : বিলোনিয়া, উপজেলা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী, স্থান : বাঘা মামার মাজার; কাজী মো. তোফায়েল আলম (বাবর); নূরুল ইসলাম মজুমদার, বয়স : ৬৫ বৎসর, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী
৪০. শাহীদা আখতার, *ভাষাশহীদ আবদুস সালাম*, বাংলা একাডেমী, ২০১২ http://www.feni.gov.bd/node/641818
৪১. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ২৮৩
৪২. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪৫-১৪৭
৪৩. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ২৮৩-২৮৪
৪৪. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ৯৮-১১১

www.pathagar.com

৪৫. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১১৯-১২০

৪৬. আবুল বশর মজুমদার, মোহাম্মদ ইব্রাহিম মজুমদার, আবদুল হক মজুমদার, গ্রাম : দক্ষিণ কোলাপাড়া, উপজেলা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

৪৭. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.৪৮

৪৮. অমলকান্তি নাথ, পরশুরাম, ফেনী, নূরুল ইসলাম মজুমদার, পরশুরাম, ফেনী

৪৯. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৬০৬

৫০. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.৫৯৭

৫১. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.৫১১

৫২. *ফেনীর জননেতা খাজা আহমদ*, মোস্তফা হোসেন, সমকাল, ২৯ মে ২০১৪, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২১; শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, বিজয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮; মো. ফকরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী*, এপ্রিল ২০১৪

৫৩. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.২৩৮-২৩৯

৫৪. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.৫০৮

৫৫. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.২০০

৫৫. মরহুম আনোয়ারা রহমান এ্যানা, *শহীদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীন স্মরণিকা* : শিলালিপি

৫৭. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ.২৩৬

৫৮. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ১৩৫

৫৯. *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৫৮০

৬০. www.prothom.alo.and.literature/article/168058/সুন্দরের.নিরন্তর.সাধক; bdnews24.com/bangladesh/2014/11/30/painter-qayyum-chowdhury-dies-after-collapsing-at-classical-music-fest

৬১. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮; জয়নাল আবদিন, ফেনী মহকুমা বিএলএফ কমান্ডার; জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী, ডেপুটি কমান্ডার, ফেনী মহকুমা বিএলএফ; কাজী নূরনবী, ফেনী থানা কমান্ডার বিএলএফ; জহিরউদ্দিন বাবর, ফেনী মহকুমা বিএলএফ সংগঠক; অধ্যাপক রফিক রহমান ভূঁইয়া

৬২. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮; অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, আহম্মদনগর, পাইকপাড়া, তারিখ : ৩০.১১.১৯৯৯

৬৩. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮; লক্ষণ বণিক, বাঁশপাড়া, ফেনী, তারিখ : ১৮.০৯.১৯৯৯

৬৪. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮; মোহাম্মদ আজিজুল হক (আমিন মৌলভী), সলিয়া গ্রাম, পরশুরাম, তারিখ : ১৯.১০.১৯৯৯; শফিকুল বাহার টিপু (মুক্তিযোদ্ধা), সলিয়া, পরশুরাম, তারিখ : ২০.১০.১৯৯৯

৬৫. ফরিদ মাঝি, *সম্প্রীতি*, ৫ মার্চ ২০১০

৬৬. ৬৫ নং দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. কিংবদন্তি

'আন্তা' বা মাছ ধরা সংক্রান্ত কিংবদন্তি

'আন্তা' বা মাছ ধরা কিংবদন্তি বর্তমানে লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। ফেনী অঞ্চলে 'আন্তা' হচ্ছে এক ধরনের মাছ ধরার চাই বা ফাঁদ। ১৮৭৬ সালে তথা ১২৯৩ বঙ্গাব্দে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে এক ভয়াবহ প্লাবন বা জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। এর ফলে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তখনকার দিনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা যেত না। কথিত আছে দরবেশ পাগলা মিঞাঁ ঐ মহাপ্লাবনের কয়েকদিন আগে একটা বিরাট গাছের উপর 'আন্তা' বা চাই বা মাছ ধরার ফাঁদ স্থাপন করেছিলেন। লোকজন তাঁকে গাছের উপর 'আন্তা' বসানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, দেখবি, আমার 'আন্তা' পানিতে ডুবে যাবে এবং এটাতে মাছ পাওয়া যাবে। কিন্তু মানুষ এর যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি। কয়েকদিন পর মহাপ্লাবনের স্রোতে এখানকার ঘর-বাড়ি ও গাছ ভেসে গিয়েছিল।

০১.১২.২০১২ তারিখ প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং গবেষক কাজী মোস্তফা কামাল পাগলা মিঞাঁর গ্রামের বাড়ি ছনুয়া যান। এই বাড়িতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকেই বসবাস করেন। এই বাড়িতে ফজলুল হক মিঞাঁর স্ত্রী শাহেনার সঙ্গে আলাপ হয়। ২৪ বছর আগে শাহেনার বিয়ে হয়। তিনি বলেন, "তখন ছিল ছনের ঘর, মাটির গুদাম। আমার দাদি শাশুড়িকে বলতে শুনেছি এই ভিটায় পাগলা মিঞাঁ থাকতেন। সবাই চলে গেছে। গত হিরি (প্রজন্ম) গেছে। বর্তমানে আমরা আল্লার রহমতে ভালো আছি। মামা পাগল হইছে। মামা গাছে আন্তা চাই বইয়াছে। মামার মাথায় যা আসত হেইটা কইরত। বটগাছের আগাত চাই বইয়াছে। মাছ দিয়া কোম্বা (কুমড়া) রাইনছে। পানিছাড়া বটগাছের আগত মাছ লাগি গেছে।"

পাগলা মিঞাঁর কয়েকটি কাহিনি তার বাড়ির ভিটায় বসবাসরত বর্তমান বংশধরদের নিকট থেকে জানতে পারা যায়। তারা জানান, তিনি আন্তা বা চাই (মাছ ধরার ফাঁদ) বসাতেন। তার বাড়ির দরজায় একটি বিশাল বটগাছ ছিল। ঐ গাছের দুটি ডালের মাঝখানে আন্তা বসান। লোকজন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন এখানে মাছ লাগবে। এর কিছুদিন পর এই অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঢল হয়। ঐ ঢলে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে জলোচ্ছ্বাস হয়। ঐ সময় ঢলে গ্রান্ড ট্রাংক রোডের দক্ষিণ দিকে অসংখ্য লোক মারা যায়। মৃতদেহ গ্রান্ড ট্রাংক রোডের পাশে ভেসে আসে। এখানেই বটগাছে তার আন্তাচাই বসানোর কেরামতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

পাগলা মিঞাঁ তাঁর মায়ের জীর্ণ শীর্ণ ঘরে বসবাস করতেন। ঘরের সামনে একটি শিমগাছ লাগানো ছিল। একদিন একটি গরু শিমগাছ খেতে থাকে। পাগলা মিঞাঁর মা পাগলা মিঞাঁকে গরুর শিম গাছ খাওয়ার কথা বলে। তিনি এক বাড়ি দিয়ে গরুটাকে মেরে ফেলেন। পাগলা মিঞাঁ মাকে বলেন, 'মা গরু ঘুমাইতেছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়। কোনো চিন্তা কোরো না।' মা সারারাত জেগে থাকে। গরু মারা যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম আসে না। তখন পাগলা মিঞাঁ মৃত গরুর লেজ ধরে পিঠে থাপ্পড় মারে এবং বলে– 'গরু তুই উঠে যা। এখান থেকে চলে যা।' গরু জীবিত হয়ে যায় এবং অন্যদিকে চলে যায়। পাগলা মিঞাঁর কেরামতি প্রকাশ হওয়ার পর তিনি গ্রামের পূর্বে পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে থাকেন।

চাঁদ শাহ ফকিরের মাজার ও কিংবদন্তি

মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ এবং মাওলানা ইছহাক চাঁদ শাহ ফকিরের বংশধর। তাদের কাছ থেকে জানা যায় চাঁন শাহ ফকিরের পৈত্রিক নিবাস চৌদ্দগ্রামের আমানগণ্ডার গ্রামে। ব্রিটিশ সরকার তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাকে কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু তিনি কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে বসে বসে তসবি পড়তে থাকেন। একবার তাঁকে বস্তা বেঁধে নদীতে ফেলে দেয় কিন্তু তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেন। ব্রিটিশ সরকার উনার আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয় এবং তিন একর জমি লাখেরাজ হিসেবে প্রদান করে। তিনি শরিয়তি পির ছিলেন।

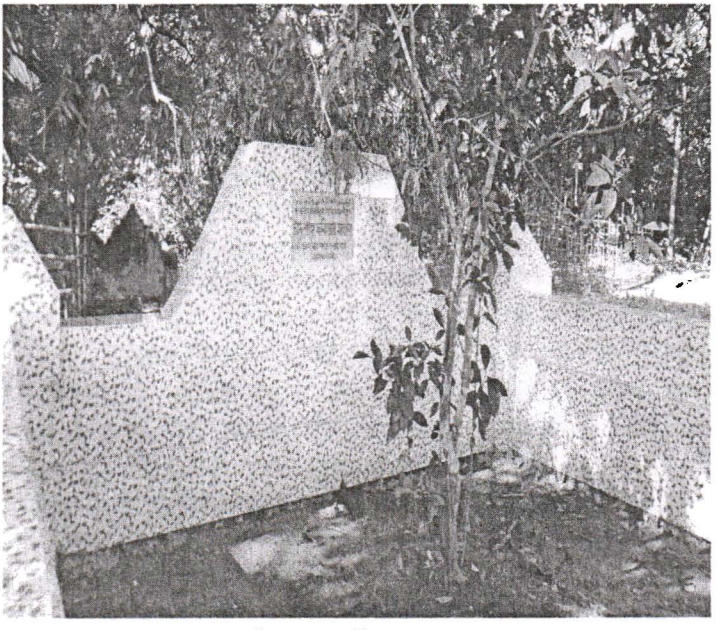

চাঁদ শাহ ফকিরের মাজার

www.pathagar.com

উত্তর সত্যনগর গ্রামে অবস্থিত তাঁর মাজারে শিরনি দিয়ে অনেকের মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলে জানা যায়। বিপদে পড়ে নিয়ত করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁর মাজারে ওরস হয় না। মাঘ মাসে বিরাট ওয়াজ মাহফিল হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে মানুষ আসে মানত করতে।

সলিয়ার গাট্যিওয়ালা দরবেশের কিংবদন্তি

সুবেদার মিজানুর রহমানের সঙ্গে গাট্যিওয়ালা দরবেশের সম্পর্কে আলাপ হয়। তিনি বলেন, "উনার বাড়ি ছিল দার্জিলিং-এ। উনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলতেন। উনি কখন সলিয়াতে আসেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। আমাদের খন্দকার বাড়ির জনৈক ব্যক্তির সাথে এখানে এসেছেন বলে জানা যায়। উনি ছোটো বাচ্চাদের লাল রঙের লুঙ্গি পরতেন। উলের বড়ো কোট সব ঋতুতে পরতেন। তিনটা কোট এবং তিনটা চাদর একসঙ্গে পরতেন সব ঋতুতে। উনি গোপনে গোসল করতেন। হাঁটু পানিতে নেমে বসে হাতে পানি নিয়ে মাথায় দিতেন। ডুব দিয়ে গোসল করতেন না। পায়খানা পেসাব করতে আমরা দেখিনি। উনি মাছ মাংস খেতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতে যেতেন। হুঁকা দিয়ে খুব বেশি তামাক খেতেন। উনাকে মসজিদে নামাজ পড়তে আমরা দেখিনি। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গোপনে সাধনা করতেন। প্রকাশ্যে সাধনারত অবস্থায় দেখিনি।"

সলিয়ার গাট্যিওয়ালা দরবেশের মাজার

www.pathagar.com

মিজানুর রহমান আরো জানান, "উনি (গাট্যিওয়ালা দরবেশ) কাদেরিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। পরশুরাম বাজারে আসতেন বেশি। বাচ্চারা উনাকে বিরক্ত করতো। উনি বাচ্চাদের বালু মারতেন, ঢিল মারতেন। তিনি যদি কাউকে থাপ্পড় মারতেন বা আঘাত করতেন তাহলে ঐ ব্যক্তি বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন। এ ধরনের বহু ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। উনি কথা বলতেন কম। slow voice-এ কথা বলতেন। আমাদের এই এলাকায় আসার পর থেকে তিনি সলিয়া মজুমদারের বাড়িতে একটি খালি ঘরে থাকতেন। ঐ বাড়ির লোকজন তাঁকে সেবা করেছেন। উনি যেই ঘরে মারা গেছেন সেই ঘরের লোকজন বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, এবং চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করেছেন।"

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার এখানে মাহফিল হয়। সুবেদার মিজানুর রহমান মজুমদার জিকির, ফাতেহা, মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন। উনার ওফাত দিবস প্রতি বছর পালন করা হয়। জনগণ এই কাজে সাহায্য করেন। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। পরিচিতজনরা আসেন। ভক্তবৃন্দ সাহায্য করেন। অনেকে মানত করেন তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। ১৯৭৬ সাল থেকে বাৎসরিক ওরস বড়ো আকারে পালিত হয়ে আসছে।[১]

বাঘা মামার কিংবদন্তি

বাঘা মামার মাজার পরশুরাম উপজেলার বিলোনিয়া এলাকায় অবস্থিত। মাজারের খাদেম আজু মিয়া জানান, বাঘা মামার বাড়ি ছিল বক্সমাহমুদ ইউনিয়নে। শৈশবে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কথিত আছে, বনে গরু চরাতে গেলে তাকে বাঘে গিলে ফেলে। চল্লিশ বছর তিনি বাঘের পেটে ছিলেন। চল্লিশ বছর পর তিনি বাঘের পেট থেকে বের হয়ে আসেন। তারপর আস্তানা গাড়েন বিলোনিয়ার। তিনি সব সময় দিগম্বর থাকতেন। জীবদ্দশায় তার বহু ভক্তশিষ্য তৈরি হয়। শত শত নারীপুরুষ তার কাছে আসত পূণ্যের আশায়। ১৯৯০ সালের দিকে মারা যান। তার মৃত্যুর পর সেখানে গড়ে উঠে মাজার। প্রতিদিন বহু মানুষ এই মাজার দর্শনে আসেন। দান-খয়রাত করেন। জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ পড়েন।

পেয়ার আহম্মদ (গ্রাম : কোলাপাড়া) বাঘা মামার একজন ভক্ত। তাঁর বাড়ি পরশুরামের মোহাম্মদপুর, বক্স আহম্মদ ইউনিয়ন। তিনি পরশুরাম রেলওয়ে বুকিং সহকারী ছিলেন। তিনি বলেন, "শাহাবুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বিলোনিয়া যাওয়ার পথে আমাকে উনার সঙ্গে নিয়ে যান। ঐদিন ছিল ১১ই জুন ১৯৮৮ সাল। আমি নিজে বাউরখুমা এলাকায় ফজল বেপারির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, উনাকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে সে স্থানটি একটি অপরিচ্ছন্ন স্থান। মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করি আমি এই অপরিচ্ছন্ন জায়গায় পদ্মফুল ফুটাবো। ইন্তেকালের ৪০ দিন পর আমি উনার দেশের ঠিকানায় খবর নিয়ে জানতে পারি যে মোহাম্মদপুরের পূর্বপাশে ভারত সীমান্ত এলাকায় উনি রাখাল হিসেবে কাজ করতেন। গরু চরাতেন। কিছুদিন পর হঠাৎ করে উনি ওখান থেকে উধাও হয়ে যান। এর পূর্বে তিনি চিৎকার করে লোকজনকে বলতেন যে আমাকে বাঘে নিয়ে যাচ্ছে। লোকজন গিয়ে দেখে যে তিনি আছেন। ঠিক এইভাবে

www.pathagar.com

আর একদিন চিৎকার করার পর লোকজন গিয়ে দেখেন যে তিনি ওখানে নেই। উনাকে বহু বছর পর চৌদ্দগ্রামে পাওয়া যায় মজজুব অবস্থায়। উনার মা উনাকে সনাক্ত করেন। চৌদ্দগ্রাম থেকে এলাকায় আনার পর তিনি ভারতে চলে যান এবং পরে ভারত থেকে এখানে এসে পরশুরামসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন পাগল বেশে। তখন বহু লোক উনার নিকট যেতেন। জীবিত অবস্থায় তিনি বাঘামামা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।"[২]

শমসের গাজী দিঘি

ঐতিহ্য সন্ধানীদের কাছে পরশুরামের পরিচয় 'দিঘির জনপদ' হিসেবে। এই উপজেলায় ছোটো-বড়ো আটটি দিঘি রয়েছে। মহাকালের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এসব দিঘি আজও টিকে আছে। এসব দিঘি নিয়ে কিংবদন্তি ও রূপকথার শেষ নেই। ঐতিহাসিক শমসের গাজী দিঘি পরশুরামের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দিঘি। ভাটির বাঘ খ্যাত শহিদ বীর শমসের গাজী নেই, কিন্তু আজও তার বীরত্বগাথা ও শিল্পমনের পরিচয় বহন করছে প্রাচীন এ দিঘি। প্রায় চার শতকের ব্যবধানেও কালের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। শমসের গাজীর দিঘি খনন সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়–প্রায় চার'শ বছর আগে খণ্ডল পরগনার (বর্তমান ফেনী জেলার, পরশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ) তৎকালীন শাসক, ব্রিটিশ বেনিয়াদের অন্যতম দমনকারী শমসের গাজী এ দিঘি খনন করেছিলেন। পাঁচ'শ মাটিয়ালের দীর্ঘ তিন বছর সময় লেগেছিল দিঘিটি খনন করতে। বহুল প্রচলিত এ তথ্য নিয়ে কারো দ্বিমত বা কোনো বিতর্ক না উঠায় তা-ই সত্য ঘটনা বলে গণ্য হয়ে থাকে। কালের সাগরে হারিয়ে গেছে শত শত বছর, কিন্তু আজও দিঘিটি সগৌরবে নিঃশব্দে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এ দিঘির আয়তন পাড়সহ প্রায় ১৮ একর। পরশুরাম পৌরসভার সাতকুচিয়া গ্রামের ছাগলনাইয়া-পরশুরাম সড়কের পশ্চিম পাশে এর অবস্থান। এলাকার প্রবীণ লোকেরা জানান, শমসের গাজী যখন এ দিঘি খনন করছিলেন, তখন এর আশপাশে কোনো জনবসতি ছিল না। পানির সন্ধান পেয়ে গড়ে উঠে ঘর-বাড়ি। প্রতিদিন জীবনের কোলাহলে মুখরিত হয় দিঘি। বছর জুড়েই এখানে থাকে চেনা-অচেনা হাজারো পাখির আনাগোনা। শীতকালে পরিযায়ী পাখির ডানা ঝাপটানো আর কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠে দিঘি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। গ্রামের দুরন্ত শিশু-কিশোর পানিতে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। দিঘির সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করা যায় প্রাণ উচ্ছল করা শীতল অনুভূতি। দিঘির কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ পানি শরীর ও মনে স্পন্দন জাগায়। এলাকার ভ্রমণ পিপাসু লোকদের জন্য এটি পর্যটনের অন্যতম স্থান হিসেবে বিবেচ্য। দূরদূরান্ত থেকেও অনেকে আসে শমসের গাজী দিঘি দেখতে। দিঘিটি দেখলে মনে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর মাঝে এ দিঘি নিয়ে নানা রোমাঞ্চকর কাহিনি প্রচলিত আছে। এর একটি এরূপ–'বহু বছর আগে দিঘির পাড় দিয়ে নববধূ নিয়ে নতুন বর যাচ্ছিল। চার বেহারার পালকিতে বসেছিল ঘোমটা দেয়া বউ। নববধূর চোখ গিয়ে পড়ল দিঘির মাঝখানে একটি ফুটন্ত শাপলা ফুলের উপর। নববধূ সাথে সাথে পালকি থামানোর নির্দেশ দিল বেহারাদের। নেমেই

www.pathagar.com

কাউকে কিছু না বলে ছুটলো শাপলা ফুলের পানে। তাকে বাধা দিল তার স্বামী। বাধা পেয়ে সে চিৎকার করে বলে–আমাকে কেউ বাধা দিও না, মধ্য দিঘির শাপলা আমায় ডাকছে। অতঃপর নববধূ দিঘির জলে নেমে যায়, আত্মীয়তার কোনো বন্ধনই তাকে আটকাতে পারেনি। এক সময়ে মধ্য দিঘিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় নববধূ।

স্থানীয় অধিবাসী গিয়াস উদ্দিন ও আকরাম হোসেন জানান, এক সময় জিন-পরী, দেও-দানব, ভূত-প্রেতের আশ্রয়স্থল ছিল এ দিঘি। সভ্যতার বিবর্তনে এসব কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হয়। বর্তমানে দিঘির দুই পাশে বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। পড়ন্ত বিকেলে গাছের ছায়া দিঘিতে এসে পড়লে স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শমসের গাজীর দিঘির পাশেই রয়েছে 'একখুইল্লা' নামের একটি সুড়ঙ্গ পথ। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এ সুড়ঙ্গের ভিতরে শমসের গাজীর অস্ত্রাগার ছিল। সুড়ঙ্গের বেশির ভাগ অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত।[৩]

বর্তমানে শমসের গাজী দিঘিটি সরকারি ১ নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত। স্থানীয় সাতকুচিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পাঁচ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে দিঘিতে মাছ চাষ করেছে। মাদ্রাসা সুপারিন্টেডেন্ট মাওলানা রশিদ আহমদ জানান, দিঘিটি আমরা দেখভাল করছি। দিঘির আয় নতুন নির্মাণাধীন মসজিদে ব্যয় করা হচ্ছে।

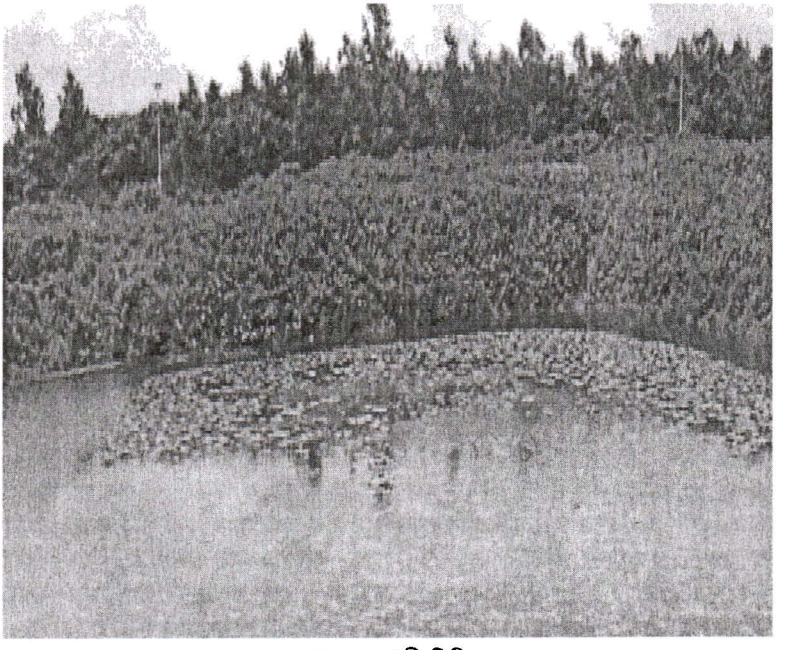

শমসের গাজী দিঘি

www.pathagar.com

শমসের গাজী দিঘির সুড়ঙ্গ পথ

বনওয়ালা দিঘি

মির্জানগর ইউনিয়নের সুবার বাজার-সত্যনগর সড়কের পাশে আশ্রাফপুর গ্রামে এ দিঘির অবস্থান। দিঘির আয়তন ছিল প্রায় ৫ একর। ব্রিটিশ শাসনামলের সময়ে এলাকাটি খণ্ডল পরগনা নামে পরিচিত ছিল। খণ্ডল পরগনার শাসক ছিলেন বাংলার ভাটির বাঘ খ্যাত শহিদ বীর শমসের গাজী। তার সময়ে এখানে মগ জাতিরা বসবাস করতো। জায়গাটি ছিল ঘন বন-জঙ্গল আর আগাছায় পরিপূর্ণ। মগরা পানির প্রয়োজনে দিঘিটি খনন করে। বাংলা থেকে তৎকালীন সময়ে কুকী সম্প্রদায়ের বিতাড়নের পর মগ সম্প্রদায়ও এ এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তারা ভারতের বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস শুরু করে। তারা চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন দিঘিটি ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। পরে স্থানীয় লোকজন বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে দেখতে পায় বিশাল আয়তনের একটি দিঘি। সেই থেকে এর নামকরণ হয় বনওয়ালা দিঘি। ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি ঢলে এ দিঘির পূর্ব পাড় ভেঙে দিঘিতে মিশে যায়। কালের আবর্তনে দিঘির অনেকাংশ ভরাট হয়ে গেলে স্থানীয়রা এটিতে ধান চাষাবাদ শুরু করে। তবে দিঘির তিনটি পাড় এখনও অক্ষত আছে। বিলুপ্ত দিঘির পাড়ে ব্যক্তিমালিকানায় বনায়ন করা হয়েছে। আশ্রাফপুর গ্রামের আলী মিয়া চৌকিদার জানান, তাদের বাপ-দাদারা বলেছে, এক সময় দিঘির অনেক গভীর ছিল। বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। স্থানীয় লোকজনের পানির

www.pathagar.com

একমাত্র উৎস এই বনওয়ালা দিঘি। ষোলোশ শতকের কোনো এক সময়ে মগ সম্প্রদায় এই দিঘিটি খনন করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বেশ কয়েকটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল দিঘির মধ্যে। দিঘির পাড় ছাড়াও ভিতরের জমিতে স্থানীয়রা ধান চাষাবাদ করছে। তবুও এটিকে স্থানীয়রা বনওয়ালা দিঘি বলে ডাকে।

উজিরের দিঘি

১৯৪৭ এর আগে ইংরেজ আমলে উজিরের দিঘি সংলগ্ন পাঁচটি গ্রামে এক সময় মহামারী শুরু হলে গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এলাকা। এখানে যে একটি দিঘি আছে তাও লোকজন জানত না। ১৯৪৭ এর পর এই এলাকায় জনবসতি গড়ে ওঠে। পশ্চিমদিকে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা। ওখান থেকে গরু গো-চারণ ভূমিতে ঘাস খেতে আসে। গরুগুলো দিঘির পানি খেত। গরুর মুখ ভেজা দেখে একসময় লোকজন গরু কোথায় পানি খায় তা জানার জন্য আগ্রহী হয়। এইভাবে উজিরের দিঘির অস্তিত্ব লোকজন জানতে পারে। ১৯৪৭-এর পর এই এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠে।

এ এলাকায় বড়ো বড়ো লম্বা কবর দেখে ধারণা করা যায় যে, মুসলমানদের আদি পুরুষ এখানে বসবাস করতো। মহামারীর পূর্বে এই এলাকায় হিন্দু জনবসতি ছিল বলে ধরণা করা যায়। ১৯৭৭ সালে উজিরের দিঘি প্রথম সেচা হয়েছিল। উজিরের দিঘিতে ৭টা স্তর আছে। পাড় থেকে দিঘির গভীরতা ৩০ ফুট হবে।

'উজিরের দিঘি যুবকল্যান সমবায় সমিতি'র উদ্যোগে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে এই দিঘিতে একটি মৎস্যচাষ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দিঘি সংলগ্ন ঈদগা, মসজিদ, কবরস্থান ও মক্তব উন্নয়নে এই সমিতি আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। পাঁচটি গ্রাম : দুর্গাপুর, নোয়াপুর, পশ্চিম সাহেবনগর, মধুগ্রাম, মনিপুরের ২৩৭ জন বিভিন্ন পেশার লোক–কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নারী এই সমিতির সদস্য।

দিঘির পানি শোধন করে মৎস্য চাষের জন্য সিলোনিয়া নদীর শাখা খাল থেকে পানি দিঘিতে আনা হয়েছে। ঘন পানিতে মাছ হয় না। পানি replace করতে হয়। পাম্পের সাহায্যে দুই ভাগ পানি শীতকালে শ্যালো মেশিন দিয়ে উঠিয়ে দিঘিতে দেয়া হয়। এভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিজয় সিংহ দিঘি

ফেনীর ঐতিহ্যবাহী দিঘির মধ্যে বিজয় সিংহ দিঘি অন্যতম। বাংলার বিখ্যাত সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের অমর কীর্তি এ বিজয় সিংহ দিঘি। চারিদিকে উঁচু পাড় ঘেরা এই দিঘি শত বছরের প্রাচীন ইতিহাস বহন করছে। কথিত আছে যে রাজা বিজয় সিংহের আমলে মাকে খুশি করার জন্য রাজা দিঘিটি খনন করেন। এ দিঘি ফেনী শহরের প্রায় ২ কিমি. পশ্চিমে বিজয় সিংহ গ্রামে ফেনী সার্কিট হাউজের সামনে অবস্থিত। এ দিঘির আয়তন ৩৭.৫৭ একর। অত্যন্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এ দিঘির চৌপাড় খুব উঁচু ও বৃক্ষশোভিত। স্থানীয়দের মতে এই দিঘিতে সোনা এবং রূপার থালা ভেসে উঠতো। একদিন এক ভিখারিণী একটা থালা চুরি করার

www.pathagar.com

পর থেকে আর এই থালা ভেসে উঠে না। এখন পর্যন্ত এই দিঘি পুরোপুরিভাবে সেচ দিতে পারেনি কেউ। এখনো মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসে এই দিঘিতে গোসল ও পানি পান করার জন্য। এই দিঘিতে অনেক বড়ো মাছ পাওয়া যেত, যার ওজন হতো ৮০-১০০ কিলো। ১৯৯৫ সালে ফেনীর প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব এ.এইচ.এম নূরুল ইসলাম প্রচুর বৃক্ষচারা রোপন করে বর্তমান এ পরিবেশের সৃষ্টি করেন। বর্তমানে এটি সরকারি মালিকানাধীন এবং এর উত্তর পাড়ে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবন। মানুষের আগ্রাসনে এটির পাড় এবং পাড়ের গাছগুলো মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন। দিঘিটিতে ছুটির দিন ছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক মানুষের সমাগম হয়।[৪]

বিজয় সিংহ দিঘি

রাজাঝির দিঘি

ফেনী শহরের জিরো পয়েন্টে এ দিঘির অবস্থান। জনশ্রুতি আছে ত্রিপুরা মহারাজের প্রভাবশালী একজন রাজার কন্যার অন্ধত্ব দূর করার জন্য প্রায় পাঁচ-সাত শত বৎসর পূর্বে এ দিঘি খনন করা হয়েছিল। স্থানীয় ভাষায় কন্যাকে ঝি বলা হয়। ১৮৭৫ সালে ফেনী মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সদর দপ্তর গড়ে তোলা হয় এই রাজাঝির দিঘির পাড়ে। দিঘির পাড়ে বর্তমানে ফেনী সদর থানা, ফেনী কোর্ট মসজিদ, অফিসার্স ক্লাব, জেলা পরিষদ পরিচালিত শিশুপার্কসহ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন গড়ে উঠেছে। মোট ১০.৩২ একর আয়তন বিশিষ্ট এ দিঘিটি ফেনীর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের একটি।[৫]

www.pathagar.com

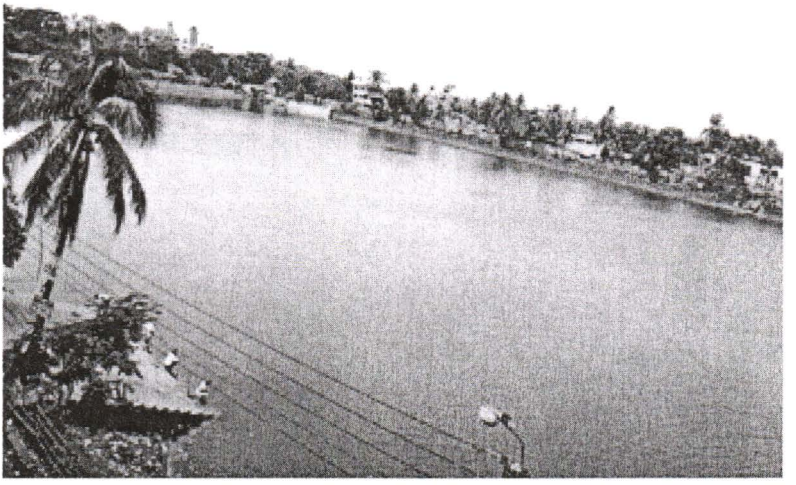

রাজাঝির দিঘি

খ. লোককবিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে ফেনীর এক চারণ কবি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

ওহ ভাই কালের গতি-
সাধ করি কি মাথায় দিলাম ডাট ভাঙ্গা ছাতি।
হাতীয়ে উলানী ডরায়, ভূতে ডরায় বৈদ্য,
রেশান কার্ডের উপর গেছে মানব জাতির খাদ্য।
ঘরের চালে ছাউনী নাই, অতিথ দাওয়াত করে,
কচুর ছড়ার ডাল খাই, বৌকে ধরি মারে।
চালের নামে পাথর দিল, সেরে মিলে তিন পোয়া,
কোন হপ্তায় যদিও মিলে, কোন হপ্তায় একবারও না।
ভাই-বোনে ঝগড়া করে ভাতের ফেনের তরে,
পরিণতিতে খুনাখুনি ঘটছে ঘরে ঘরে।
ফুড কমিটির মেম্বাররা হৈল বড় লোক
যাদের খাদ্য মারি খাইল, তারা নাকি ছোট লোক।[৬]

www.pathagar.com

পরশুরামের কবি মদন ধূপী কুকী হামলার উপর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিতার রচনা কাল ১২৬৯ ত্রিপুরাসন তথা ১৮৫৭ সাল। তার কবিতায় খণ্ডলের চৌদ্দটি মৌজার উপর কুকীদের দস্যুবৃত্তির চিত্র ফুটে উঠেছে। নিম্নে তার কবিতার অংশ বিশেষ দেয়া হলো :

মাঘ মাসে শনিবারে শ্রী পঞ্চমী ছিল।
মুন্সীরখিল বাজারে সেদিন দুরান্তর আসিল।
সেদিন প্রভাতকালে করিয়াছে পূজার আয়োজন
চিনি সরকরা আনে যত লাগে মন ॥
পূজা আরম্ভিলে ২ হেন কালে প্রমাদ ঘটিল।
আচনক ত্রিপুরা কুকী আসি দেখা দিল।
তাদের দাও ছিল হাতে বন্দুক কাঁধে দেখতে ভয়ঙ্কর
তা দেখিয়া প্রাণের ভয়ে ধায় দূরান্তর।
বন্দুকের ধূলাধূলি ২ মারে গুলি তা শুনিতে পাই।
কত শত আইছে কুকী লেখা জোখা নাই ॥
আগে পদ্ম ঘোনা-২ ফেৎরাঙ্গা, নরইন্যা কাটিল।
নরইন্যা কাটিয়া তারা গুথুমা ঢুকিল ॥[৭]

গ. পুথিসাহিত্য

পূর্বে ফেনী জেলার গ্রামেগঞ্জে নিয়মিত পুথিপাঠের আয়োজন হতো। বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে পুথিপাঠের আসর উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করতো। শরতের চাঁদনী রাতে বসতো কীর্তন, কেচ্ছার আসর আর পুথিপাঠের আসর। সাধারণত মুসলমান বাড়িতে পুথিপাঠের আসর অধিক জনপ্রিয় ছিল। পুথি পাঠকের উপস্থাপনা ও সুরের বাহাদুরী গুণে বড়োদের পাশাপাশি ছোটোরাও রাত জেগে উপভোগ করতো পুথিপাঠ। তিরিশের দশক পর্যন্ত এ অঞ্চলে শমসের গাজীর পুথি, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সওদাগর, গাজী কালু, লায়লী-মজনু ও কারবালার কাহিনির উপর রচিত পুথি খুব জনপ্রিয় ছিল। পুথিপাঠের জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন পাঠকের তখন সমাদর ছিল খুব বেশি।[৮]

একসময় সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে শমসের গাজীর পালা ও পুথিপাঠ বহুল প্রচলিত ছিল। দাদা-দাদি, নানা-নানির মুখে শমসের গাজীর বীরত্বগাথা ও অলৌকিক কেচ্চা-কাহিনি শুনতে শুনতে এক সময় ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়তো। শমসের গাজীর সংগ্রামী জীবনালেখ্য নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবি শেখ মনোহর সেকালের বিখ্যাত 'গাজীনামা পুথি' রচনা করেছিলেন। সে আদি পুথি এখন আর পাওয়া যায় না। আরও পরবর্তীকালে কুমিল্লার মৌলবী লুৎফুল খবীর 'শমসের গাজী পুথি' নামে অন্য একটি কাব্য রচনা করেন। গাজীর বীরত্বগাথা উক্ত পুথিদ্বয়ের কবিতা, প্রবচন এক সময় ফেনী, কুমিল্লা ও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মুখে মুখে ছিল। শমসের গাজীর পৈতৃক পরিচয় ও পিতার আদি নিবাস সম্পর্কে কবি শেখ মনোহরের গাজীনামা পুথিতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

ওমরাবাদে ছিল বজরা কাছারী
ছিলেন আবদুল্লাহ খান তার অধিকারী ॥
পীর মুহাম্মদ খান ছিলেন সোদর তাঁহান।
বেদরাবাদে আসেন তেজী সেই স্থান ॥

দক্ষিণশিকের চোর ডাকাত ও দস্যুদের উপদ্রবের পটভূমিতে শমসের গাজীকে পানুয়াঘাটের সেনাপতি পদে দেখা যায়। এ পর্যায়ে গাজীর পৈতৃক নিবাস ওমরাবাদ-বেদরাবাদ থেকে অনেক আত্মীয়-স্বজন দক্ষিণশিকে এসে গাজীর সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে তাঁর জ্ঞাতি ভাই ছাদু পালোয়ান ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পানুয়াঘাট কেল্লার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের পর তার সাফল্য সম্পর্কে গাজীনামায় বলা আছে :

পাইয়া চাকুরী গাজী ছাদুর সংহতি,
পানুয়া ঘাটেতে গেলা অতি হৃষ্টমতি।
ঘাট কেল্লার মাঝে যবে গাজী-ছাদু আইল
আশে-পাশে রাষ্ট্র নাম তাহাদের হইল।

শমসের গাজী ও তার ভাই ছাদু পালোয়ান দক্ষিণশিকের চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি বন্ধে বিশেষ ভূমিকা নেন। এর ফলস্রুতিতে বহু চোর ডাকাত তাদের হাতে বন্দি হয়। তারা শমসের গাজীর কাছে নিবেদন করে :

ব্যবসা হৈল বন্ধ পরিবার মরে,
ছেড়ে দাও মোদের দুঃখীদের তরে।
আমরা যতক আছি তোমার কিংকর,
যখন যাহা কহিবে তাহা করিব সত্বর।
করেছি প্রতিজ্ঞা মোরা তোমার চরণে,
তোমার দেশে ডাকাতি করিব না আর।

দক্ষিণশিকের জমিদার কন্যা দৈয়্যা বিবিকে বিয়ের জন্য শমসের গাজী জমিদারের কাছে দূত পাঠান। জমিদার নাসির মুহাম্মদ প্রস্তাব শুনে ক্ষেপে যান এবং শমসের গাজীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। অবশেষে শমসের গাজী এক লাঠিয়াল বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং লোকমান হাজারীর নেতৃত্বে নাসির মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জমিদারের বাহিনীর সাথে শমসের গাজীর বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে নাসির মুহাম্মদ নিহত হন। কবির ভাষায় :

বাহিরে দাঁড়াইয়া (নাসির মুহাম্মদ) দেখে নাই কোন সুহৃদ,
লোকমান হাজারী নামে এক বলবন্ত বহুত;
বুক ভেদী পৃষ্ঠ ছেদি শেল বাহিরিল,
আর একজন আসিয়া মাথা কাটি নিল।

নিহত জমিদার নাসির মুহাম্মদ চৌধুরীর প্রধান দেওয়ান কোনো মতে প্রাণ নিয়ে ত্রিপুরা রাজধানীতে গিয়ে বলেন :

শমসের গাজী ছাদু পালোয়ান।

www.pathagar.com

নাসির মুহাম্মদ মারি কৈল্য অপমান ॥
সবংশে বিনাশ হৈল জমিদার পুরি।
পলাইয়া আইনু হেথা থাকিতে না পারি।

এরপর শমসের গাজী ত্রিপুরা মহারাজার দক্ষিণশিকের জমিদারকে উচ্ছেদ করার জন্য বাছাই করা যুবকদেরকে মাসিক বেতন দিয়ে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। পুথির ভাষায় :

জনপ্রতি পাঁচ টাকা মাস হারা করি
তিন হাজার লোক হৈল বিক্রম কেশরী।
কামান, বারুদ, গোলা, বন্দুক সাজাইল
গুলাল রাই বাঁশ বহুত আরও জমাইল।
লাঠি ঢাল তলোয়ার আরও বহুপদ
আর যত যোগাড় কৈল্য খাবার রসদ।

এভাবে শমসের গাজীর পুথি গাজীর জীবনের নানা বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে তুলে ধরে। শমসের গাজীর পুথি এ অঞ্চলের মানুষের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯]

ফেনীর পূর্বাঞ্চলের সমতল ভূমিতে কুকী দস্যুদের হামলা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে এক সময় পুথি ও কবিতা রচিত হয়েছিল। কুকী হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে খণ্ডলের কবি গুল বক্স পুথিতে লিখেছেন :

কাহার লুঠিল বস্ত্র, কার বুকে হানে অস্ত্র।
দয়া ধর্ম নাই কদাচিত ॥
করিয়া বহুল রণ। লুঠি লই গেল ধন
ধন পাই পুরিল বাঞ্ছিত ॥
মাতৃ সনে পুত্র কাটে; রক্তস্নান কৈল মাঠে
গৃধ্য নাচে করি রক্তপান ॥
কাকস নিধড় জাই। রক্ত সিংহাসন পাই।
মাংস খায় কবি রঙ্গনন ॥
লক্ষে লক্ষে ধায় নর। ছাড়ি নিজ বাড়িঘর।
নিজ পুত্র না চাহে ফিরিয়া ॥
তাহার দুর্গতি দেখি। কান্দে জথ বনপাখি ॥
মাঠে শির পড়িছে দেখিয়া ॥
যুবক-যুবতী নারী। ধাই গেল গৃহছাড়ি।
সিগ্রগতি নৈদানে ছাড়িল ॥
আর যত ছিল নারী আছিল হামিলদারি।
সে মৈদানে সিসু প্রসবিল ॥

কুকী দস্যুরা কোলাপাড়া গ্রাম আক্রমণ করতে এলে সে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি গুনাগাজী মজুমদার দস্যুদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবির ভাষায়

www.pathagar.com

গুনাগাজী মজুমদার "মহাযুদ্ধে প্রভেসিল তেজিয়া প্রমাদ"। তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে কুকী দস্যুরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। কোলাপাড়া গ্রামে গুনাগাজী মজুমদারের কবর রয়েছে। কবরের গায়ে গুনাগাজীর মৃত্যু সন ১২৯৩ বাংলা তথা ১৮৮৬-৮৭ সাল উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য, কবি গুল বক্সের কাব্যটির পাণ্ডুলিপির ৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গুনাগাজী মজুমদারের বাড়িতে পাওয়া গেছে।[১০]

বর্তমানে টেলিভিশন ও ক্যাসেট প্লেয়ারের যুগে বিয়ে বাড়িতে বা কোনো উৎসবে আর পুথিপাঠের আসর তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা উৎসবের রাতে মাইক ও সিডি প্লেয়ার বাজিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করে। আধুনিক প্রযুক্তির জোয়ারে পুথিপাঠের মত গ্রামীন সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ হারিয়ে যেতে বসেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সুবেদার (অবসরপ্রাপ্ত) মিজানুর রহমান, গ্রাম : সলিয়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী, তারিখ : ১৪.০১.২০১৪

২. পেয়ার আহম্মদ, গ্রাম : কোলাপাড়া, ইউনিয়ন : বক্স আহম্মদ, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী; কাজী মো. তোফায়েল আলম (বাবর); নূরুল ইসলাম মজুমদার, বয়স : ৬৫ বৎসর, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

৩. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ.১১৪

৪. http://www.feni.gov.bd/node/504311

৫. http://www.feni.gov.bd/node/780209

৬. জমির আহমেদ, ফেনীর ইতিহাস, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৬৯

৭. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪২-১৪৩

৮. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৯৮

৯. জমির আহমেদ, ফেনীর ইতিহাস, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ৯৮-১০৪

১০. জমির আহমেদ, ফেনীর ইতিহাস, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৪০-১৪১

www.pathagar.com

গ্রাম/স্থান নাম

কোনো স্থানের নামকরণের ব্যাপারে নানা ধরনের জনশ্রুতি/কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। নামকরণের পেছনে বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তি বংশপরম্পরায় চালু রয়েছে। স্থান নাম সংক্রান্ত এসব কিংবদন্তি স্থানের নামকরণের ইতিহাস, জনগণের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

ছাগলনাইয়া

বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের ছাগলনাইয়া-পরশুরাম অঞ্চল সুদূর অতীতে জলাভূমি বা কোনো সাগরে লীন ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সে সাগরের নাম ছিল বিল্লাসাগর মতান্তরে সুখ সাগর। আদিযুগে ছাগলনাইয়ার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে পশ্চিমে লালমাটি বা পোড়ামাটির টিলা (ফেনী শহরের অদূরে অবস্থিত) পর্যন্ত সাগর বা নিম্নজলাভূমি পারাপারের জন্য ছিল ঘাট এবং নাইয়া বা নৌকার মাঝি। সে ঘাটের নাম ছিল রানীর ঘাট। কালের বিবর্তনে সে জলরাশি শুকিয়ে গেছে। ঘাটের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এখানে রানীরহাট নামে একটি বাজার এখনও আছে। আধুনিক ছাগলনাইয়ায় ফেনী সড়কের পাঁচ ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে দু'টি নদীসহ বেশ কয়েকটি সেতুর অবস্থান অতীতের জলভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে একসময় ছিল সাগরের নাইয়া বা নৌকার মাঝিদের বসতি। এখানে নৌকার বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সাগরের নাইয়া লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে সাগরনাইয়া এবং সাগরনাইয়া থেকে ছাগলনাইয়ায় রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ছাগলনাইয়া নামকরণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, ইংরেজ আমলের শুরুতে Sagor শব্দ ভুলক্রমে Sagol হিসেবে লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে Sagolnaiya বা ছাগলনাইয়া শব্দ প্রচলিত হয়ে যায়।

চাঁদগাজী বাজার

চাঁদগাজী ফেনীর পূর্বদিকে আধুনিক ছাগলনাইয়া ও ত্রিপুরা সীমান্তে একটি বহুল পরিচিত জনপদ। মোগল আমলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন চাঁদগাজী ভূঞা। তাঁর নামানুসারে চাঁদগাজী বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সোনাগাজী/সুজাপুর

মোগল সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করেই তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ সুজাকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন। বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই সুজা আরাকানী নৌ হামলা থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য মেঘনা নদীর

www.pathagar.com

মোহনা ও ফেনী নদীর ভাটি অঞ্চলে কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করেন। তিনি সোনাগাজীতে একটি দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁর নামানুসারে স্থানটি বর্তমানেও সুজাপুর নামে পরিচিত।

জয়লস্করা গ্রাম

স্থলপথে আরাকানী হামলা প্রতিহত করার জন্য শাহজাদা সুজার আমলে জয়লস্কর নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করা হয়েছিল। এই সেনানিবাসের প্রধান ছিলেন জয়লস্কর নামে একজন সেনানায়ক। তাই জয়লস্কর স্থানটি কালক্রমে জয়লস্করা নামে পরিচিত হয়েছে। জয়লস্করা বর্তমানে ফেনীর পশ্চিমে সুপরিচিত একটি গ্রামের নাম।

দাগনভূঁইয়ার

সুজার শাসনামলে অনেক মোগল রাজকর্মচারী ও সেনানায়ক নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়। তাঁরা বেতন বা অবসর ভাতার পরিবর্তে এখানে জায়গীর লাভ করেছিলেন। বাংলার বারভূঁইয়াদের কোনো এক উপবংশের মাতুভূঁইয়া ও দাগনভূঁইয়া নামে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সময় ফেনীর পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দাগনভূঁইয়া বর্তমানে ফেনীর একটি উপজেলার নাম।

একটি গ্রাম একটি বাড়ি

এককালে এখানে সাপ আর বাঘ বসবাস করতো। এখন বাঘ নেই। এই গ্রামের পশ্চিমে বর্ডার, উত্তর-পূর্বে বর্ডার, দক্ষিণে এই বাড়ি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এই গ্রামে তিন/চারটি বাড়ি আছে। এই গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। ফেলু মিয়া (৭৫) এই গ্রামের প্রথম বসতি স্থাপনকারী ব্যক্তি। তিনি ২০০১ সালে উত্তর চানপুর থেকে এখানে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস অমান্য করে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তিনি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন বলে জানান। ফেলু মিয়া গরু পালন করেন। তিনি একজন সাহসী পুরুষ। তিনি বলেন, 'জায়গা নাই বাসা নাই। এখানে খালি জমি পড়ে আছে তাই এখানে আসি।' ফেলু মিয়ার ছেলে আবদুল মালেক বলেন, 'মানুষ আসত না ভয়ের কারণে। আমরা আসার পরে মাইনষে বাগান করছে। জায়গায় কোনো মূল্য ছিল না। এককানি জমির বর্তমান মূল্য ১২ লক্ষ টাকা।' মোহাম্মদ আলী হোসেন সিলেটের সুনামগঞ্জ থেকে এসেছেন ঘরজামাই হিসেবে। শ্বশুরের নাম আবদুল মালেক ভুঁইয়া। 'একটি গ্রাম একটি বাড়ি' গ্রামে বর্তমানে চারটি বাড়ি রয়েছে।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. ইকবাল হোসেন, বয়স : ৩৬ বৎসর, গ্রাম : কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী; ফেলু মিয়া, বয়স : ৭৫ বৎসর, গ্রাম : একটি গ্রাম একটি বাড়ি, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মানসিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধেরও প্রকাশ ঘটে থাকে। ফেনী তথা নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষের আদি কৃষ্টি ও লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বহুকাল আগে থেকেই ফেনী অঞ্চলে মানুষের বাস। জীবনধারণের জন্য তাদের গৃহস্থালি উপকরণের প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা হাতের কাছে পাওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন গাছগাছালী থেকে আসবাবপত্র; মাটিকে আগুনে পুড়িয়ে বাসন-কোসন, হাঁড়ি-পাতিল, কলসি; বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, খাঁচা, মাছ ধরার চাইসহ নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা শুরু করে। বর্তমানে শিল্প ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে অনেক লোকশিল্পই বিলুপ্তপ্রায়। ফেনী জেলায় আজো যেসব শিল্প টিকে আছে তার মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, পাটি বা বটনি তৈরির শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১. মৃৎশিল্প

ছাগলনাইয়া থানার আঁধার মানিক গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামে আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগে ১২০ পরিবার রুদ্রপাল ছিল। বর্তমানে ৪০ পরিবার রুদ্রপাল আছে। ছাগলনাইয়া থানায় প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু চাষ হতো। গ্রামে গরু চালিত চাকা ঘুরিয়ে আখের রস সংগ্রহ করা হতো। এই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হতো উন্নতমানের গুড়। গুড় সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের কুমাররা তৈরি করতেন গুড়ের বা মিডার বড়ো বড়ো কলসি। তখন গ্রামে পানি রাখার জন্য মাটির কলস ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে গ্রামে আখের গুড় তৈরি হয় না। মাটির কলসিতে পানি খুব একটা রাখা হয় না। মাটির পাতিলে ভাত, ডাল, তরকারি রান্না করা হতো। বর্তমানে স্টিল এবং এ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে ভাত তরকারি রান্না করা হয়। কলসি, হাঁড়ি ও পাতিলের ব্যবহার না থাকার কারণে এই গ্রামের পালরা এগুলো তৈরি করে না। ০২.০৮.২০১৩ তারিখে দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামে ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে দেখা যায় যে, এই গ্রামে মেয়েরা পিঠার খোলা তৈরি করছেন। বর্তমানে গ্রামে এমনকি শহরেও পিঠার খোলার বেশ চাহিদা রয়েছে। শীতকালে গ্রামের লোকজন পিঠা খায়। মুসলমানদের কোরবানি ঈদ উপলক্ষে গ্রামে চাউলের ও আটার রুটি তৈরি হয়। পিঠাও তৈরি হয়। মাটির তৈরি খোলায় পিঠা তৈরি ও সেকা হয়। তখন পিঠার খোলার প্রচুর চাহিদা থাকে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের খোলার মান উৎকৃষ্ট। কারণ, এখানকার মইনা মাটিতে এমন উপাদান রয়েছে যা দিয়ে উন্নতমানের পিঠার খোলা তৈরি হয়। দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের সীমা রানী পালকে গাছের আতাইলের ওপর মাটির দলা রেখে মাটির পারা তৈরি করতে দেখা যায়। এরপর মাটির পারাকে কাপড়ের তেনা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিঠার খোলার আকৃতি দেওয়া হয়। খোলাকে দুই-তিন ঘণ্টা রোদে শুকাতে হয়। এরপর পুইনে সারারাত পোড়ানোর পর খোলা তৈরি হয়ে যায়।

দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের master artist বা নামকরা কুমার সুরেশ চন্দ্র পালের সঙ্গে আলাপ হয়। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭০। তাঁর নিকট থেকে এই গ্রামের গৌরবময় মৃৎশিল্পের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। তিনি বলেন, "একশ বছর আগেও এই গ্রামে ১২০ পরিবার রুদ্রপাল ছিল। নোয়াখালীর রামগঞ্জ বেগমগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর অনেক রুদ্রপাল ভারতে চলে যায়। বর্তমানে এই গ্রামে ৪০ পরিবার রুদ্রপাল আছে। আমি আমার বাবা বিভীষণ চন্দ্র রুদ্রপালের নিকট থেকে মাটির কাজ শিখি। ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। ১৯৭০ সালে মাটির কাজ শুরু করি। প্রথমে ছোটো দধির পাতিল বানানো শিখি। আস্তে আস্তে বড়ো কলসি, হাঁড়ি-পাতিল বানানো শিখি। চেরাগ রাখবার তাক হইতে সব কিছু বানাতাম। সিদ্ধির কলকি থেকে সব বানাতাম। এখন বড়ো কলসি, ছোটো কলসি, পাতিলের চাহিদা নেই।" সংলাপের সময় তিনি একটি মজার তথ্য দেন। তিনি জানান, বৃন্দাবনী হুঁকা ছিল নামকরা হুঁকা। অভিজাত শ্রেণির লোকজন এই হুঁকায় তামাক খেতেন। বিডিআর-এর হাবিলদার মোহাম্মদ আলীকে তিনি ২০ বছর আগে বৃন্দাবনী হুঁকার জন্য মাটির কলকি তৈরি করে উপহার দিয়েছিলেন। হাবিলদার মোহাম্মদ আলী জগন্নাথ দিঘি বিডিআর ক্যাম্পে বদলি হয়ে আসার পর সুরেশ চন্দ্র পালের নিকট থেকে মাটির কলকি ক্রয় করে নিয়ে যান। তখন একটি কলকির দাম ছিল মাত্র ২ টাকা।[১]

উত্তর আঁধার মানিক গ্রামে মাটির খোলা তৈরির প্রক্রিয়া

উত্তর আঁধার মানিক গ্রামে দুটি পরিবার মাটির খোলা তৈরি করেন। এই গ্রামে নারী মৃৎশিল্পীরা পিঠার খোলা তৈরি করে। পুরুষরা কৃষিকাজ করে। তাদের নিজেদের জমি নেই। বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

মাটি সংগ্রহ

জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। এটি 'মইনা মাটি' নামে পরিচিত। বর্তমানে এক ট্রাক মাটির মূল্য ১০০০/- টাকা থেকে ১২০০/- টাকা। এক ট্রাক মাটি দিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ মাটির খোলা তৈরি করা যায়। জমি খুঁড়ে মাটি তোলা হয়। সংগৃহীত মাটি ট্রাকযোগে বাড়িতে এনে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়। মাটি থেকে পাথর ময়লা বের করার জন্য বালু দিয়ে চইটতে হয়। পা দিয়ে মাড়িয়ে মাটি পরিষ্কার করা হয়। মাটির তৈরি 'দলা' দিয়ে মাটির পারা তৈরি করা হয়। এরপর কাপড়ের তেনা দিয়ে পারাকে খোলার আকৃতি দেওয়া হয়। এরপর খোলা রোদে শুকানো হয়।

www.pathagar.com

খোলা পোড়ানোর পুইন

মাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে পুইনের ওপর ঢাকনা দেওয়া হয়। খোলা পোড়ানোর জন্য পাহাড় থেকে লাকড়ি কেটে আনা হয়। ৬০০ খোলা একসঙ্গে পোড়ানো যায়। ৬০০ খোলা পুইনে পোড়ানোর জন্য ১০০০/- টাকা থেকে ১২০০/- টাকার লাকড়ি ক্রয় করতে হয়। ৬০০ খোলা বিক্রি হয় ৬,০০০/- টাকা। একদিন একরাত পোড়ানো লাগে। এই গ্রামের সন্ধ্যারানী পালকে পিঠার খোলা তৈরি করতে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী নাই। এগিন বাদে (এসব কাজ ছাড়া) পথ নাই।' এই গ্রামের আর এক মৃৎশিল্পী দুলু রানী পালকেও খোলা তৈরি করতে দেখা যায়।

তাঁরা বলেন যে, কোরবানি ঈদে খোলার চাহিদা বেশি থাকে। তখন চিতল পিঠা, খোলাজা পিঠা, আটার রুটি, চালের রুটি বানানো বা সেকার জন্য মাটির খোলা বা তাবা ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে কাজ কম থাকে। শুকনো মৌসুমে মাটির কাজ বেশি হয়।

আর একজন মৃৎশিল্পী অনিতা রানী পাল বলেন, 'আগে মিডার (গুড়) কলস, পাতিল, জলের কলস তৈরি হতো। বর্তমানে এগুলো চাহিদা নেই।' ১ মণ ৫ সের গুড় রাখা যেতো গুড়ের কলসে। বর্তমানে এগুলোর চাহিদা বা ব্যবহার না থাকাতে তৈরি হয় না। পিঠার খোলার চাহিদা বেশি থাকায় বর্তমানে উত্তর আঁধার মানিক ও দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামে পিঠার খোলা তৈরি হয়। এখানে তৈরি পিঠার খোলা বৃহত্তর নোয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়।

পা দিয়ে মাটি মাড়ানো হচ্ছে

www.pathagar.com

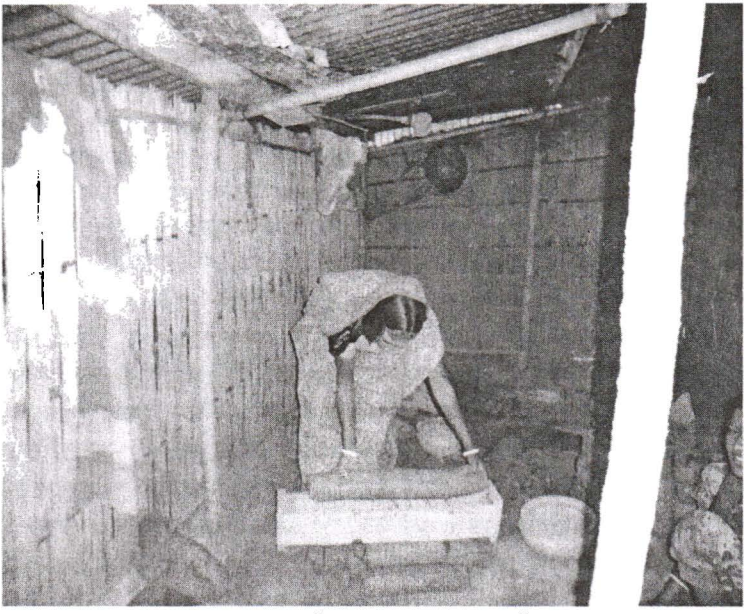

আতাইলের ওপর মাটির দলা রেখে পারা তৈরি হচ্ছে

হাত দিয়ে নরম মাটিকে পাত্রের আকার দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

মাটি দিয়ে তৈরি পিঠার ছাঁচ রোদে রাখা হয়েছে

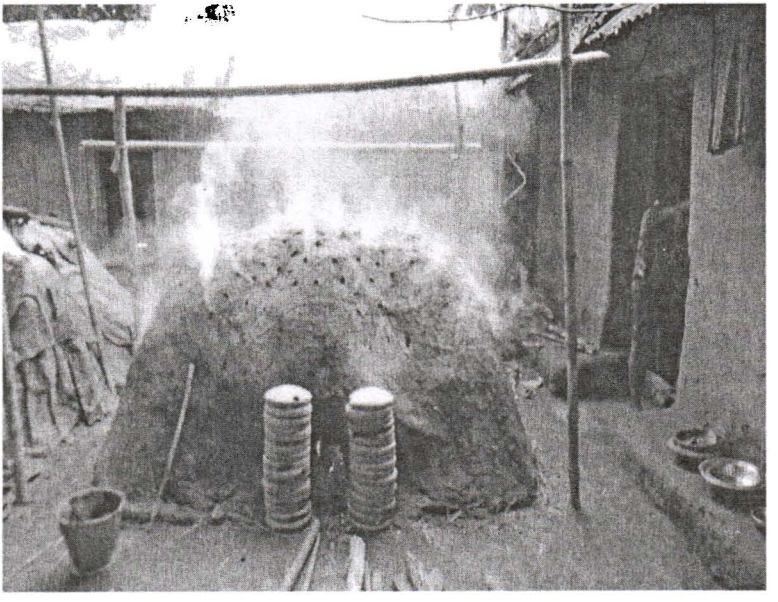

পুনে মাটির তৈরি সরঞ্জাম পোড়ানো হচ্ছে

www.pathagar.com

পুনে পোড়ানোর পর মাটির পাত্র স্তূপ করে রাখা হয়েছে

মাটির তৈরি সরঞ্জাম

www.pathagar.com

পরশুরাম থানার বাউর পাথর গ্রামে মাটির কাজ

বাউর পাথর গ্রামে নিতাই পাল, মানিক পাল, মরণ পাল, বাদল পাল, দিলীপ পাল মাটির কাজ করেন। মেয়েরা দইয়ের পাতিল, ছোটো ঘট, পিঠার খোলা, তরকারির কড়াই, বাতির থাক (এর ওপর জলবাতি রাখা হয়), ছোটো ধুপতি, বড়ো ধুপতি তৈরি করেন। তাছাড়া মাটির হইরনি তৈরি হয় এই গ্রামে। মাটির হইরনি আগের দিনে ডাল, গোস্ত, তরকারি রান্নায় ব্যবহার হতো।

বাউর পাথর গ্রামের পাথর বা জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। এই মাটি মইনা মাটি নামে পরিচিত। বদইল্যা বা শ্রমিক এক খাদা বা গর্ত খুঁড়লে ১০০০ টাকা থেকে ১২০০ পান টাকা। জমি থেকে সংগৃহীত মাটি বাড়িতে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর মাটি থেকে পাথর, ময়লা পরিষ্কার করার জন্য পা দিয়ে মাড়ানো হয়। আঞ্চলিক ভাষায় এই কাজকে 'ঠ্যাংদি চডন' বলে।

বাউর পাথর গ্রামের মানিক পাল (৬৫) লক্ষ্মীর মূর্তি তৈরি করেন। প্রথমে মাটির তৈরি হাজ বা mould-এ লক্ষ্মীর মূর্তি উঠান। হাজে বা হাত দিয়ে টিপে টিপে মূর্তির গড়ন তৈরি করেন। হাজ থেকে উঠিয়ে রোদে শুকানো হয়। দুই/তিন দিন শুকাতে হয়। শুকানোর পর রং করা হয়। হলুদ, লাল, সবুজ, কালো রংয়ের লেপ দেয়া হয়।

বাউর পাথর গ্রামের বিজলি রানী পাল মাটির পাতিল তৈরি করেন। তেনা দিয়ে মাটির সরার ওপর রেখে বা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডান হাত ও তেনার সাহায্যে বিজলী রানী পাল পাতিলের রূপ দিয়ে থাকেন। পাতিলের কান্দা সমান করেন চিলইন বা শামুকের খোলস দিয়ে। পাতিল ছাড়াও প্লাস্টিকের mould-এ মনসা পূজার নাগঘট তৈরি করেন বিজলি রানী পাল। নাগঘটে জল-ফুল রাখা হয়। মনসা পূজার সময় বছরে একবার শুধু নাগঘট বিক্রি হয় জোড়া ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা করে।

পরশুরামের বাউরপাথর গ্রামের মানিক পাল

www.pathagar.com

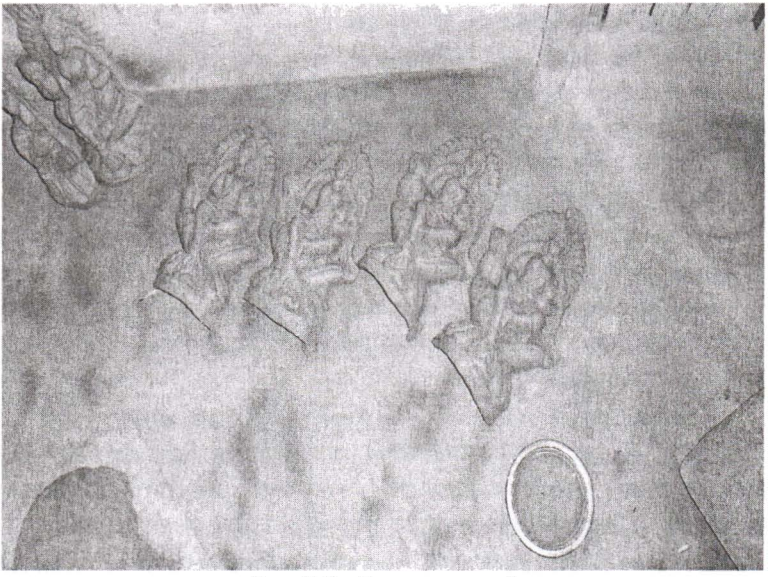

লক্ষ্মীর মূর্তি তৈরির mould বা ছাঁচ

রং করার পর মাটির তৈরি মূর্তি

www.pathagar.com

২. বাঁশবেত শিল্প

সোনাগাজী উপজেলায় বাঁশবেত শিল্প

সোনাগাজী উপজেলা কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষিকাজ এবং গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য এই উপজেলায় বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : হাজারি, বাঁশের খাঁচা, কোরা, মুরগির খাঁচা, ওড়া, কুলা, ধোচনা প্রভৃতি।

২০.১১.২০১৩ তারিখে প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী সোনাগাজীর মধ্যম চরচান্দিয়া গ্রামে দক্ষিণ সরদার বাড়িতে বাঁশ বেতের কাজ দেখার জন্য যান। সোনাগাজীর মধ্যম চরচান্দিয়া গ্রামের দক্ষিণ সরদার বাড়ির রাহেলা আক্তার বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করেন। পাঁচ সন্তানের মা রাহেলা আক্তার আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী এবং স্বাবলম্বী একজন মহিলা। তাঁর স্বামী আহছান উল্লা বর্গা চাষ করেন। নিজেদের কোনো জমি নেই। রাহেলা আক্তার সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশ বেত দিয়ে কোরা, খাঁচি, ওড়া ইত্যাদি তৈরি করেন। তিনি বলেন, "প্রথমে বাঁশ দা দিয়ে কেটে হল্লা (টুকুরা) করতে হয়। বুক ফালাই দিতে হয়। দা দিয়ে বেতা উঠাতে হয়, তারপর বেতা দা দিয়ে চাঁছতে হয়। রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। রোদ না থাকলে চুলায় আগুনের তাপ দিয়ে শুকানো হয়। প্রথমে তলি বানাতে হয়। কোণা ফিরাই বানানো হয়। এরপর বাঁশের চাক লাগাতে হয় প্লাস্টিকের সুতা দিয়ে। প্লাস্টিকের 'তছর' দিয়ে চাক বাঁধতে হয়। কাছা বান্ধা হয়। সবকিছু বানাতে একই জো। লাই খাঁচায় একই বাইন, একই বান, একই বেতা।"

সন্তানদের লেখাপড়া শিখানোর ব্যাপারে রাহেলার রয়েছে প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি বলেন, "আঁর দিনে মা বাবার অভাব ছিল। লেখাপড়া শিখতে পারিনি। আমার সন্তানদের ষোল আনা লেখাপড়া শিখামু। আমি অনেক চেষ্টায় আছি। আমি ইসলামি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। খুব উন্নতি হয়েছে। ধান খোন্দ আছে। আমার স্বামী তিন কানি জমি বর্গা চাষ করে। বেত চাঁছি দেয়। আমরা সবাই মিলিজুলি কাজ করি।"[২]

পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় বাঁশবেত শিল্প

পরশুরাম-ফুলগাজীর বাঁশ ও বেত শিল্প এখনও তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। উপজেলার কিছু গ্রামে এ শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই এই পেশার উপর জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এ কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে দুই উপজেলার প্রায় শতাধিক পরিবার তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। বাঁশ ও বেত দ্বারা এই এলাকায় তৈরিকৃত পণ্যগুলো হলো– লাই, গোলা, কুলা, ডালা, খাঁচা, ওড়া, ঝাঁকা, হাজারি, ঢুলা, মোড়া, চাই, ঢুব, জোংগাইর, হাত পাখা, হাফটা, মই দোড়া, আন্তা, জাফইন ইত্যাদি।

এসব পণ্য তৈরির নিয়ম হচ্ছে, প্রথম ধাপে বাঁশ কেটে চেঁছে পাতলা চটা তৈরি করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি চ্যাপ্টা ও বাকিগুলো চিকন বেতি তৈরি করে নিতে হয়। দ্বিতীয় ধাপে ৬-৮টি চ্যাপ্টা ও পাতলা চটা নিয়ে ঝুড়ির তলা বুনতে হয়। তৃতীয় ধাপে তলার কোণার একটি চটার নিচ দিয়ে এবং পরের চটার উপর দিয়ে চিকন

www.pathagar.com

বেতি পেঁচিয়ে ঝুড়ি বোনা শুরু করতে হবে। এভাবে বেতিগুলো বুনতে থাকলে ঝুড়ির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। চতুর্থ ধাপে ঝুড়িটি যে পরিমাণ উঁচু করা হবে সে পর্যন্ত বুনতে হবে। প্রয়োজন মতো বোনা শেষ হলে একটি বেত গোল করে ঝুড়ির মুখে পেঁচিয়ে বাঁশের বেতি দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে। পঞ্চম ধাপে ঝুড়ির মুখে ধারালো বাঁশের বেতিগুলো ভালোভাবে আটকিয়ে দিতে হবে, যেন ধারালো কোনো অংশ বের হয়ে না থাকে।

এসব পণ্যসামগ্রী তৈরির জন্য কারিগররা যে সব বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখে সেগুলো হলো- ১. বাঁশগুলো যেন পরিপক্ক হয় সেদিকে নজর দেয়, ২. বাঁশগুলো ২/১ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা, ৩. এরপর বাঁশগুলোকে ১০/১২ দিন ধরে শুকিয়ে নেয়া, ৪. বাঁশ মেপে নিয়ে সে অনুযায়ী চটা কাটা, ৫. চটা থেকে বেতি বেছে নিতে ধারালো দা ব্যবহার করা এবং ৬. বানানো পণ্যগুলো সাবধানে রাখা যেন সেগুলো ভেঙে না যায়।

পশ্চিম ছনুয়ার কাজীর দিঘি গ্রামে বাঁশবেত শিল্প

ফেনীর পশ্চিম ছনুয়া কাজীর দিঘি গ্রামে নারী-পুরুষ বাঁশ-বেতের কাজ করেন। বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় কোরা, ঝাপাইন, খাঁচি, মাছ ধরার চাই ইত্যাদি জিনিস। গরুর ঘাস কেটে ঝাপাইনে রাখা হয়। খাঁচিতে মুরগি, হাঁসের বাচ্চা রাখা হয়। একটি খাঁচি ও ঝাপাইন বানাতে আধঘণ্টা সময় লাগে। একটি ঝাপাইনের মূল্য ১০/- টাকা থেকে ১৫/- টাকা। খাঁচির মূল্য ১০/- টাকা থেকে ২০/- টাকা। জাই বাঁশ, বর বাঁশ, বাইরা বাঁশ গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এসব বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এসব উপকরণ। একটি বাঁশের মূল্য ৫০/-টাকা থেকে ১২০/- টাকা। বাঁশের মান অনুযায়ী অর্থাৎ কারিগরদের ভাষায় সরস ও নিরস এই দুই ধরনের বাঁশের মূল্যে পার্থক্য দেখা যায়।

বাঁশের বেতা তোলা হচ্ছে

www.pathagar.com

বাঁশের বেত দিয়ে তলা বা তলি তৈরি হচ্ছে

পশ্চিম ছনুয়া গ্রামে বাঁশের খাঁচি তৈরি হচ্ছে

www.pathagar.com

বাঁশের খাঁচি ও অন্যান্য বাঁশজাত দ্রব্য

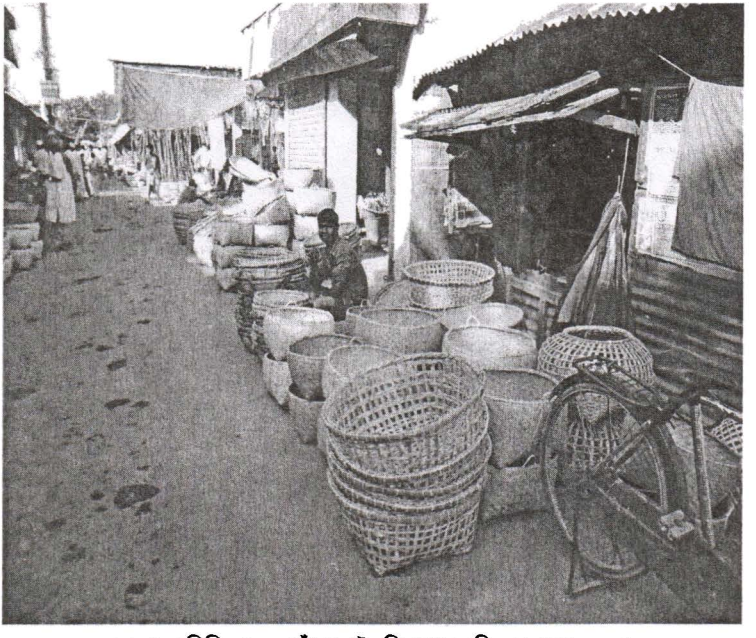

বাজারে বিক্রির জন্য বাঁশের তৈরি পণ্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রথমে খাঁচির মাপ নেওয়া হয়। মাপ নেওয়ার পর বাঁশ দা দিয়ে ফাটা বা কদ্দানো (আঞ্চলিক ভাষা) হয়। ফাটা বা কদ্দানো বাঁশ থেকে দা দিয়ে বেত তোলা হয়। বেত রোদে শুকানো হয়। প্রথমে খাঁচি, কোরা, ঝাপাইনের তলা বা তলি বানানো হয়। এরপর তলি বেরাইতে হয়। গোলাকার আকৃতি দেওয়া হয়। তলি বেরানোর পর কাছা ভাঙ্গা হয় বাঁশের চাক দিয়ে। প্লাস্টিকের সুতো দিয়ে বাঁশের চাঁক বাঁধা হয়।

মেয়ে ও পুরুষ সম্মিলিতভাবে এই কাজ করে। কাজীর দিঘি গ্রামের ফিরোজা বেগম অত্যন্ত চমৎকারভাবে নারী পুরুষের কর্ম বিভাজন সম্পর্কে বলেন, "পুরুষ বাঁশ কাটি দে। হারি (আঞ্চলিক ভাষায় ফাটা বা কাটা অর্থে) দে। বাঁশের চাক ছিলি দে। মেয়েরা তৈয়ার করে। পুরুষরা জোগাল (যোগান) দে।" তিনি আরো বলেন, "এইসব কাজ করে কোনোমতে ঘর সংসার চলে। এগিন করি কী জমি লওয়া যায়? চা-নাস্তা খাওয়া যায়। কোনো একটা জিনিস কিনা যায়। সারা বছর এই কাজ চলে।" বর্ষাকালে আন্তা চাই (মাছ ধরার উপকরণ) ও জোঙ্গইরের চাহিদা বেশি। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথায় জোঙ্গইর ব্যবহার করা হয়। জোঙ্গইর মাথায় দিয়ে হাল চাষ করা যায়।

এই এলাকার পুরুষরা কৃষিকাজ, ক্ষেতমজুর, রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। মেয়েরা বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য এই কাজ করেন। বংশ পরম্পরায় মেয়েরা এই কাজ করে আসছেন। মা, ফুফু, খালা, দাদি, নানিদের নিকট এগুলো বানানো শিখেছেন। এই কাজের ফলে মেয়েদের হাতে কিছু নগদ অর্থ আসে। বেচা-কেনা হলে নগদ টাকা পয়সা হাতে আসলে তাদের ভীষণ আনন্দ লাগে। তাদের ছেলে মেয়েদের কেউ কেজি স্কুলে যায়, কেউ প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। ছেলে মেয়েদের জন্য নগদ অর্থ দিয়ে তারা কিছু কিনতে পারে।

স্বচ্ছল পরিবার, যাদের জায়গা জমি আছে তারা সাধারণত এই কাজ করে না। যারা অস্বচ্ছল, গরীব–তারা এই কাজ করে জীবিকা অর্জনের জন্য। এই প্রসঙ্গে ফিরোজা বেগম বলেন, 'আমাদের দেখে দেখে আমাদের মেয়েরাও শিখছে। ১০/১৫ বছর আগে প্রত্যেক পরিবার হাতের কাজ করে খেত। এখন অনেক কমে গেছে। কিছু কিছু লোক স্বচ্ছল হইছে। অনেকে বিদেশে থাকে। আগে যে অভাবটা ছিল, এখন অনেক কমে গেছে। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণার লোক এখানে এসে মাঠে কাজ করে। বদইল্যার (দিনমজুর) দাম একবেলা খাওয়ালে ১২০/- টাকা, দুইবেলা খাওয়ালে ১০০/- টাকা।'

মেয়েরা ঝাপাইন, খাঁচি, কোরা, ডুলা, ওড়া ইত্যাদি বিক্রি করে বাজার খরচের পয়সা রোজগার করে। এখানকার মেয়েরা এইসব কাজের মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তারা কিছুটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩]

৩. পাটি/বটনি

ফেনী জেলার লোকশিল্পের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাটিপাতার বটনি এবং পাটি। ফেনীর সোনাগাজী, পরশুরাম, দাগনভূঁইয়া, ছাগলনাইয়া উপজেলার অনেক গ্রামের

www.pathagar.com

মেয়েরা বটনি এবং পাটি তৈরি করে। ছোটোবেলায় মেয়েরা তাদের মা, দাদি, খালা, নানিদের নিকট থেকে দেখে দেখে এই কাজ শিখে। পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি ছাড়াও এই শিল্পে ফুটে উঠে নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধ। নকশি বটনিতে ফুল-লতা-পাতা ছাড়াও আল্লা, মোহাম্মদ, মা এসব নাম সুন্দরভাবে চিত্রিত থাকে। গ্রামের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে শিল্পকলা সম্পর্কে সৌন্দর্যবোধ বটনি ও পাটিতে প্রতিফলিত হয়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তারা বটনি ও পাটিতে নকশা ফুটিয়ে তোলে। বটনিতে প্রার্থনা করার সময় স্রষ্টার প্রতি অগাধ প্রেম সৃষ্টি হয়। গরমের দিনে শীতল পাটি দেহ-মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

বংশপরম্পরায় এই শিল্প এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে সম্প্রসারিত হয়। এখনকার সমাজে বিয়ের পর মেয়েরা বটনি ও পাটি বোনার কৌশল স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যায়। স্বামীর বাড়িতে সংসারে অভাব অনটন থাকলে স্বামীর ঘরে গিয়ে মেয়েরা বটনি ও পাটি বানাতে থাকে সংসারের আয় উপার্জন বৃদ্ধির জন্য।

চরচান্দিয়া গ্রামের পাটিপাতার বটনি

সোনাগাজীর মধ্যম চরচান্দিয়া গ্রামের দক্ষিণ সরদার বাড়ির নূরজাহান বেগম (৩৫) তাঁর মা জামিলা খাতুনের নিকট পাটিপাতার বটনি, পাটি, চাটাই তৈরির কাজ শিখেছেন। পাটিপাতা বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। প্রতি পনের মূল্য ২০০/- টাকা। এক পনে বিশ গণ্ডা বা ৮০টি পাটিপাতা থাকে। একটি চাটাই বানাতে দুই পন এবং বটনি বানাতে এক পনের কম পাটিপাতার প্রয়োজন হয়।

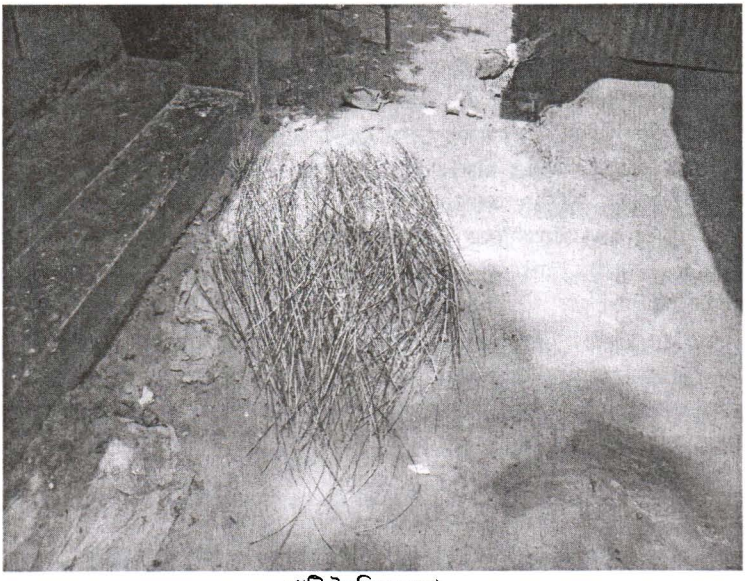

পাটি তৈরির বেতা

www.pathagar.com

তৈরির প্রক্রিয়া

দা দিয়ে পাটি পাতা চিড়ি করতে হয় বা বুক ফেলাতে হয়। এরপর বেতা উঠাতে হয়। বুক উঠানোকে বুক্কা বলা হয়। বুক্কার বেতা দিয়ে মোটা বুক্কার পাটি তৈরি করা হয়। সূক্ষ্ম বেত দিয়ে পাটি তৈরি করা হয়। বেতা ভালোভাবে রোদে শুকাতে হয়। প্রথমে রোদে শুকানোর পর বেতা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। বেতা পুনরায় পানিতে ভিজানোর পর বেতা 'মেলি' যায় বা ছড়িয়ে যায়।

নকশি বা নকশা করার জন্য বেতা রং করতে হয়। বাজার থেকে রং ক্রয় করা হয়। ফুটন্ত পানিতে বেতাসহ রং গরম করতে হয়। সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট পাতিলে রেখে নামিয়ে ফেলতে হয়। পাতিল থেকে নামিয়ে বেতা ভালোভাবে রোদে শুকাতে হয়। এরপর শুরু হয় বটনি বা পাটি তৈরির কাজ।

প্রথমে 'জো' উঠাতে হয়। ডান দিকে থেকে বাঁ দিকে বেতা চালাতে হয়। বেতা যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে জোড়া লাগাতে হয়। বড়ো পাটির দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত এবং প্রস্থ চারহাত হয়ে থাকে। একটি নকশি পাটির মূল্য ১৫০০/- টাকা থেকে ২,০০০/- টাকা পর্যন্ত। এসব পাটি অর্ডার দিয়ে বানানো হয়।

ব্যবহার

বটনি ও পাটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। মেয়েদের বিয়েতে দু'টি পাটি ও ছয়টি বটনি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ঘরে পাটিপাতার বটনি ও পাটি ব্যবহৃত হয়। শহরের লোকজনও বটনি এবং পাটি ব্যবহার করেন। নূরজাহান বেগম বলেন, "বানানো পাটি ও বটনির নকশা দেখে দেখে নকশা তৈরি করি। এটি হাত এবং মনের কাজ।" পাঁচ হাত লম্বা এবং চার হাত প্রস্থের একটি পাটি বানাতে পাঁচ ছয় দিন লাগে। নকশি বটনি বানাতে ছয় সাত দিন লাগে। বটনি ও পাটি শিল্পী মাছুমা আক্তার বলেন, "বাপের বাড়িতে মেয়েরা বটনি পাটি বানানো শিখি যাইবো। শিখান লাইগতো না। এই কাজ উন্নতির কাজ। সবার ভালোলাগে। মহিলারা ঘরে বসে আয় করে। নগদ টাকা পায়। এটি মেয়েদের কাজ। ছেলেরা শিখবে না।"[৪]

ছিলোনিয়া গ্রামের নামাজের বটনি

২০.১০.২০১২ তারিখ গবেষক কাজী মোস্তফা কামাল এবং প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী ফেনীর পূর্ব ছিলোনিয়া গ্রামে যান। সে গ্রামের রোশনা বেগম (৪০) নামাজের বটনি তৈরি করেন। তাঁর স্বামী চট্টগ্রামে এ কে খান জুট মিলে চাকরি করেন। তিনি বাড়িতে হাঁস মুরগি পালন করেন। তাঁর মেয়েরা লেখাপড়া করে। তারা বটনি বানানোর কাজ শিখে না। তিনি তার মা ওয়াহিদেন নেছার নিকট বটনি বানানো শিখেছেন। তিনি নামাজের বটনি তৈরির প্রক্রিয়া জানান।

তৈরির প্রক্রিয়া

প্রথমে বাজার থেকে পাটিপাতা ক্রয় করতে হয়। বাজারে গণ্ডা হিসেবে (এক গন্ডায় চারটি পাটিপাতার ডাল) বিক্রি হয়। বিশ গণ্ডা অর্থাৎ ৮০টি পাটিপাতার ডালের মূল্য

www.pathagar.com

১০০/- টাকা। বাড়িতে এনে প্রথমে পাটিপাতা দা দিয়ে চাঁছতে হয়। আঞ্চলিক ভাষায় এই কাজকে 'চাঁছন' বলে।

মসজিদের নকশা করা নামাজের বটনি

বেতা তোলা

চাঁছার পর বেত বা বেতা তোলা হয়। এই কাজকে তারা বলেন 'আঁইছন'। পাটি পাতার আতি ফেলে দিয়ে অর্থাৎ ডালের বুকের অংশ ফেলে দিয়ে বেতা তোলা হয়। দা দিয়ে দু'হাত ব্যবহার করে তারা এই কাজ করেন। উল্লেখ্য, আতি দিয়ে আতির চাটাই তৈরি হয়। আতির চাটাই ভাত খাওয়া, ধান, চাল, ডাল শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

রোদে শুকানো ও রং করা

বেতা তোলার পর রোদে শুকানো হয় দু'দিন। শুকানোর পর বেতায় লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি রং লাগানো হয়। বাজার থেকে রং ক্রয় করা হয়। পাউডার বা চাকা রং ক্রয় করা হয়। একটি বটনিতে ১০/- টাকার রং লাগে। বটনির আয়তন তিন থেকে সাড়ে তিনহাত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আড়াই হাত। বেতায় রং লাগিয়ে আবার একদিন রোদে শুকাতে হয়। এরপর শুরু হয় বটনি বোনার কাজ। এই প্রসঙ্গে রোশনা বেগম বলেন, "অন্য একজনে বানাবে। হেইডা (সেটি) আমি আনি বানাই। একজনের দেখাদেখি অন্যজনে বানায়।" এখানে তিনি বটনি তৈরির প্রক্রিয়া, বুনন ও নকশা বিষয়ে কথা বলেন। একজনের তৈরি বটনি দেখে অন্যজনে শিখে এবং অনুকরণ করে। এভাবে তারা শিখে থাকেন।

www.pathagar.com

বুনন পদ্ধতি

প্রথমে জো উঠাতে হয়। দুই তিনটা বেতের ফালি বা চিলতে (strip) দিয়ে জো উঠাতে হয়। এরপর শুরু হয় নকশার কাজ। নিচে চারটি বেতা থাকবে, এর উপরে থাকে একটা বেত। দৈর্ঘ্য থেকে প্রস্থের দিকে নকশির কাজ শুরু হয়। এক পর্যায়ে এই কাজ শেষ হয়। এরপর যেখান থেকে জো উঠানো শুরু হয়েছিল সেখান থেকে বেতের তিনটি ফালি দিয়ে শেষ করতে হয়। এরপর বটনির চতুর্দিকে বেতা এক সমান সাইজ করে কাছা ভাঙ্গা হয়। প্লাস্টিকের সুতা বা বেত দিয়ে কাছা ভাঙতে হয়।

ছিলোনিয়া গ্রামের রোশনা বেগম পাটিপাতার বেতা তুলছেন

সোনাগাজী থানায় পাটি তৈরি হচ্ছে

www.pathagar.com

বটনির ব্যবহার

নামাজ পড়ার জন্য বটনির ব্যবহার হয় বেশি। অনেকে বটনি বিছিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে। ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বটনি টাঙিয়ে রাখা হয়। ১৫/২০ বছর বটনি ঘরে রাখা যায়।

একটি বটনি তৈরি করতে ১২০/- টাকা থেকে ১৫০/- টাকা ব্যয় হয়। বিক্রি হয় ৫০০/- টাকা। একমাসে তিন থেকে চারটি বটনি বানানো যায়।[৫]

ছলোনিয়া গ্রামের নকশি বটনি

নকশি বটনি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

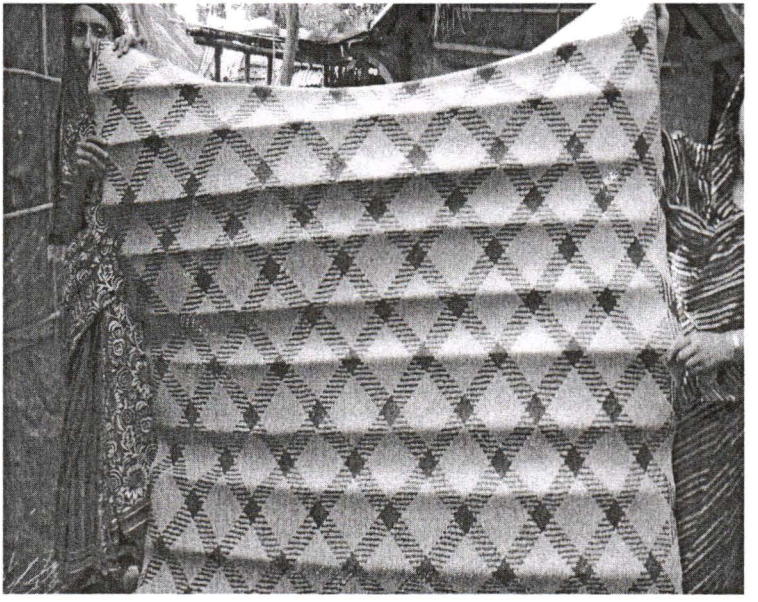

সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বটনি

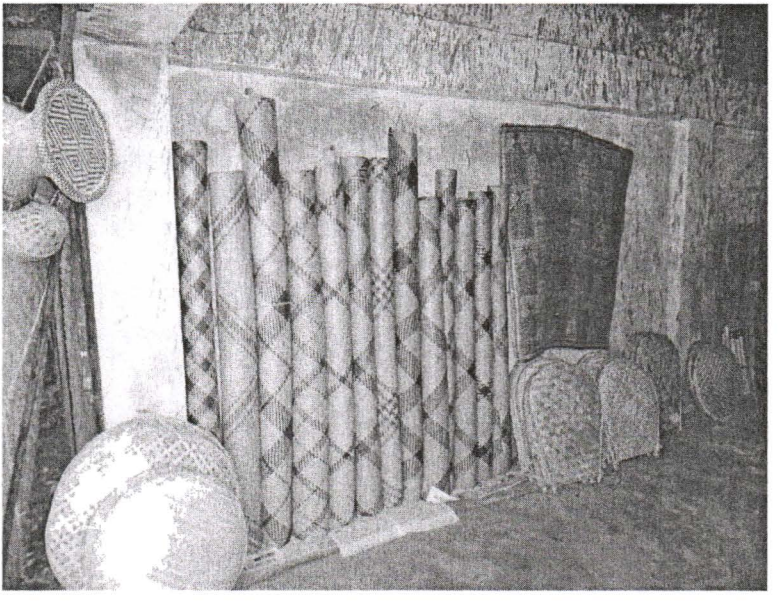

বিক্রয়ের জন্য দোকানের সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন আকারের পাটি

www.pathagar.com

দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামে বটনি

ফেনী শহর থেকে ৯/১০ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ ছনুয়া গ্রাম অবস্থিত। এ অঞ্চলে পাটিশিল্পীদের বাড়ির আশেপাশে বা ফসলের ক্ষেতে পাটিপাতা চাষ করা হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পাটিপাতা বাগান থেকে মুড়াসহ চারা অন্য জায়গায় লাগানো হয়। গাছ বড়ো হওয়ার পর বা চার-পাঁচ হাত লম্বা হওয়ার পর এক মুড়া থেকে দশ/বিশটি পাটিপাতা কেটে বোঝা বা আঞ্চলিক ভাষায় 'হোজা' বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। একটি বোঝায় সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০টি পাটিপাতা থাকে। মূল্য ১২০.০০ থেকে ১৩০.০০ টাকা। মেয়েরা মা, ফুফু, খালা, দাদি, নানিদের নিকট থেকে ছোটোবেলায় বটনি বানানো শিখেন। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর বাড়িতে গিয়ে এই কাজ করে। প্রথমে শখের বশে শিখলেও পরবর্তীকালে জীবিকা অর্জনের একটি উপায় হিসেবে বটনি বানানোর কাজ চালিয়ে যান। কখন এই এলাকায় এই কাজ শুরু হয়েছে তা তারা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন না। তবে আনুমানিকভাবে ১০০ বছর আগে এই কাজ এই এলাকায় শুরু হয়েছে বলে তারা জানান।

বটনির আকৃতি

বড়ো বটনি : দৈর্ঘ্য ২$^{১}/_{২}$হাত, প্রস্থ : ২ হাত। ছোটো বটনি : দৈর্ঘ্য ২ হাত, প্রস্থ : ১$^{১}/_{২}$ হাত।

তৈরির পদ্ধতি

বাজার থেকে পাটিপাতার বোঝা পুরুষরা ক্রয় করে আনে। যাদের নিজস্ব পাটিপাতা বাগান আছে তারা বাগান থেকে পাটিপাতা কেটে বাজারে বিক্রি করে এবং মহিলারা বটনি তৈরি করেন। দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামের পুরুষরা কৃষিকাজ, ক্ষেতে খামারে দিনমজুর ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ করেন। বাড়িতে মেয়েরা অবসর সময়ে বটনি, শীতল পাটি ও চট তৈরি করেন। পাটিপাতা বাড়িতে এনে মেয়েরা দা ও বটি দিয়ে চিরে বেত তৈরি করেন। বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের রং কিনে ভাতের মাড়ের সঙ্গে এই রং মিশিয়ে বেতাসহ একঘণ্টা সিদ্ধ করা হয় বড়ো সিলভারের পাতিলে। এক ঘণ্টা সিদ্ধ করার পর পাতিল থেকে উঠিয়ে রোদে শুকাতে হয়। দুইদিন রোদে শুকানো হয়। একদিন ঠান্ডা জায়গায় বেতগুলো রাখা হয়। এই রঙিন বেত দিয়ে বিভিন্ন মাপের নকশা করা বটনি তৈরি করা হয়। মাটিতে চট বিছিয়ে তার উপর এই বটনি তৈরি করা হয়।

প্রকার

বটনি নানা রকমের হয়। ফুলের বটনি, তারা বটনি, গানের বটনি, মসজিদ বটনি, বড়ো বড়ো খোপ দিয়ে তৈরি রাজকোট বটনি, চোখওয়ালা বটনি ইত্যাদি। গানের বটনিতে শ্লোক থাকে, ভাষা থাকে। তাছাড়া মেয়েরা সাধারণ (নকশা ছাড়া) বটনিও তৈরি করে।

নকশা

বটনির ডিজাইন সম্পর্কে মধ্যম লেমুয়া গ্রামের পেয়ারা বেগম বলেন, "নামাজের বটনিতে নামাজ পড়া হয়। ঘরে টাঙিয়ে রাখা হয় সৌন্দর্যের জন্য। চোখওয়ালা

www.pathagar.com

বটনিতে যা মন চায় তাই দিই, যে কোনো ডিজাইন করা যায়। মসজিদ, মিনার, গাছ, লতাপাতা, যে কোনো ফল, আল্লা, মোহাম্মদের নাম উঠানো যায়। বেতা উঠাইতে ডিজাইন করে ফেলি। মনের কল্পনা থেকে ডিজাইন করে ফেলি।"

ফুল, লতাপাতা, প্রিয় পাখি ময়না, তোতা, দোয়েল পাখি, কলমিলতা, কদমফুল, গাছ, মসজিদ, গানের পাখি, কবিতার বাণী বটনিতে অঙ্কন করা হয়। তাছাড়া জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাদের নাম যেমন—ববিতা, শাবনূর, মৌসুমী, মান্না প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম অঙ্কন করে বটনি তৈরি করেন। কোনো কোনো সময় যে কারিগর বটনি তৈরি করেন তার নাম বটনিতে লেখা হয়। মহিলা কারিগর তার মনের কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে এইসব নকশা বটনিতে অঙ্কন করেন। বটনিতে কারিগরের সৌন্দর্যচেতনা ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

বাজারজাতকরণ

এইসব বটনি স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি হয়। কেউ কেউ অর্ডার দিয়ে বটনি তৈরি করান। স্থানীয় হাট-বাজার ছাড়া শহরেও বটনি বিক্রি হয়। অনেক ক্রেতা বাড়ি থেকে বটনি ক্রয় করে নিয়ে যান। স্থানীয় লেমুয়া বাজার, ছনুয়া বাজার, নবাবপুর বাজার, ভোর বাজার, কৃষ্ণমন্দার হাট, ফাজিলপুর হাটে বটনি বিক্রি হয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসে বটনি বেশি বিক্রি হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস মন্দা সিজন। বৈশাখ মাসে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে বটনি, চট, পাটি বেশি বিক্রি হয়।

মূল্য

ফুলের বটনি ২০০.০০ টাকা থেকে ২৫০.০০ টাকা বিক্রি হয়। সাদা বটনি ২০০.০০ টাকা বিক্রি হয়। ২$^{১}/_{২}$ হাত দৈর্ঘ্য ও ২ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট একটি ফুলের বটনি বানাতে পাঁচ থেকে সাতদিন সময় লাগে। তাদের মতে একটি বটনির উৎপাদন খরচ ১৫০.০০ টাকা। একটি বটনি বিক্রি করে তারা ৫০.০০ টাকা থেকে ১০০.০০ টাকা আয় করেন বলে জানান।

বটনির ব্যবহার

দৈনন্দিন গৃহস্থালী জীবনে বটনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে সাদা বটনি ও ফুলের বটনি ব্যবহৃত হয়। সাদা বটনিতে বসে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। খাওয়া-দাওয়া করে। ফুলের বটনি জায়নামাজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই এলাকায় মেয়েদের বিয়ের সময় এলাকার তৈরি ফুলের বটনি ও শীতল পাটি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। অনেকে ড্রইংরুমে ফুলের বটনি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।[৬]

বড়ো পাটি/শীতল পাটি

ফেনী জেলার মধ্যম লেমুয়া, দক্ষিণ ছনুয়া, সুলতানপুর গ্রামে বড়োপাটি বা বটনি তৈরি হয়। এগুলোর দৈর্ঘ্য সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থ সাড়ে তিনহাত থেকে চারহাত পর্যন্ত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

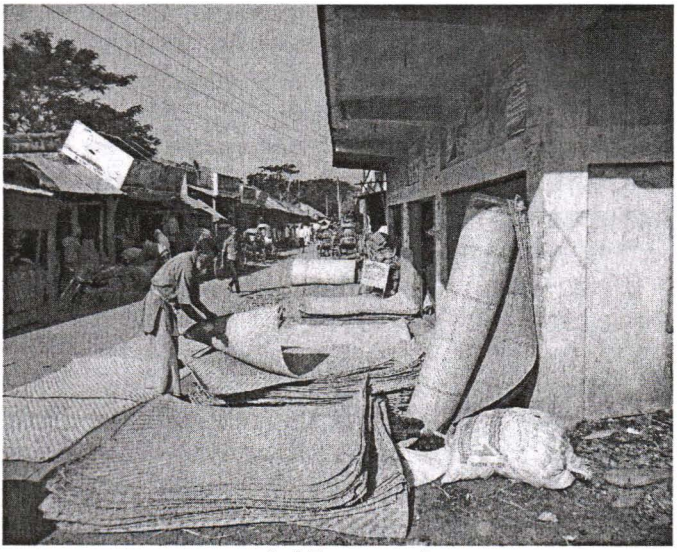

লেমুয়া বাজারে বড়ো পাটি বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে

উৎপত্তির ইতিহাস

ফেনী অঞ্চলে বড়ো পাটি বা শীতল পাটি তৈরির ইতিহাস সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে ১০০ বছর আগে এই অঞ্চলে এই কাজ শুরু হয়েছে বলে তারা জানান।

তৈরির পদ্ধতি

বাজার থেকে পাটিপাতা ক্রয় করা হয়। অথবা নিজস্ব পাটিপাতা বাগান থেকে পাটিপাতা সংগ্রহ করা হয়। পাটিপাতা দা ও বটি দিয়ে চিরে বেত তৈরি করা হয়। বাজার থেকে রং ক্রয় করে তা ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে বেত চুবানো হয়। পাতিলে সিদ্ধ করে বেত রোদে শুকানো হয়। এরপর জো উঠিয়ে ডিজাইন অনুসারে পাটি বানানো হয়। পাঁচহাত দৈর্ঘ্য ও চারহাত প্রস্থ বিশিষ্ট বড়ো পাটি বানাতে ১০/১৫ দিন সময় লাগে। মা, ফুফু, খালা, দাদি, নানিদের নিকট মেয়েরা বড়ো পাটি/শীতল পাটি বানানো শিখেছেন।

ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে বড়ো পাটি বা শীতল পাটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মকালে বাড়ির উঠানে বা ঘরের মধ্যে পাটি বিছিয়ে ঘুমানো অত্যন্ত আরামদায়ক। গরমের দিনে খাটে তোশকের উপর পাটি বিছিয়ে শোয়া আরামদায়ক। তাছাড়া ঘরের মেঝেতেও পাটি বিছিয়ে শোয়া যায়।[৭]

www.pathagar.com

পরশুরামের শীতল পাটি বা চিকন পাটি

পরশুরাম থানার কোলাপাড়া গ্রামে শীতল পাটি বা চিকন পাটি তৈরি হয়। পাটি শিল্পী আলো রানীর সঙ্গে আলাপ হয় ১৪.০৯.২০১৩ তারিখ তাঁর বাড়িতে। তিনি বলেন, 'আমরা বেত কই, মুসলমানরা মোস্তাক কয়। পুষ্করিণীর চারপাশে বেত উৎপাদিত হয়। একটা চারা লাগালে চতুর্দিকে ৭/৮ টা গাছ হয়। একটা বেত finishing করতে চার পাঁচবার হাত লাগাইতে হয়। এক আটির দাম ২৫০ টাকা। এক আটি দিয়ে দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত প্রস্থ তিন হাত মাপের একটি পাটি বানানো যায়। বিক্রি হবে ৬০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা। ১৬/১৭ দিন লাগে।'

তৈরির পদ্ধতি

কোলাপাড়া গ্রামে শীতল পাটি বা চিকন পাটি তৈরির শিল্পী সাবিত্রী দেব নাথ পাটি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করেন, "প্রথমে বেতকে পা দিয়ে বুক ঝারি ফেলাই। আবারো বুক ঝারি চিকন করি। আবার বুক ঝারি আবার লিল বেত উঠাই। চিকন বেত লাগে শীতল পাটি বানাতে। খাটনি বেশি, আমরা পারি না। আমরা মোটা বানাই। উনি (রেঞ্জুবালা নাথ) চিকন কাজ করেন, উনার মা দিদিমাও চিকন কাজ করেন। ২/৩ লিল বা বেত রোদে শুকানো হবে। শুকানো বেত দিয়ে পাটির জো উঠানো হবে। বুকটা জ্বালাই ফেলামু। এটা কোনো কাজে লাগে না। আতি বিক্রি করি এটি দিয়ে পান বাঁধে- শুকটি বাঁধে- আতির সুতলি দিয়া ধানের হোনজা বাঁধে। এক মুঠা আতির দাম ৫ টাকা। সের ৪০/ ৫০ টাকা।[৮]

৪. নকশিকাঁথা

পরশুরাম-ফুলগাজীর নকশিকাঁথা এক সময় বহুল প্রচলিত ছিল। এখানো আছে। দুই উপজেলাতেই কাঁথা শিল্পের কম বেশি উৎপাদন হয়। গৃহিণীরা পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য এই কাঁথা তৈরি করে থাকে। বাইরে বিক্রি হয় না এই কাঁথা।

নকশিকাঁথা সেলাই করছে পরশুরামের একজন নারী

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. সুরেশ চন্দ্র পাল, বয়স : ৭০ বৎসর, পেশা : কুমার, গ্রাম : দক্ষিণ আঁধার মানিক, থানা : ছাগলনাইয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

২. রাহেলা আক্তার, স্বামী : আহছান উল্লা, দক্ষিণ সরদার বাড়ি, গ্রাম : মধ্যম চরচান্দিয়া, উপজেলা : সোনাগাজী, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২০.১১.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

৩. খোদেজা বেগম, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : পশ্চিম ছনুয়া, কাজীর দিঘি, থানা : ফেনী সদর, জেলা : ফেনী; ফিরোজা বেগম, বয়স : ৩০ বৎসর, গ্রাম : পশ্চিম ছনুয়া, কাজীর দিঘি, থানা : ফেনী, জেলা : ফেনী, তারিখ : ১৫.১২.২০১৩

৪. নূরজাহান বেগম, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : মধ্যম চরচান্দিয়া, উপজেলা : সোনাগাজী, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২০.১১.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

৫. রোশনা বেগম, বয়স : ৪০ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : তেতৈয়া, ইউনিয়ন : ছনুয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২০.১০.২০১২, স্থান : নিজ বাড়ি

৬. হাছিনা বেগম, বয়স : ৩০ বৎসর, গ্রাম : দক্ষিণ ছনুয়া, থানা ও জেলা : ফেনী, তারিখ : ০১.০৫.২০০৫; জৈনুন নেহার, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : দক্ষিণ ছনুয়া, থানা ও জেলা : ফেনী, তারিখ : ০১.০১.২০০৫; পারভীন আক্তার, বয়স : ২৫ বৎসর, মাতা : তাহেরা খাতুন, গ্রাম : দক্ষিণ ছনুয়া (এসএসসি পাস), তারিখ : ০১.০৬.২০০৫; রাবেয়া আক্তার, বয়স : ১৬ বৎসর, পিতা : আবু তাহের, গ্রাম : দক্ষিণ ছনুয়া, থানা ও জেলা : ফেনী, তারিখ : ০২.০৬.২০০৫; সামছুল হক, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : দক্ষিণ ছনুয়া, থানা ও জেলা : ফেনী, তারিখ : ০২.০৬.২০০৫; মোহাম্মদ আবু তাহের, বয়স : ৪০ বৎসর, গ্রাম: দক্ষিণ ছনুয়া, থানা ও জেলা : ফেনী, তারিখ : ০৩.০৬.২০০৫

৭. পেয়ারা বেগম, বয়স : ৪০ বৎসর, গ্রাম : মধ্যম লেমুয়া, থানা : ফেনী সদর, জেলা : ফেনী

৮. কাজী মো. তোফায়েল আলম (বাবর); নূরুল ইসলাম মজুমদার, বয়স : ৬৫ বৎসর, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী; সাবিত্রী দেবনাথ, বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : পাটি শিল্পী, গ্রাম : কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী; আলো রানী, গ্রাম : কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী, তারিখ : ১৪.০৯.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ফেনী অঞ্চলের মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও রুচির অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেই সাথে বদলে গেছে মানুষের পোশাক-আশাক ও সৌন্দর্যবোধও। আগে এ অঞ্চলের পুরুষদের প্রধান পোশাক ছিল ধুতি ও পাঞ্জাবি। মেয়েরা শাড়ি, ফুলহাতা ব্লাউজ পরতো। কিন্তু বর্তমানে নানাধরনের পোশাক দেখা যায়। পূর্বে এ অঞ্চলে 'সুপার ফাইন ধুতি' নামে একধরনের উন্নতমানের ধুতি পোশাক ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এই ধুতি, গেঞ্জি, সাইড পকেটওয়ালা শার্ট ও পাঞ্জাবি হিন্দু মুসলমান সবাই পরতো। বর্তমানে হিন্দু মুসলমানের পোশাকের তারতম্য তেমন একটা চোখে পড়ে না। আগের দিনের কাঠের নির্মিত খড়মের স্থান দখল করেছে আধুনিক যুগের স্পঞ্জের চপ্পল বা রাবারের স্যান্ডেল।

বর্তমানে ফেনী অঞ্চলের মানুষের কাপড়-চোপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে পুরুষের জন্য লুঙ্গি ও গেঞ্জি অতি সাধারণ। অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি ব্যবহার করে থাকেন। উৎসব-অনুষ্ঠান বা ইষ্টিকুটুমের বাড়িতে যাবার সময় সকলে অপেক্ষাকৃত ভালো পোশাকটি পরিধান করার প্রয়াস পায়। এটাকে 'তোলা' জামা-কাপড় বলা হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তিগণ মাথায় টুপি পরিধান করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে একসময় ধুতির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তারাও লুঙ্গি ও প্যান্ট-শার্ট পরিধান করে থাকে।

মেয়েরা সালওয়ার-কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করে। মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ বা চুলি ব্যবহার করে। অবস্থা-সম্পন্ন পরিবারের মেয়েরা বা মহিলারা দামি অলঙ্কারও পরে থাকেন। অলঙ্কারের মধ্যে গলার হাঁসুলি, দানা তাবিজ বা হার, কোমরের বিছা, পায়ের কড়া, বাতান চুড়ি, নাকের লটকন, নাকফুল, কানের দুল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েরা বিশেষ সাজে সজ্জিত হয়, পায়ে আলতা ও হাতে মেহেদি লাগায়। গ্রামাঞ্চলে এখনো লেইস ফিতা বিক্রেতারা মাথায় বাক্স নিয়ে 'লেইস ফিতা লেইস' বলে লেইস ফিতা, কাঁচের চুড়ি, পুঁথির মালা, আলতা ও নানা রকম প্রসাধন সামগ্রী ফেরি করে বেড়ায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েরা বিয়ের পর শাঁখা পরে থাকে। পূর্বে বিধবা নারীগণ সাদা কাপড় বা শাড়ি পরিধান করতেন। বর্তমানে সেই রেওয়াজ আর চালু নেই।

ওমানি টুপি

সাম্প্রতিক কালে ফেনী জেলার দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামে বেশ কিছু তরুণী এই সৌখিন টুপি তৈরি করেন। ধনী ব্যক্তিগণ এই টুপি ব্যবহার করেন। মূল্যবান এই টুপি মধ্যপ্রাচ্যের ওমানে রফতানি হয় প্রচুর পরিমাণে। তাই এই টুপি ওমানি টুপি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ঈদ উপলক্ষে এই টুপির উৎপাদন ও ব্যবহার বেশি। ফেনীর ফাজিলপুরের জয়নাল টেইলরের নিকট থেকে মেয়েরা এই টুপি বানানো শিখেছে।

www.pathagar.com

তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি

প্রথমে সুতার তৈরি এক টুকরা নতুন কাপড় গোল করে কেটে হাতে সেলাই করা হয়। এর ওপর তুলা বিছিয়ে আর এক টুকরা কাপড় তার ওপর বিছানো হয়। সুই সুতা দিয়ে সেলাই করে এই টুকরা কাপড় সংযুক্ত করা হয়। টুপির দুটি অংশ থাকে। একটি তুলি ও অন্য অংশ সাইড। কারুকাজ করা তুলি ও সাইড যুক্ত করে টুপি সেলাই করা হয় বা আকৃতি দেওয়া হয়।

সুই, সুতা, কাপড় ও ডিজাইন কোম্পানি সরবরাহ করে। ফেনীর শামছু টেইলর এগুলো সরবরাহ করেন। টুপি তৈরি হওয়ার পর বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এক এক ডিজাইনে এক এক রঙের সুতা ব্যবহার করা হয়। একটি টুপি তৈরি করতে একমাস সময় লাগে।

কারুকাজ করা এই টুপির মূল্য ওমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩,০০০/- টাকা থেকে ৪,০০০/- টাকা। একজন দক্ষ কারিগর মাসে দুটি টুপি বানাতে পারে। একটি টুপি বানানোর জন্য ৫০০/- টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

সুই সুতা দিয়ে ডিজাইনের কাজটি অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। বানানোর পর টুপি হাতে ধোয়া নিষেধ। গ্রামের বেকার মেয়েরা এই টুপি তৈরি করে বেশ কিছু টাকা উপার্জন করে। দক্ষিণ ছনুয়া গ্রামের পারভীন আক্তার কারুকাজ করা টুপি বানায়। সে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। তারা চারবোন, চারবোনই টুপি তৈরি করে। এক সঙ্গে পাঁচটি টুপি বানানোর পরে ২,৫০০/- টাকা আয় করে। সাম্প্রতিক কালে এই কারুকাজ করা টুপির চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। মেয়েরা ঘরে বসে টুপি বানিয়ে নগদ অর্থ উপার্জন করছে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

স্থানীয় উপকরণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যে সব ঘরবাড়ি নির্মাণ করে এসব ঘরবাড়িকে লোকস্থাপত্য বা vernacular architecture- এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ঘরবাড়ি নির্মাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল লক্ষ্য করা যায়। একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার জন্য তাদের ঘরবাড়ি, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ঘরবাড়ি নির্মাণ কৌশল ও পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফেনী অঞ্চলেও ছনের ঘর, মাটির ঘর, টিনের দোচালা ও চৌচালা ঘরের পরিবর্তে বর্তমানে পাকা ঘর নির্মাণের একটি হিড়িক পড়ে গেছে। বাংলাদেশে ঘরবাড়ি নির্মাণের অস্থায়ী ও স্থায়ী উপকরণগুলো স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়। বাঁশ, মাটি, ছন, টিন ইত্যাদি উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি। ঘরবাড়ি নির্মাণ কাজে দক্ষ মিস্ত্রি তার সুনিপুণ হাত ও মেধা ব্যবহার করে এসব ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে স্থায়ী পাকাভবন নির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে দামি শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাত উপকরণ আমদানি করছে। গ্রামে এবং শহরে এটি real estate ব্যবসা নামে নতুন রূপ লাভ করেছে। এখানেও রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাত ও মেধা ব্যবহার করে নতুন ধরনের ভবন নির্মাণ করছে।

ঘরবাড়ি নির্মাণের এই নতুন pattern মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ঐতিহ্যবাহী পুরনো ঘরবাড়ি ছিল খোলামেলা। বাড়িতে ছিল উঠান, দরজা ছিল খোলা। লোকজন নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে ঘরে ঢুকতে পারতো, কথাবার্তা বলতো, ভাব বিনিময় করতো। কিন্তু নতুন ঘরবাড়িতে নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু একবার গৃহে প্রবেশ করলে আতিথেয়তায় কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

বসতবাড়ি নির্মাণের কাজে ফেনীর মানুষের রুচি, আর্থিক সঙ্গতি ও পারিবারিক আভিজাত্য ফুটে উঠে। এখানে বর্ষাকালীন ঢলের পানি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশেপাশের এলাকা থেকে কিছুটা উঁচু জায়গার উপর বসতবাড়ি নির্মাণ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বসত ঘর উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়। এটা সম্ভবত দক্ষিণমুখী ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াস। বসত ঘরের পেছনে থাকে রান্না ঘর, সামনে থাকে খালি জায়গা বা উঠান। উঠানে ধান মাড়ানো এবং শুকানো হয়। মুসলমান বাড়িতে উঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান-মিলাদ মাহফিল ও ওয়াজ-নসিহত এবং হিন্দু বাড়িতে কীর্তন ও রামায়ণ পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক অবস্থা সম্পন্ন বাড়ির সামনে থাকে কাছারি ঘর, আর কাছারি ঘরের সামনে থাকে 'ঘাটা', এক পাশে থাকে গোয়াল ঘর।

www.pathagar.com

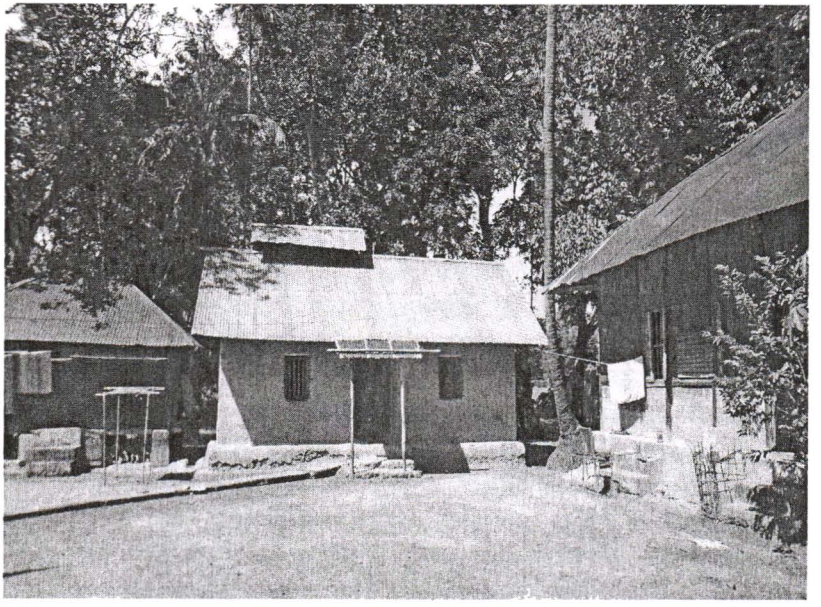

টিনের চাল দেয়া মাটির দেয়ালের ঘর

মাটির দেয়ালের ঘর

www.pathagar.com

বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া ও টিনের চালবিশিষ্ট বাড়ি

টিনের ঘর

www.pathagar.com

একসময় গ্রামে ছনের ছাউনি যুক্ত ঘর ছিল বেশি। পরশুরামে ছনের ঘর বেশি ছিল। অনেকের নিজস্ব ছনের বাগান ছিল। ছন কেটে ঘর তৈরি করা হতো। অনেকের ছিল মাটির গুদাম ঘর। গরমকালে মাটির ঘরে খুব ঠাণ্ডা এবং শীতকালে খুব গরম। এরপর ঘরবাড়িতে পরিবর্তন আসে। টিনের দোচালা-চৌচালা ঘর বানানো শুরু হয়। ঢেউ টিন সহজলভ্য হওয়ার পর প্রতি বাড়িতে অন্তত বসত ঘর ঢেউ টিন দ্বারা নির্মিত হতে থাকে। হাল আমলে ফেনী, সোনাগাজী, পরশুরাম, ফুলগাজী, দাগনভূঁইয়ায় ছনের ঘর, মাটির ঘর, টিনের ঘর-এর জায়গায় নতুন নতুন পাকা ভবন তৈরি হচ্ছে। ছনের ও মাটির ঘর প্রায়ই বিলুপ্ত। টিনের দোচালা ও চৌচালা ঘর এখনও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পাকা ঘরের সংখ্যা বিপুলহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৯৬

www.pathagar.com

লোকসংগীত

ফেনী অঞ্চলে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে এক সময় ফসল কাটা বা আমন ধান রোপনের মৌসুমে কৃষকেরা জারিগান গাইতো। নদ-নদী ও খাল-বিল অধ্যুষিত ফেনীর মাঝি-মাল্লারা গাইতো বদর পিরের নামে কোরাস বা ভাটিয়ালি গান আর জেলেরা মাছ ধরার সময় গাইতো সারিগান। বর্তমানেও ফেনীর বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে লোকসংগীতের ব্যাপক কদর রয়েছে।

১. দেশাত্মবোধক গান

আবদুল বারিক রচিত

১

আসিবে শান্তির নিশান
চিন্তা কিরে আর
ঐ ছুটেছে দলে দলে
বাংলার পতাকা তলে।
আসিবে শান্তির নিশান
চিন্তা কিরে আর
ঐ ছুটেছে দলে দলে
বাংলার পতাকা তলে।
মরণ কামড় দিতে উঠবিরে আবার
দুঃখের নিশি অবসান
গাও সবে বাংলার গান
নবারুণে উদ্ভাসিত হইতেছে আবার
এতে নাই ভাই ভুল ভ্রান্তি
আসিবে দেশে শান্তি
এই দেশের মানুষ হইবে
এক মহান পরিবার।

২

আমার বাংলাদেশের ভাইরে
আমার কৃষক শ্রমিক ভাই

www.pathagar.com

কলে মেইলে ক্ষেত খামারে
দেশ রাখ বাঁচাই।
বাংলাদেশের শ্রমিক চাষা
উঠ ভাই জাগিয়া
পরিশ্রমী হতে হবে দেশের লাগিয়া
তোমার আমার শ্রমে এই দেশ
উজ্জ্বল করা চাই
কাজের ভিতর অলসতা
রাখিসনারে লুকাই।
যাদের কাজ ফাঁকি অলসতা
নিত্য যার স্বভাব
সারাজীবন থাকবেরে তার
সংসারে অভাব
তারা দেশের আপদ জাতির বোঝা
চিন্তা কর ভাই
এসব পরগাছা ছাটাই করিয়া
দেশ রাখ বাঁচাই ॥

২. উন্নয়নমূলক গান

আবদুল বারিক রচিত

আম কাঁঠাল কামরাঙ্গা লিচু
জাম আর সুপারি
শাপলা শালুক টাকের মুলা
কত খাইতে পারি
সাগরের ঝিনুক নদীর হামুক
বানাই নুন আর চুন
বাংলার গৌরবের কথা
বিশ্ববাসী শুনুক।
যব জোয়ার ভুট্টা বাদামের কর চাষ
টাটকা পয়সা পাইবা চাষি খাইবা বারোমাস
তিল হইব সূর্যমুখী যদি কর ভাই

www.pathagar.com

তৈল উৎপাদন করি মোরা সারা বছর খাই।
চা চামড়া পাট তুলা বাংলাদেশে পাই
আউস আমন ইরি বোরো তিন ফসল ফলাই
পাহাড় পর্বত নদী রাস্তা ফল ফুলের বাগান
ধন্য মোদের সোনার বাংলা মোদের জন্মস্থান।

বাংলাদেশের আছে যত হিন্দু মুসলমান
সর্ব প্রতিষ্ঠান কর মোদের জন্মস্থান
ক্ষান্ত করি কবির পালা সময় হাতে নাই
সবার উদ্দেশ্যে আমি সালাম জানাই ॥

৩. বন্দনা সংগীত

আবদুল বারিক রচিত

কাঁদে পরাণ মুজিবের লাগিয়া
ও মুজিবরে তেরশ বিরাশি বাংলা উনত্রিশ শ্রাবণ
ভোরের বেলা ফাঁকি দিলা
নিমায়া হইয়া
বাংলার বাঙালি যত
হইয়াছে পাগলের মত
অবিরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ বন্ধুরে ॥

ও মুজিবরে তিরিশ লক্ষ
বাঙালির প্রাণ
তোর কথায় দিল কোরবান
বিশ্বে প্রমাণ গিয়াছ করিয়া
জাইনতাম যদি মইরবা বলি
সাতকোটি বাঙালি রক্তে
ঢাকা যাইত স্রোত বইয়া ॥

ও মুজিবরে যখন তোমার কণ্ঠ বাণী

www.pathagar.com

বাঙালিরা কানে শুনি
কোথায় জানি রইয়াছ লুকাইয়া
তুমি বাংলার নয়ন মণি
কান্দি মোরা দিন রজনী
চোখের পানি যাইতাছে বইয়া ॥

ও মুজিবরে তোমার নামের সুখে দুখে
বাঙালির আছে মুখে
মোহন ছবি উঠেরে জাগিয়া
জাতির পিতা হবে যদি
দেখা দাওনা গুণনিধি
আওরে থাক কি অপরাধ পাইয়া ॥

ও মুজিবরে চন্দ্রিমা থাকে আকাশে
কুমুদিনী জলে ভাসে
যেমন ধরশে পরশে জ্বলে হিয়া
তুমি বাংলার প্রাণ শশী
যেন দুঃখ সিন্ধু নীরে ভাসি
উঠ আবার শশী পূর্ণ (পূরণ) হইয়া ॥

ও মুজিবরে যেবা যারে ভালোবাসে
সেত তার আশায় থাকে
জগত চলে এইতো নিয়া
স্বপনেতে দেখা দাও
আবার কোথায় চইলা যাও
বুঝাই দুঃখ কাহারে কহিয়া।
প্রাণ বন্ধুরে ॥

৪. ধুয়া গান

কাজী মাসুক রচিত জারিগানের ধুয়া—

মুহুরী গাঙের উত্তর পাড়ে
সাদা টিনের ঘর

www.pathagar.com

আইতে যাইতে লইত
তোমার অভাগীর খবর।
তুই বড়ো সুন্দরী কন্যারে
ও কন্যা হইছেনে তোর বিয়া
মনে কয় লইয়ারে যাইতাম
নাকফুল বালি দিয়ারে।

৫. আঞ্চলিক গান

ফরিদ মাঝি রচিত পরশুরামের আঞ্চলিক গান

১

পুরুষ : হুনেসসা গোলাপী
তোরে কিছু কথা কইতাম চাই।
নারী কিয়ারে কামাল ভাই
আঁরো কিসু হুইনতাম মনে চায়।
পুরুষ : রাইচ্চা আঁর ঘুম আইয়েনা
কোনো কাজে মন বইয়েনা
তুই ছাড়া আর এই জগতে
নাই আঁর কোনো গতি নাই।
পুরুষ হুনেসসা গোলাপী
তোরে কিছু কথা কইতাম চাই।
নারী : হইলা যেদিন দেইখলাম তোঁয়ারে
উজিরেয়ো দিঘির হাড়ে
হেদিনতুন আঁর বুকের ভিতরে
কেইচ্ছা জানি করে হায়।
পুরুষ হুনেসসা গোলাপী তোরে কিছু কথা কইতাম চাই।
নারী কিয়ারে কামাল ভাই আঁরো কিসু হুইনতাম মনে চায়।
পুরুষ প্রেমে হইড়লে এইচ্ছা লাগে
মইরতে হয় মরার আগে
চুলার উপরে ভাতের হানি
জেইচ্ছা করি উতরায়।
পুরুষ হুনেসসা গোলাপী তোরে কিছু
কথা কইতাম চাই।

www.pathagar.com

নারী কিয়ারে কামাল ভাই
আঁরো কিছু হুইনতাম মনে চায়।

২
(কোরাস)
দেশোবাসী হগলেরে জানাই আস্‌সালাম
আন্ডা বাড়ি ফেনীর উত্তর থানা পরশুরাম
ভাইগো থানা পরশুরাম
শহরেত্তুন পশ্চিমে যান
পাইবেন সুবার বাজার
হেয়ার আগে হাইনকুলে কামাল মামার মাজার
ভাইগো কামাল মামার মাজার
হেডের ভাত যোগাই আমরা ঝরাই
গায়ের ঘাম
আন্ডা বাড়ি ফেনীর উত্তর থানা পরশুরাম
ভাইগো থানা পরশুরাম
কষ্টকরি গাড়িত চড়ি খণ্ডল হাই যাইয়েন
খণ্ডলেরো মিষ্টি আছে হেডগা হুরাই খাইয়েন
হাসা কথা কইলাম ভাইগো
অল্প টেঁয়া দাম
আন্ডা বাড়ি ফেনীর উত্তর থানা পরশুরাম
কত গুণীর জন্ম দিসে এইনা পূণ্য মাটি
এই মাটিতে দেশ প্রেমিকের ছিলো দারুণ ঘাঁটি
ভাইগো ছিলো দারুণ ঘাঁটি
ইতিহাসে আছে লেখা বিলোনিয়া নাম
আন্ডা বাড়ি ফেনীর উত্তর থানা পরশুরাম
দেশোবাসী হগলেরে জানাই আস্‌সালাম
আন্ডা বাড়ি ফেনীর উত্তর থানা পরশুরাম
ভাইগো থানা পরশুরাম।

৩
ছোট্ট বেলায় দুইজন মিলে খেইলতাম কানামাছি।
হেই কথাকান মনতলই আহঁ আইজও বাঁচি আছি

www.pathagar.com

ছোট্ট বেলায় দুইজন মিলে খেইলতাম কানামাছি ॥
মনে আছে বন্ধু একবার মুহুরী গাঙ্গের চরে
জড়াই ধইচ্ছ আঁরে তুঁই সাপ দেখি ডরে।
হেই কথাকান উইঠলে মনের কষ্ট উডে নাচি
ছোট্ট বেলায় দুইজন মিলে খেইলতাম কানামাছি ॥
কেইচ্ছা আসত ও পাষাণী আসতনিকি ভালা
গেলো খোন্দো জাইনতো চাইসিল আঁর ছোট্ট খালা।
একবার আই সাই যাচ্ছা কেইচ্ছা সুখে বাঁচি
ছোট্ট বেলায় দুইজন মিলে খেইলতাম কানামাছি ॥
কোন ভুলে উড়াল দিলি ওরে টিয়া পাখি
কোন কারণে আঁরে তুই দি-গেলিকই ফাঁকি
মুখে আঁর হাসি থাইকলেও
মাথায় দুঃখের খাছি
ছোট্ট বেলায় দুইজন মিলে খেইলতাম কানামাছি ॥
হেই কথাকান মনতলই আহঁ আইজও বাঁচি আছি।

৪

স্বামী কই গেলিরে হোলার মা
জলদি করি আয়
তোর হোলা ভাত হানি থুই
এগিন কিয়া খায়?

স্ত্রী : কিয়া অইসে হোলার বাপ
বোলাও কিয়েলায়
সিলাইউনা ঘরের ভিতরে
লেদাগা ঘুমায়।

স্বামী চেতমাইসসা রইদের মইধ্যে তোর হোলাগা ঘোরে
আঁরে দেইখলে হুরুত করি দৌড়মারে দূরে।

স্ত্রী ছোট্টবেলায় বেক হোলাগুন
এইচ্ছা থাকে হুন
নিজের কথা স্মরণ করি বিশকান বছর গুন।
তঁর ছোড় ভাই এই বয়সেও টোঁ টোঁ করি খায় ॥

স্বামী : কই গেলিরে হোলার মা

www.pathagar.com

জলদি করি আয়
তোর হোলা ভাত হানি থুই
এগিন কিয়া খায়?

স্ত্রী : কিয়া অইসে হোলার বাপ
বোলাও কিয়েলায়
সিলাইউনা ঘরের ভিতরে
লেদাগা ঘুমায়।

স্বামী : সব কথা হেলাই আইনগা বাতাস কর গায়।

স্ত্রী : এসব কথা হেলাই চল বাতাস করি গায়।

স্বামী : কই গেলিরে হোলার মা
জলদি করি আয়
তোর হোলা ভাত হানি থুই
এগিন কিয়া খায়?

স্ত্রী : কিয়া অইসে হোলার বাপ
বোলাও কিয়েলায়
সিলাইউনা ঘরের ভিতরে
লেদাগা ঘুমায়।

৫

মুহুরী নদীরে
তোর বুকে কি দয়া মায়া নাই
তোর বুকে কি দয়া মায়া নাই।
কুলসুমিরে লইয়ারে
বাইনলাম বাড়ি তোর হাড়ে
হেই বাড়িঘর ভাসাই নিলি
সুখের মুখ ন'সাই ॥
তোর বুকে কি দয়া মায়া নাই
কত কবি লেখি গেলগই
তোর গুণের কথা
কোন কারণে আন্ডা বুকে
দিলি তুই ব্যথা
অন আন্ডা কার কাছে যাই
কন্ডে লমু ঠাঁই ॥
তোর বুকে কি দয়া মায়া নাই
মুহুরী নদীরে
তোর বুকে দয়া মায়া নাই।

www.pathagar.com

এটিএম ফারুক রচিত

১
(কোরাস)
ঝম ঝম করি সইলতো ভাইরে
বিলোইন্নার গাড়ি
হেই গাড়িখান বন্ধ হইসে কেমনে যামু বাড়ি
আমরা কেমনে যামু বাড়ি
কান্দে বাতাসি ঘরের মাইনসেলায়
আউলাইদি চুল ছাড়ি।
(অসমাপ্ত)

২
হোলাত্তুন মাইয়া ডাঙ্গর
এই বিয়ারনি ঢক আছে
আরও হুইনাছি মাইয়া ইগায়
টক্কি উডে তাল গাছে।

আম হাড়ে সুয়ারি হাড়ে
আরও হাড়ে তাল
এই বাড়িত্তুন হেই বাড়িত
যাইতে টক্কি হারয় খাল
মাইয়ায়
টক্কি হারয় খাল।

এমনও জাইবা মাইয়া
দেইখছোনি কারবার গোতে
আরও হুইনসি মাইয়া ইগায়
টক্কি উডে তাল গাছে।

হোলাত্তুন মাইয়া ডাঙ্গর
এই বিয়ারনি ঢক আছে
আরও হুইনাছি মাইয়া ইগায়
টক্কি উডে তাল গাছে।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

১. ঢাকঢোল

ঢোল চর্মাচ্ছাদিত এক প্রকার আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। সারা দেশের মতো এটি পরশুরাম-ফুলগাজী অঞ্চলেও দেখা যায়। টাকডুম টাকডুম আওয়াজ শুনলেই বুঝা যায় কোথাও ঢোল বাজছে। ঢোল আর ঢাক অভিন্ন নয়। ঢোল ঢাকের চেয়ে ছোটো। কিন্তু উভয় বাদ্যযন্ত্রেরই দুই প্রান্ত চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। ঢাক বাজানো হয় দু'টি কাঠি দিয়ে একই প্রান্তে। বাংলা ঢোল নামে আরেকটি বাদ্যযন্ত্র আছে। বাংলা ঢোলের আকার সাধারণ ঢোলের চেয়ে বড়ো। বাংলা ঢোলের আওয়াজ সাধারণ ঢোলের চেয়ে গম্ভীর। এছাড়া ঢোলের চেয়ে ছোটো আরেকটি বাদ্যযন্ত্র আছে, যার নাম ঢোলক। ঢোলক দেখতে একটি ছোটো পিপার মতো। ঢোলকের দু'দিকের ব্যাস সমান। ঢেকে রাখা চামড়া তুলনামূলকভাবে পাতলা। ঢোলক বাজাতে কোনো কাঠি লাগে না, হাত দিয়েই বাজানো হয়। ঢোল বাজাতে ডান হাতে একটি কাঠি ব্যবহার করা হয়। বাম হাতের তালু দিয়ে অন্যপ্রান্তে বাজানো হয়। ঢুলিরা ঢোলের ডান দিকে কাঠির বাড়িতে এবং একই সঙ্গে হাতের চাঁটিতে বাম দিকে ঢোল বাজিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা গান শেখে তাদের বাড়িতে এই বাদ্যযন্ত্র চোখে পড়ে।

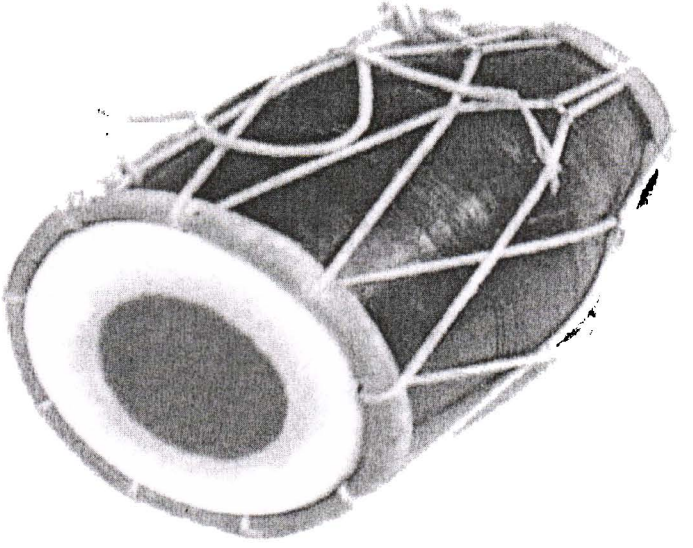

ঢোলক

www.pathagar.com

ঢোল পরশুরাম-ফুলগাজীতে এলাকার হিন্দু সমাজে অতিপ্রচলিত একটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে ঢোল বাজানো হয়। হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা ঢোল ছাড়া চলে না। বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় ঢোল বাজানো হয়। হিন্দুরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঢোল ব্যবহার করে। ঢোলের আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যায়।

২. তবলা

তবলা আনদ্ধ জাতীয় ঘাত বাদ্যযন্ত্র। এটি দুই অংশে বিভক্ত। ডান হাতে বাজাবার অংশটিকে ডাইনা (ডাহিনা, ডাঁয়া) আর বাম হাতে বাজাবার অংশকে বাঁয়া/ডুগি বলে। ডাইনা অংশটি কাঠের তৈরি। উচ্চতা সাধারণত ৯-১২ ইঞ্চি। বায়া অংশটি মাটি কিংবা পিতলের। দুই অংশের উপর চামড়ার ছাউনি এবং কম্পন প্রলম্বিত করার জন্য গাব বা খিরণ দেয়া থাকে। চামড়া দিয়ে ঢাকা আস্তরণের প্রান্ত ঠুঁকে স্বরের উচ্চতা এবং লঘুতা ঠিক রাখা হয়। তবলার বিশেষত্ব এর জটিল অঙ্গুলিক্ষেপণজাত উন্নত বোল। আঙুল দিয়ে বাজানো হয় বলে একে তঙ্কারযন্ত্রও বলা হয়। এই অঞ্চলে তবলাবাদক শিল্পীকে বলা হয় তবলচি। গানের মত তবলার কম্পোজেশান আছে, সেগুলোকে কায়দা বা রেলা বলে। এর বোলগুলো রেলা, কায়দা, গৎ, আঁড়ি, কুআঁড়ি ও গৎপূরণ নামে পরিচিত। কায়দা একটু ধীরে বাজে, রেলা খুব দ্রুত বাজে। যেমন– ধা ধিন ধিন না, ধা ধিন ধিন না, না তিন তিন না, তেটে ধিন ধিন না।

তবলা

www.pathagar.com

৩. মুরলী

যে বাঁশির ওপর গাঁট বন্ধ থাকে, মুখরন্ধ্র যা আঁড়ভাবে ধরে ঠোঁট খানিকটা বাঁকিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়, তার নাম আঁড়বাঁশি। এই বাঁশিকে এই এলাকায় মুরলী বলা হয়। মুরলীতে ফুঁ দেওয়ার ছিদ্রটি বাঁশির শেষ প্রান্তে না করে প্রায় দুই ইঞ্চি ভেতরে বাঁশির গায়ে করা হয়। বাজানোর সময় এই ছিদ্রটি দুই ঠোঁটের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে হয়। এই বাঁশিতে স্বরস্থানে ছয়টি ছিদ্র থাকে। এটা খাড়া করে ধরা হয় না। অনেকটা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে মুখ ও দেহের ডানদিকে প্রসারিত করে পাশাপাশি ধরে বাজানো হয়।

মুরলী

৪. মন্দিরা

তামা বা কাঁসা দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। দুই হাতে দুটো ধরে গান বা বাজনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজানো হয়। মন্দিরা বলতে এক জোড়া ক্ষুদ্রকায় পিতলের বাটি জাতীয় তালবাদ্যকেই বাজানো হয়। বাটিগুলোর নিচে ছোটো ছিদ্র করে দড়ির হাতল দিয়ে আটকানো। বাজানোর সময় দুই হাতের আঙুলের মধ্যে রুজ্জুর তৈরি হাতলগুচ্ছ আটকিয়ে বাটিগুলোকে আঘাত করা হয়। বাটির দেয়াল খানিকটা পুরু হওয়ায় মন্দিরায় বেশ উঁচু পর্দার শব্দ হয়। ঢোলকের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য মন্দিরা ব্যবহার করা হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নির্ধারণে মন্দিরা সহায়ক বাদ্যযন্ত্র। এই এলাকাকে এটাকে খঞ্জনি এবং জুড়িও বলা হয়।

www.pathagar.com

মন্দিরা

৫. শঙ্খ

মৃত শঙ্খের খোলস শঙ্খবাদ্য। শঙ্খের নাভির কাছে ছিদ্র করে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। এক ধরণের সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলস থেকে এ বাদ্যযন্ত্রটির উৎপত্তি। এ ঝিনুকের মুখটি বাঁকা ছিদ্রবিশিষ্ট। ভেতরের ছিদ্রপথও বাঁকা। মুখ দিয়ে ফুঁ দিলেই মিষ্টি-মধুর শব্দ হয়। ঠোঁট দিয়ে জোরে চেপে ফুঁ দিতে হয়। সাধারণত এই ঝিনুকের রং সাদা এবং কিছুটা বাদামি। এই অঞ্চলে হিন্দুরা পূজা-অর্চনায় এটি ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমানরা পাশাপাশি বাস করার ফলে বাঙালির অনেক কৃষ্টি, লোকউৎসব ও লোকাচারের যথেষ্ট সমন্বয় ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ আর হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। ঈদ ও পূজা ধনী-দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো সকলের জন্য আনন্দবার্তা বয়ে আনে। মহররম, মিলাদুন্নবী দিবসে কোরান খতম, মিলাদ মাহফিল, জিকির-আজকার, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদির আয়োজন থাকে। সঙ্গতি সম্পন্ন লোকেরা ফকির মিসকিন দাওয়াত করে ও দান খয়রাত করে। এক সময় সঙ্গতি সম্পন্ন হিন্দু বাড়িতে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' লেগেই থাকতো। বর্তমানেও ফেনী জেলার সর্বত্রই বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

১. চৈত্রসংক্রান্তি ও বৈশাখী উৎসব

পহেলা বৈশাখের বিশেষ দিনে বিগত বছরটির সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট-সুন্দর একটি বছর শুরু করতে চায় কৃষক, কৃষাণী, কামার, কুমোর, তাঁতি, দোকানি সবাই। এ দিনে ব্যবসায়ীগণ বাকিতে সদাই বিক্রি করে না। তাদের প্রথাগত বিশ্বাস, বছরের প্রথম দিনে বাকিতে বিক্রি করলে সারা বছরই বাকিতে বিক্রি করতে হবে। একই বিশ্বাসে এ দিনে কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে না। একইভাবে বাড়ির বৌ-ঝিরাও রান্না করে ভালো মানের খাবার-দাবার। কারণ তাদের বিশ্বাস, বছরের প্রথম দিনে খারাপ খেলে সারা বছরই খারাপ খেতে হবে। নববর্ষের আয়োজন শুরু হয় মূলত বছরের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন থেকেই। সাধারণত এ দিনে সকাল থেকেই ঘরদোর ঝাড়মোছ শুরু হয়। দুপুরের পর চৌদ্দ রকমের শাক সংগ্রহ করে একসঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়; যাকে বলা হয় 'পাঁচন'। মাছ-মাংস খাওয়া হয় না এই দিনে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পরশুরাম পাইলট হাইস্কুল মাঠে মেলা বসে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই মেলার আয়োজন করে থাকে। তবে এই মেলা ঐতিহ্যগত কোনো মেলা নয়। কোনো বছর হয়, কোনো বছর হয় না।

২. ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম। ঈদ ও ফিতর দুটিই আরবি শব্দ। ঈদ এর অর্থ উৎসব বা আনন্দ। ফিতর এর অর্থ বিদীর্ণ করা, উপবাস ভঙ্গকরণ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। এই অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব এটি। রমজান মাসের শবে কদরের রাত থেকে মুসলমানদের ব্যস্ততা তুঙ্গে ওঠে, ঈদকে বরণ করে নেবার জন্য সবাই চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়। শুরু হয় হাট-বাজারে কেনা-বেচার ধুম। গ্রামের দোকানগুলো ভরে ওঠে সেমাই-চিনি-নারিকেল-বাদাম-কিসমিস

www.pathagar.com

ইত্যাদি দ্রব্যাদিতে। মা-বাবারা তাদের মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয় এসব জিনিস, জামাতাকে উপহার দেয় পায়জামা-পাঞ্জাবি-টুপি ইত্যাদি, ছেলেমেয়েদের কিনে দেয় নতুন জামা-কাপড়। ঈদের আগের রাত পর্যন্ত চলে ধুম বেচা-কেনা। শবে কদরের পরদিন থেকে গ্রামের ফকির-মিসকিনরা গেরস্তের বাড়ি বাড়ি ধরনা দেয় ফিতরার টাকার আশায়। ছেলেমেয়েরা ঈদকার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা ও আমন্ত্রণ জানায় তাদের বন্ধুবান্ধবদেরকে। ঈদের আগের দিন বিকেলে মেহেদি পাতা সংগ্রহের এবং রাতে মেহেদি বাটার ধুম পড়ে যায় তাদের মধ্যে। গভীর রাত অব্দি হাতে আর নখে নানা আল্পনায় মেহেদি লাগায় মেয়েরা। ঈদের দিন ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত থাকে বাঁশি, বেলুন ইত্যাদি খেলনা নিয়ে। দোকানিরা ঈদের দিন দোকানের বাইরে চাটাই বিছিয়ে নানা খেলনা সামগ্রী নিয়ে বসে। সেইসব খেলনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি বাঁশের বাঁশি। এই বাঁশির পেছনের দিকটা বেলুনের ভেতর ঢুকিয়ে সুতা দিয়ে ভালো করে বেঁধে নিতে হয়। তারপর ফুঁ দিয়ে বেলুনটা ফুলিয়ে লাউ কি কুমড়ার মতো করে বহিরাংশের ছিদ্রটি ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ইস্টিমারের সাইরেনের মতো ভোঁ-ওঁয়া ভোঁ-ওঁয়া শব্দ। শিশু-কিশোরদের কাছে ঈদের দিনে এই বিশেষ খেলনাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। খেলনার মধ্যে আরো আছে রেফারি-বাঁশি, প্লাস্টিকের তৈরি প্রাইভেট কার। কারটির সামনের সরু ছিদ্রটাতে মোটা একটা সুতা বেঁধে টেনে টেনে চালাতে হয়। আর লাটিম তো ব্যাপক জনপ্রিয় খেলনা। পুরনোটা ফেলে দিয়ে ঈদের দিন কেনা হয় নতুন লাটিম। ঈদের নামাজ শেষে দলে দলে ভাগ হয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বাড়ি সেমাই খেতে যায়। সেমাই বলতে একসময় গ্রামের মানুষদের ভাষায় 'বাংলা সেমাই' বা 'আলবা সেমাই' ছিল প্রধান। চিনি-নারিকেল-বাদাম-কিসমিস ও দুধ সহযোগে রান্না হয় এ সেমাই। চিনামাটির ছোটো ছোটো পিরিচে করে পরিবেশন করা হতো আগত মেহমানদেরকে। তবে এখন খোলা লাচ্চা সেমাইয়ের চাইতে বাহারি প্যাকেটজাত আধুনিক লাচ্চা সেমাইয়ের কদর বেশি। লাচ্চা সেমাইয়ের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নুডুলস্। মাংস বা ডিম দিয়ে রান্না করা এই খাবারটি সেমাইয়ের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। একটু অবস্থাসম্পন্ন গেরস্তরা আরো একধাপ এগিয়ে। তারা সেমাই বা নুডুলস্-এর পরিবর্তে মাংসে পাকানো খিচুরি পরিবেশন করে থাকে। সকাল বেলায় সেমাই খাওয়া হলেও দুপুরে সামর্থ অনুযায়ী মুরগি, গরুর মাংস বা খাসির মাংসের ভোজ চলে। অবস্থাসম্পন্নদের ঘরে তৈরি হয় হালিম, কাবাব, বিরিয়ানি ইত্যাদি।

৩. ঈদুল আযহা

ঈদুল ফিতরের পর ঈদুল আযহা এই অঞ্চলের মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। অবস্থাসম্পন্নরা এ দিনে গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি কোরবানি দিয়ে থাকে। কোরবানির মাংস নিজে খায় এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, ফকির-মিসকিন ও গরিবদের মধ্যে বিলায়।

৪. দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হিন্দু দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। পরশুরাম-ফুলগাজী উপজেলার হিন্দুদের এটি বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব।

www.pathagar.com

শাস্ত্রীয় বিধানে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এবং চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসব পালন করা যায়। চৈত্র অর্থাৎ বসন্তকালের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা ও আশ্বিন অর্থাৎ শরৎকালের দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। পরশুরাম-ফুলগাজীতে শারদীয় দুর্গাপূজা অধিক জনপ্রিয়। যদিও অনেক পরিবারে বাসন্তী দুর্গোৎসব পালনের প্রথাও রয়েছে। এই উৎসবের জাঁকজমক সর্বাধিক। হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে এটি পালন করে থাকেন।

সাধারণ আশ্বিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অর্থাৎ দশমী অবধি পাঁচ দিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহা অষ্টমী, মহা নবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। আবার সমগ্র পক্ষটি দেবীপক্ষ নামে আখ্যায়িত হয়। দেবীপক্ষের সূচনা হয় পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন; এই দিনটি কোজগরি পূর্ণিমা নামে পরিচিত ও বাৎসরিক লক্ষ্মীপূজার দিন হিসাবে গণ্য হয়। দুর্গাপূজা মূলত পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হলেও মহালয়া থেকেই প্রকৃত উৎসবের সূচনা ও কোজগরি লক্ষ্মীপূজায় তার সমাপ্তি।

দুর্গাপূজা দুইভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে–ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক স্তরে ও সমষ্টিগতভাবে পাড়া স্তরে। ব্যক্তিগত পূজাগুলি নিয়মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রীয় বিধানে পালনে বেশি আগ্রহী হয়। এগুলির আয়োজন মূলত বিত্তশালী হিন্দু পরিবারগুলিতেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে যৌথ উদ্যোগেও দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এগুলি বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা নামে পরিচিত।

ফেনীতে দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা দেখার জন্য গবেষক কাজী মোস্তফা কামাল এবং প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী ২১.১০.২০১২ তারিখ বিরাজবাবুর পূজা মণ্ডপে যান। এখানে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আলাপ হয়। ফেনীর বারাহিপুর গ্রামের দিপালি সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি বলেন, "মাকে আরাধনা করলে উনার আশীর্বাদ যেন পাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি মায়ের নিকট"। তিনি পূজার উপকরণ নৈবেদ্য হিসেবে ফল, চাল, কলা, জাম্বুরা নিয়ে এসেছেন। নগদ ৩০০/- টাকা দিয়েছেন। নতুন কাপড় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, পুরোহিত এই কাপড় নিয়ে যান।

দিপালি আরো বলেন, "মহা অষ্টমী মায়ের সবচেয়ে বড়ো পূজা। তিনি সবাইকে দয়া করবেন, ঝড় তুফান থেকে রক্ষা করবেন। আমাদের বিশ্বাস উনি আসার আগে প্রলয় হয়েছে। পৃথিবীতে উনার সন্তানদের সুখ-শান্তিতে বসবাস তিনি নিশ্চিত করবেন।"[১]

বারাহিপুর গ্রামের তপন কুমার শর্মা বলেন, "আমরা আসছি মায়ের কাছে। ফল নিয়ে এসেছি। নারকেলের সন্দেশ, কলা, আপেল, চিনির সন্দেশ, গুড়ের সন্দেশ, তিলের সন্দেশ, আঁখ, জাম্বুরা, ডালিম, স্ট্রবেরি, সাবু, মুগ ডাল, বুটের ডাল, কাপুর, ঘি, মধু, পান ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে মায়ের চরণে দেব।"[২]

www.pathagar.com

বারাহিপুরের শেফালী বালা শিল বলে, "আজ অষ্টমী পূজা। আমরা সবাই মিলে মাকে অঞ্জলি দেব। ফুল, বেলপাতা তাঁর চরণে দেব। মাকে বস্ত্রদান করব। শাঁখা, সিঁদুর, তৈল, আয়না, চিরুনি মাকে দান করলাম। স্বর্ণের আধুলি ও গীতা দান করলাম। এ দিনে আনন্দ করি, উৎসব করি সবাই মিলে। আমি মায়ের কাছে একটি বর চাই আমার স্বামীর জন্য, আমার ছেলেমেয়ের জন্য, সংসারের জন্য এবং ধন সম্পদের জন্য। মা আমাকে বরটা দাও, আমাদের সংসার পরিপূর্ণ রাখ। মা আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি। আমার সংসার তুমি শান্তিতে রাখ। প্রতিবছর যেন আমরা আনন্দ উৎসব করতে পারি। আজ আমি উপবাস করছি। বাড়িতে সবাই উপবাস করছে। মায়ের প্রসাদ লই, তারপর উপবাস ভাঙ্গব বেলা বারোটায়। পাঁচদিন উপবাস করি।"[৩]

সুসজ্জিত দুর্গাপূজার মন্দির

২৩.১০.২০১২ তারিখ ফেনীর তুলাবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত সার্বজনীন দুর্গামন্দিরে দুর্গাপূজার আচার-অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই মন্দির দেখতে অনেকটা রথের মতো। ককসিট ডিজাইনে তৈরি। স্থানীয় মিস্ত্রি এই মন্দির তৈরি করেছেন। ৫৩ বছর ধরে এখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শরিয়তপুরের মঙ্গল পাল এই মন্দিরে দুর্গার প্রতিমা তৈরি করেছেন। তাঁর সম্মানী ৮০,০০০/- টাকা। প্রতিমা তৈরি করতে ১৫/২০ দিন লেগেছে। শিল্পীর সম্মানী ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীসহ সব মিলিয়ে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, "মা দুর্গাদেবী হিমালয়ে বসবাস করেন।

www.pathagar.com

পুরাণে বর্ণিত আছে যে দেবী হিমালয়বাসিনী। বিল্ব ষষ্ঠী পূজার মাধ্যমে দেবীকে মর্তে আহ্বান করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় দেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈদিক মতে দেবীকে এদিন মন্দিরে স্থিতি করা বা স্থাপন করা হয়। সপ্তমীতে দেবীর আবাহন ও ষোড়শ প্রচারী পূজা। মহা অষ্টমীতে দেবী সেদিন গজে আগমন করে পূজামণ্ডপে অধিষ্ঠিত হন। মহা নবমীতে দেবীর হোমাদি দ্বারা পূজা সমাপ্ত করা হয়। ঐদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিজয় দশমীতে নদীতে দেবীর বিসর্জন হয় বেদমন্ত্রের দ্বারা। পৃথিবীতে দেবীর আগমন বিশ্বশান্তির জন্য। ভক্তের কল্যাণের জন্য তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে আসেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন।"[৪]

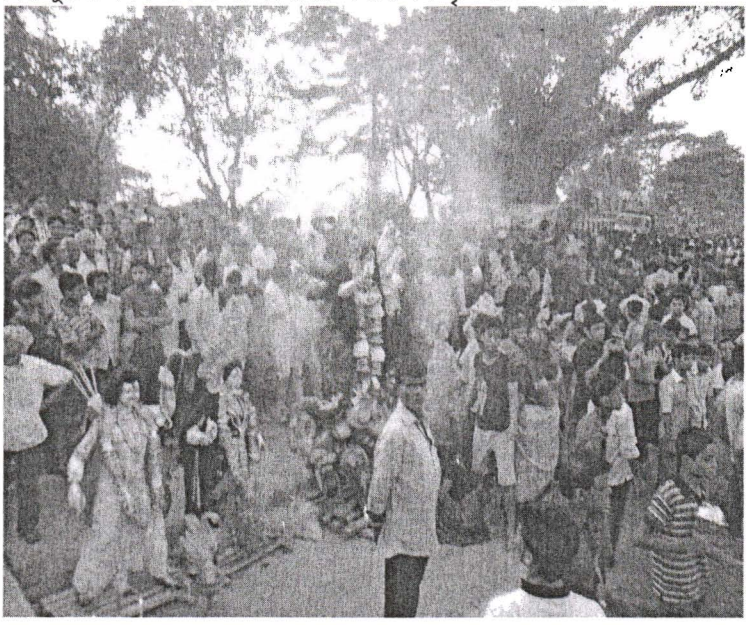

দুর্গাপূজার উৎসবে আগত পূজারীগণ

মন্দিরে আগত তুলাবাড়িয়া গ্রামের লিপি দাস বলেন, "মায়ের কাছে মনের আকাঙ্ক্ষা জানালাম। স্বামী, সংসার সবকিছুর শান্তি কামনা করি। ফল, ফুল, সন্দেশ নৈবেদ্য দিয়েছি মায়ের চরণে। দক্ষিণাও দিতে হয়। নগদ টাকা, চাল দিতে হয়। মনস্কামনা পূরণ হলেও আসি, না হলেও আসি। মায়ের কাছে আসতেই হবে।"[৫]

ফেনী ট্রাংক রোডে অবস্থিত শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দিরে এ বছর (২০১২) জাঁকজমকপূর্ণভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে গিয়ে দেখা যায় হাজার হাজার নর নারী এখানে সমবেত হয়েছে। প্রচণ্ড ভিড়। ফেনীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনের লোকজন, সবাই এসেছেন। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন পুলিশ। কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা হলেও

www.pathagar.com

এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এসেছেন পূজার উৎসব ও আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য।

সেদিন ছিল মা দুর্গার বিসর্জনের দিন। ফেনীর বাঁশপাড়া কোয়ার্টার থেকে আগত মুন্নি বিশ্বাস ও মমতা বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরা বলেন, "মা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে। সেইজন্য আশীর্বাদ নিলাম। তেল, সিঁদুর, ধান, দূর্বা, পান, চিনি টাকা পয়সা, কড়ি, হরিতকি, কাঁচা টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। আজ আমাদের মানসিকভাবে অত্যন্ত খারাপ লাগছে। মা চলে যাচ্ছে।"[৬]

দুর্গা বিসর্জনের পর রাতে ছেলে মেয়েরা স্বস্তিবন্ধনের বলয় পরিধান করে হাতে। বলয় হচ্ছে শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ মা দুর্গা হচ্ছেন অপরাজিতা। শক্তির প্রতীক। লাল সালু কাপড়, শস্য ধান দিয়ে বলয় তৈরি করে হাতে পরিধান করে ছেলেমেয়েরা। যতদিন রাখতে পারে ততদিন হাতে রাখে। এটি মায়ের আশীর্বাদ। স্বস্তিবন্ধন হচ্ছে চরণামৃত। দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য স্বস্তিবন্ধন। ঠাকুরকে দুধ, ঘি, মধু, কর্পূর, গোলাপজল, চিনি মিশিয়ে স্নান করানো হয়। ফেনীর রাজাপুর গ্রামের অর্চনা দত্ত, নাজির রোডের শিল্পী ঘোষ, মাস্টারপাড়ার শান্তা দে ও উজ্জ্বল দে সহ সেদিন ৫০০ জনের মতো ভক্ত স্বস্তিবন্ধন করেন মন্দিরে। ভাবগম্ভীর এবং আনন্দমুখর পরিবেশে সবাইকে স্বস্তিবন্ধন করতে দেখা যায়। গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা মন্দিরে এসেছেন মা দুর্গার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য।

ফেনী সদরে মধ্যম মধুপুর সাহাবাড়ি পূজামণ্ডপে দু'বছর ধরে দুর্গাপূজা হচ্ছে। মন্দিরটি দেখতে আকর্ষণীয়। নকশা ও অলংকরণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি ২০১১ সালে এখানে পূজা শুরু হয়। মন্দিরের কারুকাজ ও নকশার ডিজাইনার হচ্ছেন বাবুল দাস। প্রায় তিনমাস লেগেছে এই নকশা ও কারুকাজে। প্রতিমা তৈরি করেছেন ফরিদপুরের কানাই পাল। পুরো প্যান্ডেলে আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা। এখানে মধ্যম মধুপুর গ্রামের জয় গোবিন্দ এসেছেন মন্দিরে ভক্তি দেওয়ার জন্য। 'মা আমাদের ফেলে চলে গেল'–বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। 'মায়ের আরাধনা আমরা করি'–এ কথা বলেও তিনি মা মা বলে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, "আমি খাজু মিয়ার (খাজা আহমদ, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ) থেকে বয়সে ছোটো। সবাই চলে গেল, আমি রয়ে গেলাম। ভগবান আমাকে রক্ষা কর। মা পৃথিবীর সব মানুষের। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের শান্তিদাতা।"[৭]

বীণাপাণি ক্লাব আয়োজিত দুর্গাপূজা

ফেনী শহরের নিকটবর্তী সমৃদ্ধ একটি গ্রাম তুলাবাড়িয়া। তুলাবাড়িয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী একমাত্র সামাজিক সংগঠন বীণাপাণি ক্লাব। মাস্টার দা' সূর্য সেন এবং নেতাজী সুভাষ বসুর বিপ্লবী আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বীণাপাণি ক্লাব। ক্লাবটি অর্ধ শতাব্দী পার করে এসেছে অনেক পূর্বে। ১৯৯০ সাল থেকে বীণাপাণি ক্লাব দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। ২০১৩ সালে ক্লাবের দুর্গাপূজা ২৩ বছর পূর্ণ হয়। ২০০৭ সালে ফেনী উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নেয় যে, ফেনী উপজেলার মধ্যে তিনটি সেরা পূজামণ্ডপকে প্রতি বছর সম্মাননা পদক দেয়া হবে। প্রথম বছরই অর্থাৎ ২০০৭ সালে বীণাপাণি ক্লাবের পূজামণ্ডপ ফেনী উপজেলার অসংখ্য পূজামণ্ডপের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বীণাপাণি ক্লাবের পূজামণ্ডপ ২০০৮ ও ২০০৯ সালে পর পর দুই বছর প্রথম স্থান, ২০১০ সালে দ্বিতীয় স্থান এবং ২০১১ সালে মধুপুর সাহা বাড়ির পূজামণ্ডপের সাথে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।[৮]

বীণাপাণি ক্লাবের পূজামণ্ডপ

৫. আশুরা

আশুরা আরবি শব্দ, অর্থ মহররম মাসের দশ তারিখ। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে এ দিনটি পালিত হয়। আশুরার গুরুত্ব কারবালায় ইমাম হোসেনের শাহাদাত বরণের কারণে। মুসলমানদের মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত। এদিন রাতে মুরগি বা গরুর মাংস রান্না হয়। বয়স্ক নারী-পুরুষগণ নামাজ পড়েন।

তথ্যনির্দেশ

১. দিপালি সরকার (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : বারাহিপুর, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২১.১০.২০১২, স্থান : বিরাজবাবুর পূজামণ্ডপ

২. তপন কুমার শর্মা (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : বারাহিপুর, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২১.১০.২০১২, স্থান : বিরাজবাবুর পূজামণ্ডপ

www.pathagar.com

৩. শেফালী বালা শিল (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : বারাহিপুর, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২১.১০.২০১২, স্থান : বিরাজবাবুর পূজামণ্ডপ

৪. প্রবীর চক্রবর্তী, পেশা : পুরোহিত, গ্রাম : তুলাবাড়িয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২৩.১০.২০১২

৫. লিপি দাস (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : তুলাবাড়িয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ২৩.১০.২০১২

৬. মুন্নি বিশ্বাস (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : বাঁশপাড়া কোয়ার্টার, জেলা : ফেনী, স্থান : শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির, ট্রাংক রোড, ফেনী; মমতা বিশ্বাস (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), গ্রাম : বাঁশপাড়া কোয়ার্টার, জেলা : ফেনী, স্থান : শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির, ট্রাংক রোড, ফেনী

৭. জয় গোবিন্দ (দুর্গাপূজার দর্শনার্থী), বয়স : ৯৬ বৎসর, গ্রাম : মধ্যম মধুপুর, জেলা : ফেনী, স্থান : মধুপুর সাহাবাড়ি পূজামণ্ডপ

৮. দেবাশীষ পাল, সভাপতি, বীণাপাণি ক্লাব, তুলাবাড়িয়া, ফেনী

www.pathagar.com

লোকাচার

ফেনী জেলায় নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পূজা ছাড়াও পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এখানে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান, মেয়েদের নাক ফোঁড়ানো, কান ফোঁড়ানোর অনুষ্ঠান, মুসলমান ছেলেদের খৎনা ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে।

১. কালীপূজা

হিন্দু, বিশেষত শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। কালী হচ্ছেন দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। তাঁর সম্বন্ধে নানা পুরাণ ও বহু তথ্য আছে। বঙ্গীয় তন্ত্রসার, শ্যামারহস্য প্রভৃতি তন্ত্রে কালীর বিভিন্ন রূপের কথা বলা হয়েছে, যথা : দক্ষিণ, সিদ্ধ, গুহ্য, ভদ্র, শ্মশান, রক্ষা মহাকালী। এদের মধ্যে দক্ষিণকালিকা সর্বাধিক জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে পূজিত। ঘরে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীর পূজা হয় নিত্য। এছাড়া দীপান্বিতা (কার্তিকী অমাবস্যা), চতুর্দশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা ইত্যাদি। এই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এই পূজার প্রচলন রয়েছে।

২. লক্ষ্মীপূজা

হিন্দু ধর্মের অন্যতম লোকায়ত দেবী লক্ষ্মী উপসনায়ও কৃষি আচারের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সম্পদ, সৌভাগ্য, শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে লক্ষ্মী সুপরিচিত। ফসল কাটার পর নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাঁর সম্মানে। লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রচুর জাঁকজমক ও ধুম-ধামের সঙ্গে। রাতে দেবীর বিশেষ প্রসাদ লাভের জন্য ভক্তরা জাগ্রত থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়িত করে চিড়া ও ডাবের জল দিয়ে। লক্ষ্মীর বার্ষিক পূজায় নিবেদন করা হয় নানাবিধ সামগ্রী–তার মধ্যে জল, আতপ চাল, দূর্বা, চন্দন, ফুল, ফল, মধু, দধি, বিল্বপত্র, ঘৃত, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিশেষ অলঙ্কার উল্লেখযোগ্য।

৩. কুমারী পূজা

কুমারী তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। বিশেষত দুর্গাপূজার অঙ্গরূপে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে কালীপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে এবং কামাখ্যাদি শক্তিক্ষেত্রেও কুমারী পূজার প্রচলন আছে। শাস্ত্র মতে কুমারী পূজার উদ্ভব হয় কোলাসুরকে বধ করার পর থেকে। কোলাসুর এক সময় স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করলে বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর শরণাপন্ন হয়। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী পুনর্জন্মে কুমারীরূপে কোলাসুরকে বধ করেন। তারপর থেকেই মর্ত্যে কুমারী পূজার প্রচলন হয়। সারাদেশের মতো এই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এই পূজার প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

৪. গঙ্গাপূজা

প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে জেলেরা গঙ্গাপূজা করেন। গঙ্গাপূজা উপলক্ষে জেলেপাড়া আনন্দ উৎসবের আমেজে মুখরিত হয়ে উঠে। পূজার দিন সবাই নতুন কাপড় চোপড় পরিধান করে। পূজা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বড়োরা উপবাস পালন করেন। এই সময় সবাই নিরামিষভোজী থাকেন। মাটির তৈরি গঙ্গা দেবীর মূর্তি বানাতে কারিগরকে ১৬,০০০/- টাকা সম্মানী দিতে হয়। কারিগর জেলেপাড়ায় এসে মূর্তি তৈরি করেন। পূজার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর গঙ্গা দেবীকে পানিতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

জেলে মরণচন্দ্র জলদাস বলেন, "আমরা সবসময় তাঁকে (গঙ্গাদেবী) স্মরণ করি। রাইত হোয়াইলে (পোহালে) ওর (গঙ্গাদেবী) থেকে আনি খাইতে হয়। নদীতে মাছ ধরার জন্য তার কাছে নিরাপত্তা চাই।" তাঁর স্ত্রী বলেন, "তিনি (গঙ্গাদেবী) আমাদের ভগবান। সাগরের মালিক সে। ছোটো ছোটো দেবতা নয়। সে আবদ্ধ করলে জোয়ার ভাটা কিছু আসবে না।"

গঙ্গাদেবী পূজা উপলক্ষে কীর্তন গান হয় ও মেলা বসে। ভোলা, বরিশাল, খুলনা, সিলেট থেকে গানের দল আসে। একটি দলকে ১৫,০০০/- টাকা থেকে ২০,০০০/- টাকা সম্মানী দিতে হয়। প্রতিবছর চারটি দলকে বায়না দেওয়া হয়। নৌকা ও জাল যাদের আছে তাদের প্রত্যেককে ৩,০০০/- টাকা চাঁদা দিতে হয়। যাদের নৌকা ও জাল নেই তাদের ১,৫০০/- টাকা চাঁদা দিতে হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পূজা উৎসব পালিত হয়।[১]

৫. বিশ্বকর্মা পূজা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে বিশ্বকর্মার মূর্তি বসানো হয়। মূর্তির চারপাশে দাঁড়িপাল্লা, মিস্ত্রির হাতুড়ি, বাটাল, পাটি বানানোর কাজে ব্যবহৃত দা, ছুষ, কাঠের তৈরি আডিল, পাথর এবং টেইলারিং, রাজমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, কামার, কুমারের যন্ত্রপাতি রাখা হয়। ফল, ফুল, বেলপাতা, তুলসী পাতা, দূর্বা ঘাস, ধান, চাল ইত্যাদি দিয়ে পূজা করা হয়। পুরুষরা এই পূজা করে। লুচি, ভুনা খিচুরি, পায়েস, কুইস্যা অনেকে ভোগ হিসেবে দেয়। এই ভোগ ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। মেয়েরা পূজা সাজানোর সময় ও প্রসাদ বিতরণের সময় সহযোগিতা করে। ঘরের যে পুরুষ বা নারী পূজা সাজাবে তাকে উপবাস থাকতে হয়। পাক বা রান্না করে মেয়েরা। মধ্যবিত্তরা মন্দিরে পূজা করে ৬/৭ পরিবার। অনেক ব্যবসায়ী নিজের বাসায় বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পূজার আয়োজন করে।[২]

৬. রক্ষাকালী বা রক্ষাচণ্ডীর পূজা

ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী, রক্ষাচণ্ডী, কালী, রক্ষাকালী, মনসা—গ্রামদেব তারাঙ্ক ভূদেবীর বৈশিষ্ট্য। মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের গ্রামবাসীরা আয়োজন করে রক্ষাকালী বা রক্ষাচণ্ডীর বারোয়ারি পূজা।

www.pathagar.com

৭. শীতলা পূজা

বাংলাদেশের হিন্দু রমণীরা শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে বৈধব্য নিবারণ, সন্তান ও সম্পদ লাভের আশায় পালন করে শীতলা সপ্তমী ব্রত। এই পূজার জন্য কোনো স্থায়ী মন্দির নেই। ঘরের প্রাঙ্গনে কোনো এক স্থানে সম্পন্ন হয় শীতলা পূজার অনুষ্ঠান।

৮. ধন পূর্ণিমা পূজা

ধন দৌলত ও সংসারে উন্নতি, সন্তান কামনা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য নাথরা এই ধন পূর্ণিমা পূজা করে। পৌষ মাসে নাথ সম্প্রদায়ের লোকজন ধন পূর্ণিমা পূজা করে। কলাগাছ পোড়ায়। কলাগাছের সামনে একটি ছোটো পুকুর তৈরি করে মাটি কেটে দুধ ও নারকেলের পানি দিয়ে ঐ পুকুর পূর্ণ করে। তারপর আপেল, কমলা, কলা যখন যে ফল পাওয়া যায় তাই দিয়ে পূজার প্রসাদ দেয়া হয়। এ পূজায় কোনো মূর্তি থাকে না। ঠাকুর এসে পূজা করে। পূজারীরাই পূজার ব্যবস্থা করে। পূজার দিন মেয়েরা উপবাস থাকে।

৯. অন্নপ্রাশন

অন্নপ্রাশন হিন্দুধর্মীয় সংস্কারবিশেষ। 'অন্ন' শব্দের অর্থ যে কোনো খাবার, বিশেষ অর্থ ভাত, আর 'প্রাশন' শব্দের অর্থ খাওয়া। তাই শিশুর প্রথম ভাত খাওয়া অনুষ্ঠানকেই বলা হয় 'অন্নপ্রাশন'। এদিন সাধারণত শিশুর মামা তাকে প্রথম খাইয়ে দেন। অন্নপ্রাশনে ছেলে শিশুর ৬ মাস এবং মেয়ে শিশুর ৭ বা ৯ মাস বয়সকে প্রশস্ত মনে করা হয়। এ সময় শিশুর নামকরণও করা হয়।

১০. আকিকা

একটি ইসলামি অনুষ্ঠান। শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিবসে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নবজাতকের মঙ্গলকামনায় এ অনুষ্ঠান পালিত হয়। ইসলামি বিধান অনুযায়ী এইদিন নবজাতকের নাম রাখা, তার প্রথম চুলকাটা ও কোরবানি দেওয়া সুন্নত। কোনো কারণে সপ্তম দিবসে এ অনুষ্ঠান পালন করা সম্ভব না হলেও শিশু বড়ো হয়ে নিজেও তা করতে পারে। আকিকা উপলক্ষে কোরবানিকৃত পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে এবং এক ভাগ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বাকি এক ভাগ পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা গ্রহণ করে। পরশুরাম-ফুলগাজী উপজেলার ধনী পরিবারে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়।

১১. কুলখানি

কুলখানি ইসলামি অনুষ্ঠানবিশেষ। তবে এটি বিধিবদ্ধ দীনী অনুষ্ঠান নয়। সাধারণত মৃতব্যক্তির দাফনের চতুর্থ দিনে কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়। এই এলাকায় এটিকে 'চাইরদিন্না' বলা হয়। এদিনে গরু-মুরগি জবাই করে লোকজনদের খাওয়ানো হয়।

www.pathagar.com

১২. গায়েহলুদ

গায়েহলুদ বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিবাহের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। বরকনের দাম্পত্য জীবনকে যে কোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এ সব লোকাচার পালন করা হয়। গায়েহলুদ এ সবেরই একটি এবং এটি মূলত একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এই অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

১৩. বিবাহ

ফেনীতে সাধারণতঃ বর কনের জন্মমাসে বিয়ে হয় না। প্রবীণরা বলে থাকেন, ফালগুনের বউ 'আগুন', চৈত্রের বউ 'পয়া', জ্যৈষ্ঠের বিয়ে হয় 'হেট', পৌষের বিয়ে 'পুস্করা' আর কার্তিকের বউ হয় হাতি। তাই বিয়ের দিন-তারিখ স্থির করার জন্য বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসকে উত্তম বিবেচনা করা হয়।

এখানে বিয়ের ঘটককে উকিল বলা হয়। উকিল বর পক্ষ থেকে কনের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কনে পক্ষ বিয়ের প্রস্তাব বিবেচনাকালে বরের বংশ মর্যাদা, বরের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি যাচাই করে দেখে। তাছাড়া বরের বাড়িতে ঘর-দুয়ার, পুকুর-পুষ্করিণীও দেখা হয়। এক সময় স্থানীয় হাট-বাজারে কন্যা পক্ষরা বরকে দেখে নিত; বরও গোপনে কনের বাড়ির পুকুরঘাটে অথবা রাতের অন্ধকারে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে কনেকে দেখার চেষ্টা করতো। এখন অবশ্য সরাসরি বর কনে দেখার নিয়ম চালু হয়েছে। বিয়ের প্রস্তাবে উভয় পক্ষ সম্মত হলে বর পক্ষরা উকিলকে নিয়ে কন্যার পিত্রালয়ে যায় এবং শুভবিবাহের 'ফর্দনামা' সম্পাদন করে। ফর্দনামায় বিয়ের দিন-তারিখ ছাড়াও স্বর্ণালঙ্কারের পরিমাণ, কনে সাজানি বাবত টাকার পরিমাণ (সাজানি-ফৌজদারী) এবং মোহরানার টাকার অঙ্ক লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

বিয়ের আগের রাতে বর ও কনের বাড়িতে 'হোন্দা তোলা' অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানের জন্য বিকাল বেলায় 'মেন্দি' (মেহেদি) গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ একজন কুমারী মেয়ের মাথায় একটা কুলা নিয়ে মেয়েরা মেন্দি গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে। রাতে কেউ হোন্দা বাটে, কেউ মেন্দি বাটে। অতঃপর কনের গায়ে হলুদ, হোন্দা এবং হাতে মেন্দি দেয়া হয়। এসময় মেয়েরা গান করে, নাচ করে এবং হাসি-ঠাট্টা করে।

বিয়ের দিন সকাল বেলায় বরের চুল কাটার জন্য নাপিত আসে। বরকে উঠানে বসিয়ে চুল কাটা হয়। এসময় অন্দর মহল থেকে একদিকে মেয়েদের ফোঁড়ন কাটা, অন্যদিকে তাদের গানের সুরে এক সময় বিয়ে বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠত। বরকে গোসল করাবার সময়ও কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। বরের গোসল পুকুর ঘাটের পরিবর্তে বাড়ির উঠানে সম্পন্ন হয়। বরকে একটা জলচৌকিতে বসিয়ে বরের দুলাভাই ও বন্ধুবান্ধবরা গোসল করায়। গোসলের জন্য পাঁচ পুকুরের পানি আনা হয়। বিত্তবান পরিবারে পাঁচ পুকুরের পানি সংগ্রহ করে ঢোল-বাদ্য বাজানো হয়। গোসল পর্বে বরের দুলাভাইরা

www.pathagar.com

'পাঁচ কাপড়' আদায় করে নেয়। অতঃপর বরকে কোলে করে ভগ্নিপতিরা কাছারি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে বরকে দুলহার সাজে সাজানো হয়।

বরকে সাজানোর শেষ পর্যায় পাঁচজন লোক পরস্পরের হাত ধরে বা এক হাত হয়ে দুলহার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে বরের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়ার লোকজনেরা বরযাত্রী হবার জন্য জমায়েত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুলহাকে টাকা-পয়সা উপঢৌকন দেয়। এটাকে স্থানীয়ভাবে নজরানা বলা হয়। অতঃপর বর দুলহার সাজে কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে মায়ের অনুমতি নেয়ার জন্য ভিতর বাড়িতে যায় এবং মাকে সালাম করে। মা সাধারণতঃ তখন ছেলেকে এক গ্লাস দুধ খেতে দেয় এবং ছেলের পাগড়িতে একটা সুই বা পিন আটকিয়ে দেয়। এতে দুলহার উপর কারো যাদু-টোনা বা জিন-পরীর আছর কার্যকর হয় না বলে বিশ্বাস করা হয়। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ছেলে কনে বাড়িতে যাত্রা করে। তখন হয়তো ঘরের ভিতর থেকে গানের সুরে শোনা যায় :

"বরের মা দাঁড়ায় রইছে দুধ হাতে লইয়া
জুতা মুজা পায়ে দিয়া আশকান পাগড়ি পইর‍্যা
শ্বশুর বাড়ি চলছে দুলহা পালকিতে চড়িয়া।"

উল্লেখ্য, আগেকার দিনে সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের বর সাধারণত পালকি বা হাতিতে চড়ে শ্বশুর বাড়ি যেত। এখন হাতি বা পালকির পরিবর্তে বর-কনের বাহন হিসেবে রিক্সা বা গাড়ি ব্যবহৃত হয়।

দুলহাকে কনে লাভ করার জন্য কনের বাড়িতে এসে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। একজন দুলহাকে মনজিলে পৌছা বা কনের সান্নিধ্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত বেশ অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। তাকে কনের দুলাভাই, ভাবী, ছোটো-ভাই বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি এমন কি পাড়ার সর্দারদের মন জয় করতে হয়। বিয়ে বাড়িতে পৌছার পর বর বা বরযাত্রীদের সামান্যতম ভুলত্রুটির জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হয়; এমন কি শুভকাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কথাও শোনা যায়।

ফেনী অঞ্চলে বিয়েবাড়িতে বেশ কিছু লৌকিকতা প্রচলিত রয়েছে। বরযাত্রীরা বিয়েবাড়ির কাছাকাছি এলে কোনো খোলা জায়গায় বা কারো বাড়ির দরজায় সমবেত হয়। এটাকে দুলহার 'সদর বসা' বলা হয়। বিয়ের উকিল বর পক্ষের আগমনী বার্তা নিয়ে বিয়েবাড়িতে যায়। সেখানে পাড়ার সর্দারগণ একত্রিত হলে বরকে আসার অনুমতি দেয়া হয়। বরকে আগ বাড়ানোর জন্য কনের দুলাভাই ও ছোটো ভাই বোনেরা যায়। বাড়ির সামনে সুসজ্জিত গেটে 'শুভ আগমন' লেখা শোভা পেলেও বরকে সেখানে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কনের ভাই বোনোরা ও পাড়ার ছেলেরা গেটে বরকে নানা রকম প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। বেচারা দুলহা মুখে রুমাল দিয়ে সলজ্জভাবে বসে থাকে। দুলহার বন্ধুবান্ধবগণ তাকে উদ্ধার করার প্রয়াস পায়। অবশেষে কিছু বখশিশের বিনিময়ে দুলহাকে বিবাহ মজলিসে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

বিয়েবাড়ির সামনে সুসজ্জিত বিয়ের গেট

অতঃপর বরযাত্রী বা বৈরাতীদের আপ্যায়নের জন্য প্রথমে শরবত এবং পরে খাবার পরিবেশন করা হয়। দুলহার সামনে দেয়া হয় বড়ো রেকারী ভর্তি সাগরানা যাতে ৮/১০ জন এক সঙ্গে খেতে পারে। আস্ত একটা মোরগের রোস্ট (দুরুজ) রেকারীতে থাকে। বরের বন্ধুবান্ধব ও কনের ভগ্নিপতি ও ছোটো ভাই বোনেরা কাড়াকাড়ি করে রোস্ট খেয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

খাওয়ার পর আক্‌দ বা কলমা পড়ানো হয়। সাধারণত পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব বিয়ের আক্‌দ পড়ান। কনে পক্ষের তিনজন সাক্ষী কনের সম্মতি আনতে যায়। তাদের মধ্যে একজন কনেকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'অত টাকার অলঙ্কার ও অত টাকা মোহরানায় তোমাকে অমুকের (বরের পিতার নাম) পুত্র অমুকের (বরের নাম) সাথে বিয়ে দিতে যাচ্ছি, তুমি এ বিয়েতে রাজি আছ?' এ পর্যায়ে কনের দিকে কয়েকটা পান এগিয়ে দেয়া হয় এবং কনে এ পান স্পর্শ করলে বিয়েতে তার সম্মতি রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। সে পান নিয়ে সাক্ষীগণ মজলিসে আক্‌দ দিতে আসেন। তখন মৌলবি সাহেব দুলহাকে ধার্যকৃত টাকার অলঙ্কার ও মোহরানা এবং কাবিনে লিখিত শর্ত মোতাবেক অমুকের (কনের পিতার নাম) কন্যা অমুককে (কনের নাম) স্ত্রী হিসেবে কবুল করল কিনা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। দুলহার সম্মতি পেলে মৌলবি সাহেব বিবাহের দোয়া পাঠ করেন এবং মুনাজাত করেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে থাকে বউ সাজানি। বর পক্ষের আনা সাজানি সামগ্রী, অলঙ্কারাদি ও বেনারসি শাড়ি দিয়ে বউকে সাজানো হয়। অতঃপর দুলহাকে

www.pathagar.com

অন্দর মহলে ডাকা হয় নববধূর সঙ্গে 'পান-চিনি' খাওয়ানোর জন্য। সেখানে বরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। নববধূর ভাবী, দাদি ও বান্ধবীরা দুলহাকে এমন সব প্রশ্ন করে যা কেউ কোনো দিন সাধারণ জ্ঞানের বইতে পায়নি। নানা রকমের প্রশ্নে বরকে নাজেহাল করার পর দর্শনীর বিনিময়ে বরকে কনের পাশে বসানো হয় এবং নববধূর মুখ দেখানো হয়। মালা বদল ও চিনি খাওয়ানোর পর কন্যার মা বর-কনে দু'জনকে এক গ্লাস দুধ খাওয়ানোর নিয়ম রয়েছে। সবশেষে কনের বাবা অথবা অন্য কোনো মুরুব্বী কনেকে বরের হাতে সোপর্দ করে দেয়। কেউ হয়ত গান ধরে 'সাজাইয়া পরাইয়া কইন্যা দিল পালকিতে তুইল্যা, কইন্যার কাঁন্দনে কাঁন্দে কইন্যার মা, কইন্যার বাপ চিন্তা করে বারান্দায় বইয়্যা'।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাৎকার : মরণচন্দ্র জলদাস, পেশা : জেলে, স্থান : সোনাগাজীর চরখোন্দকার জেলেপাড়া, তারিখ : ১৯.১১.২০১৩ ও ২২.১১.২০১৩

২. সাবিত্রী দেব নাথ, বয়স : ৩৫ বৎসর, গ্রাম : কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

৩. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ২০১-২০৩

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

রান্না-বান্না ও সুস্বাদু খাদ্য খাওয়া ফেনীর মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিয়ে-শাদি, মেজবান-জেয়াফতে সাধারণত পুরুষরা রান্না-বান্না করে। শীতকালীন পিঠার জন্য ফেনীর খ্যাতি রয়েছে। শীতকালীন পিঠার মধ্যে খোলা পিঠা, ছাঁইয়া পিঠা, ধুঁয়া পিঠা, থালা পিঠা, তাল পিঠা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া খাজা, গজা, চিড়া, মুড়ি, মোয়া ইত্যাদি স্থানীয় বাজারে কেনা-বেচা হয়।

খেজুরের রস

শীতকালে আবহমান গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা-শিরনি খাওয়ার ধুম। আর শীতকালে এগুলো তৈরিতে ব্যবহার হয় গুড় ও খেজুরের রস। তাই শীতকালে খেজুর গাছের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। খেজুর গাছের রস সংগ্রহের পদ্ধতিটিও চমৎকার। গাছের কাণ্ডের উপরিভাগের যে অংশ থেকে ডগা ছড়িয়ে পড়ে সে অংশের কিছুটা নিচে ছেনি দিয়ে ভালোভাবে চিরে এতে বাঁশের নল ঢুকিয়ে দিতে হয়। তারপর সেই নল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়তে থাকে। যারা খেজুরের রস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের বলা হয় 'গাছি'। গাছিরা বিকালে খেজুর গাছে কলস বেঁধে রাখে। রাতে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ে ভর্তি হয়ে যায় কলস। ভোরে গাছিরা প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে রস সংগ্রহ করে থাকে। শীতের সকালে মাটির কলসিতে করে বিক্রি করে খেজুরের রস। প্রতি কেজি খেজুরের রসের দাম ২০/২৫ টাকা। খেজুরের রস ছোটো-বড়ো সব মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

পিঠাপুলি

একসময় পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলাবাসীর অকৃত্রিম আতিথেয়তার অনেক কাহিনি ছিল। এখনো তারা আতিথেয়তায় অনন্য। তাদের আতিথেয়তার অন্যতম উপাদান বা উপকরণ হচ্ছে পিঠাপুলি। পরশুরাম-ফুলগাজীতে প্রচলিত পিঠাপুলিসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. তেলে ভাজা পিঠা : পুলি পিঠা, পাবন পিঠা, তালের পিঠা, সুজি পিঠা, পুয়া পিঠা ইত্যাদি।
২. তেলবিহীন পিঠা : সানকি পিঠা, চিতই পিঠা, সাইন্না পিঠা, ভাপা পিঠা, খোলাজালি বা খোলাঝাঁ পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা প্রভৃতি।
৩. সিরাযুক্ত পিঠা : সুজি সিরা পিঠা, হাক্কন পিঠা প্রভৃতি।

১. তেলে ভাজা পিঠার বিবরণ

পুলি পিঠা : পুলি পিঠা এই অঞ্চলে এক বিশেষ ঐতিহ্যবাহী পিঠা। নারিকেল ও গুড় বা চিনির সংমিশ্রণে এক বিশেষ আঙ্গিকে ও নকশায় এ পিঠা তৈরি করা হয়। বিশেষ

www.pathagar.com

করে নতুন মেহমানদের আপ্যায়নে এ পিঠা অপরিহার্য। কনের বাড়ি থেকে এ পিঠা বরের বাড়ি পাঠাতে হয়। এই পিঠাকে আবার আঞ্চলিক ভাষায় হুলি হিডা বা নারিকেলের হিডা বলা হয়।

পাবন পিঠা : ময়দার সাথে ডিম এবং চিনি মিশিয়ে রুটির মত করে ছোটো ছোটো বিশেষ টুকরো করে এই পিঠা তেলে ভেজে তৈরি করা হয়।

সুজি পিঠা : সুজিকে পানিতে ভিজিয়ে চিনি, ময়দা একসাথে মিশিয়ে তাকে তেলে ভেজে সুজি পিঠা তৈরি করা হয়।

তালের পিঠা : ভাদ্রের অসহ্য গরমে পাকা তালের মৌ-মৌ লোভনীয় ঘ্রাণ ভোজন-রসিককে তালের পিঠা খেতে রসিয়ে তোলে। বিশেষ কায়দায় তাল হতে রসালো অংশ বের করে তার সাথে চিনি ও ময়দা মিশিয়ে তালের পিঠা তৈরি করা হয়।

পুয়া পিঠা : পুয়া পিঠা একটি অতি পরিচিত ও আকর্ষণীয় পিঠা। অতি সহজেই এ পিঠা তৈরি করা যায়। গ্রামে বৌ-ঝিরা অল্প সময়ে অতিথি আপ্যায়নের জন্য এ পিঠা তৈরি করে থাকে।

২. তেলবিহীন পিঠার বিবরণ

সানকি পিঠা : কলাপাতার মোড়কে এ পিঠা তৈরি করা হয়। শীতের সকালে খুব ভোরে উঠে এ পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা।

চিতই পিঠা : চাউলের গুড়ার নরম কাইয়ের সাথে ডিম মিশিয়ে তাকে এক চামচ এক চামচ করে মাটির গরম পাতিল বা খোলার ওপর দিয়ে চিতই পিঠা তৈরি করা হয়।

সাইন্না পিঠা : এ অঞ্চলে এ পিঠার প্রচলন খুব বেশি। হাতের তালুতে ঘষে ঘষে বড়ো বড়ো গোল গোল অনেকটা লাটিমের মত এ পিঠা গরম পানিতে ভাপ দিয়ে তৈরি করা হয়।

ভাপা পিঠা : ভাপা পিঠাও এই অঞ্চলের একটি অতি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা। চাউলের গুড়ার সাথে খেজুরের গুড় এবং নারকেল মিশিয়ে ছোটো ছোটো বাটিতে রেখে বিশেষ ভাজ করে পরে গরম পানিতে ভাপ দিয়ে ভাপা পিঠা তৈরি করা হয়। শীতকালে এ পিঠা বেশি তৈরি করা হয়। এটি অত্যন্ত মজাদার পিঠা।

খোলাজালি পিঠা : এই অঞ্চলে এটি অতি পরিচিত ও সুস্বাদু পিঠা। সাধারণত শীতকালেই এ পিঠা তৈরি করা হয়। শীতের ভোরে খেজুরের রসের সাথে নারিকেল মিশিয়ে এ পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। চিতই পিঠার তুলনায় খোলাজালি পিঠা আকারে অনেকটা পাতলা। এ পিঠার পুরোটাই ছিদ্রযুক্ত, অনেকটা জালির মত।

পাটিসাপটা পিঠা : এ পিঠাকে 'হাডি বড়া হিডা' বলা হয়। চিনিযুক্ত ময়দার কাইকে অতি অল্প তেলের কড়াইয়ে ঢেলে প্রথমে চেপ্টা গোল করে তারপর এপিঠ ওপিঠ করে অনেকটা আয়তাকার করে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

৩. সিরাযুক্ত পিঠার বিবরণ

সুজি সিরা পিঠা : সুজি, চিনি এবং ময়দা একসাথে মিশিয়ে তেলে ভেজে তারপর তাকে চিনির সিরার মধ্যে ঢেলে সুজি সিরা পিঠা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

হাক্কন পিঠা : চিতই পিঠাকে টুকরো টুকরো করে নারিকেল ও চিনির সাথে মিশিয়ে তাকে রান্না করে হাক্কন পিঠা তৈরি করা হয়। নবজাতকের জন্মের পাঁচ বা সাত দিনের মাথায় নাম রাখার সময় এই পিঠা তৈরি করে তা পাড়াপড়শির বাড়িতে পরিবেশন করা হয়।

পিঠা তৈরির জন্য চালের গুড়ি প্রস্তুত হচ্ছে

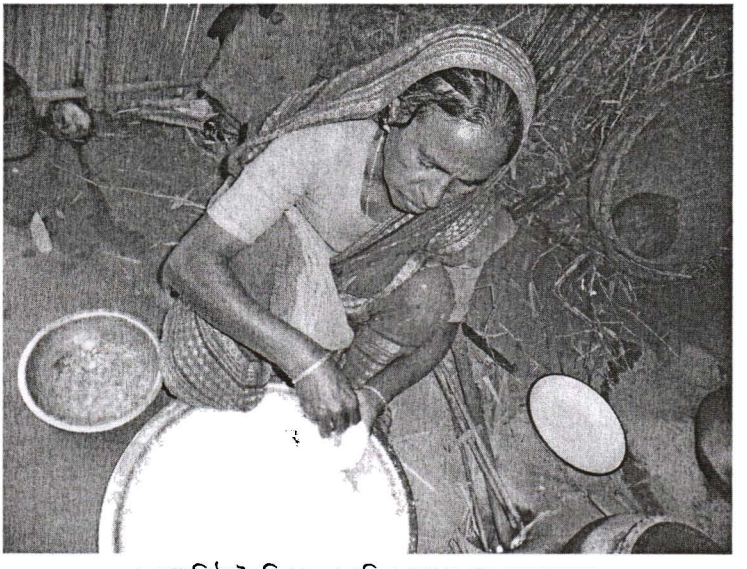

ভাপা পিঠা তৈরির জন্য গুড়ির ভেতর গুড় দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

চুটকি পিঠা : কেউ কেউ এই পিঠাকে ছেঁইয়া পিঠাও বলে। এ পিঠা সবাই তৈরি করতে পারে না। বিশেষ প্রক্রিয়ায় দু'আঙুলের মাঝে আটা রেখে ঘষা দিয়ে খুব ছোটো ছোটো আকারে এই পিঠা তৈরি করা হয়। এ পিঠা সাধারণত রমজান মাসে তৈরি করা হয় এবং ২৭ রমজানের রাতে বা ঈদের দিন রান্না করা হয়। এ পিঠা তৈরিতে যারা পারদর্শী তাদেরকে অন্য পরিবারে নাইউর নেয়া হয়।

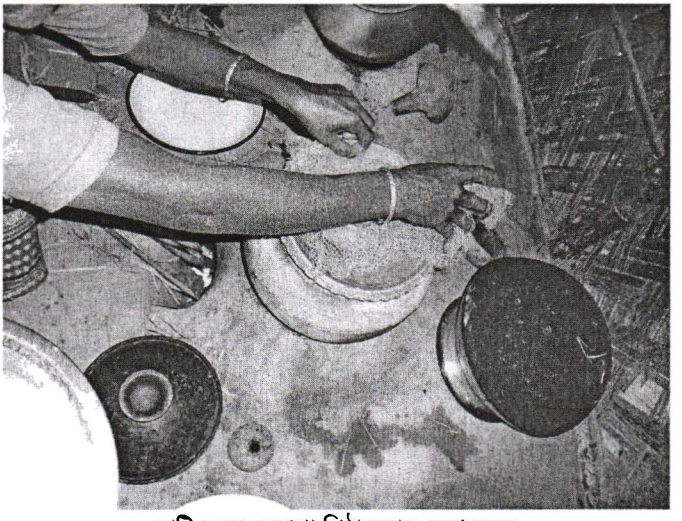

বাটিতে করে ভাপা পিঠা চুলায় দেয়া হচ্ছে

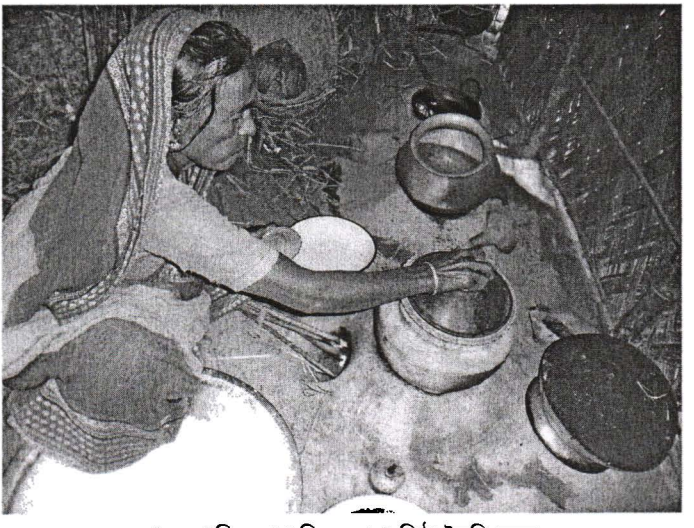

গরম পানির ভাপ দিয়ে ভাপা পিঠা তৈরি হচ্ছে

www.pathagar.com

মিষ্টি

অতুল মজুমদারের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি

অতুল চন্দ্র মজুমদার ১৯২২ সালে সোনাগাজী থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মঙ্গলকান্দী হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর উনার জ্যাঠাত ভাই কুমোদ মজুমদার রেলওয়ে কনট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে পাহাড়তলি রেল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর ভগ্নিপতি শসিকুমার নন্দী তাঁকে পরশুরাম এনে পরশুরাম হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন শসিনন্দী পরশুরাম বাজারস্থ তাঁর মিষ্টির দোকানে অতুল মজুমদারকে কাজে নিযুক্ত করেন। শসিনন্দীর বাড়ি ছিল ফরিদপুর। শসিনন্দীর কাছ থেকে তিনি মিষ্টি তৈরির কাজ শিখেন। শসিনন্দী ভারতের বিলোনিয়া চলে গেলে তাঁর বাবা এবং তাঁর বড়ো ভাই অতীন্দ্র মজুমদার যৌথভাবে মিষ্টি ব্যবসা শুরু করেন।

অতুল চন্দ্র মজুমদারের ছেলে অ্যাডভোকেট স্বাধীন মজুমদার বলেন, "১৯৫০ সালের দিকে জ্যাঠা অতীন্দ্র মজুমদার ভারতের বিলোনিয়া চলে গেলে আমার বাবা এককভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিষ্টির ব্যবসায় ছিলেন। তখন রসগোল্লা, বাদশা ভোগ, লালমোহন, মিহিদানা, লবঙ্গ, নিমকি, জিলাপি, রসমালাই, গজা, খাজা, লুচি, হালুয়া ইত্যাদি তৈরি এবং বিক্রি করতেন। পরশুরাম এলাকায় গরুর খাঁটি দুধ সহজলভ্য আছে বিধায় মিষ্টির মান সবসময় ভালো হয়। বর্তমানেও মিষ্টি তৈরির দুধ ল্যাকটোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করে খাঁটি দুধ দ্বারা মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়।

পাকস্তান আমলে একজন দুধ বিক্রেতা সর্বোচ্চ চার-পাঁচ লিটার দুধ বিক্রি করতে পারতেন। সে স্থলে বর্তমানে এলাকায় বহু শিক্ষিত যুবক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী একাধিক গাভী পালন করে সকাল বিকেল সর্বোচ্চ ৬০ লিটার পর্যন্ত দুধ বিক্রি করতে পারেন। বর্তমানে প্রতি লিটার দুধের দাম ৫৫ টাকা। অভিজ্ঞ কর্মচারী দুধ দেখলেই বুঝতে পারেন খাঁটি কিনা।

মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়া

দুধ প্রথমে ১৫/২০ লিটার এ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে জ্বাল দেওয়া হয়। ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দুধ ফুটানো হয়। চুলা থেকে নামিয়ে ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আসলে তাতে ছানার জল (চুকা–আগের দিনেরটা) মিশানো হয়। মিশানোর পর দুধ আংশিক ছানা হয়ে যায়। ঠান্ডা হওয়ার পর পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা বেধে ছানার জল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর নিংড়িয়ে সব পানি বের করার পর একটা কাঠের বড়ো পাত্রে ছানা রেখে তাতে সামান্য ময়দা মিশিয়ে চটকানো হয়। উত্তমরূপে চটকানোর পর প্রয়োজনমত ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করে দুই হাতে ছানার গোল্লায় রূপ দেওয়া হয়। একটি লোহা বা এ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে চিনির সিরা প্রস্তুত করার পর ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তাতে কাঁচা ছানার গোল্লা ছেড়ে দেওয়া হয়। ৩০/৪০ মিনিট ফুটন্ত সিরাতে অনেকক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর ছানার গোল্লা সিদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে গেলে তাতে সামান্য ঠান্ডা জল দিয়ে পাঁচ/ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আসার পর ছানার মিষ্টি খাওয়ার উপযুক্ত হয়। খাঁটি ছানা ও মিষ্টির সিরার ঘনত্বের ওপর মিষ্টির গুণাগুণ নির্ভর করে। লালমোহন তৈরির পূর্বে ছানার কাঁচাগোল্লা প্রথমত সিরার পরিবর্তে ডুবো তেলে ভেজে লাল করা হয়। এরপর তেল ঝরিয়ে ঘন গরম সিরায় ঢেলে দিতে হয়। সাত/আট ঘণ্টা পর খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

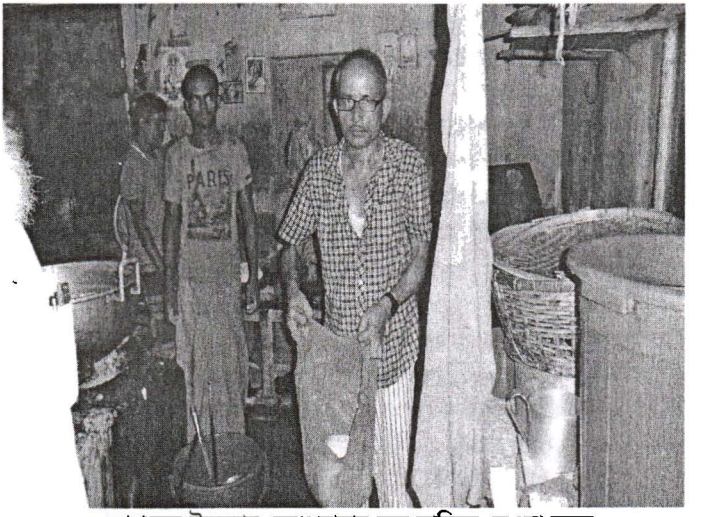

কাপড়ের টুকরোয় বেধে ছানার জল ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে

বড়ো পাত্রে ছানা রেখে ময়দা মিশিয়ে চটকানো হচ্ছে

www.pathagar.com

রসমালাই প্রস্তুত করার জন্য ৪০ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ১৮ লিটারে আনতে হয়। এরপর যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী রসগোল্লার সাইজ ছোটো বড়ো করে দুধের ক্ষিরের মধ্যে ঢালতে হয়।[১]

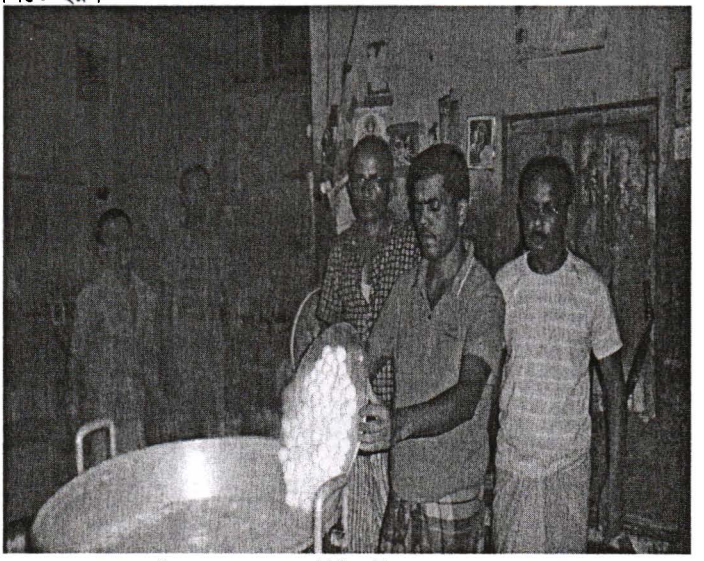

কাঁচা ছানার গোল্লা চিনির সিরায় ঢালা হচ্ছে

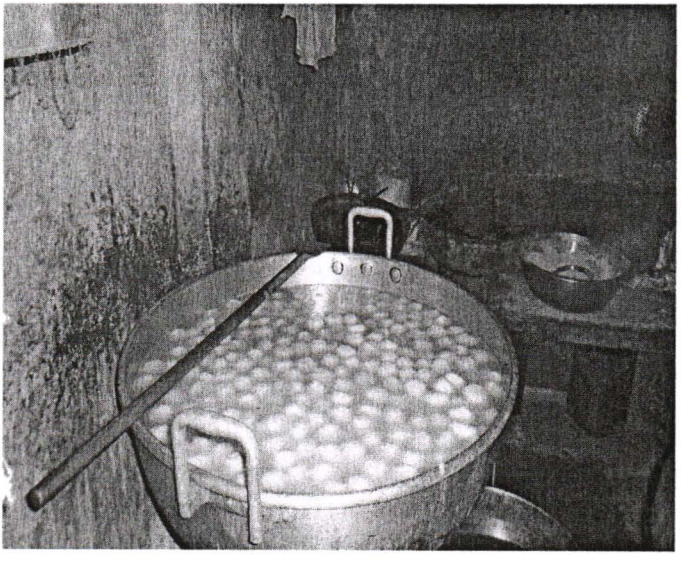

ফুটন্ত সিরাতে জ্বাল দিয়ে ছানার গোল্লা সিদ্ধ করা হচ্ছে

www.pathagar.com

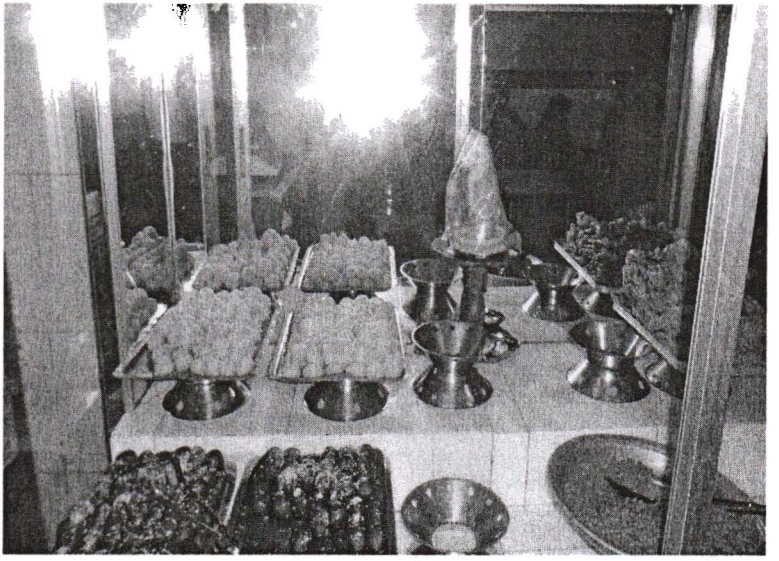

দোকানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন রকম মিষ্টি

খণ্ডলের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি

মিজানুর রহমান পাটোয়ারি এ মিষ্টি তৈরির প্রধান কারিগর। মিষ্টি তৈরির জন্য অনন্তপুর, সলিয়া, ফুলগাজী থেকে দুধ ক্রয় করা হয়। এক লিটার দুধের দাম ৫৫ টাকা। প্লাস্টিকের বোতলে করে (এক লিটার/দুই লিটার) দুধ নিয়ে আসে কৃষকরা এবং খামারিরা।

মিজানুর রহমান পাটোয়ারি ১৯৮৮ সালে আইএ পাস করেন। ১৯৯০ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দেন। ২০০২ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জ্যাঠাত ভাই কবির আহমদ তাঁকে এই ব্যবসায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাবা আবদুল গফুর ও জ্যাঠাত ভাই কবির আহমেদ মিষ্টির দোকান শুরু করেন খণ্ডল কালীবাজারে। প্রথমে চা'র দোকান ছিল। চা এবং বিস্কিট বিক্রি করতেন। যৌথ পরিবার ভিন্ন হয়ে যায়। ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে খণ্ডল কালীবাজারে যুগল বণিক নামে একজন হিন্দু ভদ্রলোক মিষ্টির দোকান দেয়। কিছুদিন পর তিনি দোকান ছেড়ে দেন। তিনি মিজানুর রহমানের জ্যাঠাত ভাইকে মিষ্টি বানাতে বলেন। যুগল বণিকের সহযোগিতায় তার জ্যাঠাত ভাই কবির আহমেদ পাটোয়ারি মিষ্টি বানানোর পদ্ধতি শিখেন এবং ব্যবসা শুরু করেন। যুগল বণিক মাঝে মাঝে মিষ্টি বানানো শিখাতেন। কবির আহমেদ পাটোয়ারি বহু কষ্টে মিষ্টি বানানো শিখেন নিজের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে। প্রথমে রসগোল্লা বানানো শুরু করেন। আস্তে আস্তে এই মিষ্টি জনপ্রিয় হয়ে যায়। খণ্ডল কালীবাজারে খণ্ডলের মিষ্টি বলে নাম ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

২০০৪ সালে তিনি তাঁর জ্যাঠাত ভাইয়ের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবসায় যোগ দেন। রসগোল্লা এবং নিমকি বানাতেন। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরশুরাম বাজারে খণ্ডল মিষ্টির দ্বিতীয় শাখা শুরু হয়। প্রথমে যৌথভাবে এই মিষ্টির ব্যবসা ছিল। ২০০৮ সালে তিনি নিজে এই ব্যবসা শুরু করেন পরশুরামে। খণ্ডলের পাটোয়ারি পরিবারের ঐতিহ্যবাহী আদি মিষ্টির তিনটি শাখা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে খণ্ডল কালীবাজার শাখা, পরশুরামে খণ্ডলের ১নং পাটোয়ারি মিষ্টিমেলা এবং বক্সমাহমুদ বাজারে খণ্ডলের পাটোয়ারি মিষ্টিমেলা। বর্তমানে স্পঞ্জ খণ্ডল মিষ্টি, দধি, নিমকি, রসমালাই তৈরি হয়। স্পঞ্জ মিষ্টির বৈশিষ্ট্য হলো এটি soft বা hard নয়। অন্যান্য স্পঞ্জ থেকে আলাদা।

তৈরির প্রক্রিয়া

প্রথমে ২০ লিটার দুধ এ্যালুমিনিয়ামের সসপেনে জ্বাল দিতে হয়। কেরোসিনের চুলায় জ্বাল দেওয়া হয়। চুলা থেকে নামিয়ে ছানার পানি দিয়ে ছানা সৃষ্টি করতে হয়। উল্লেখ্য, ছানার পানির বীজ সংরক্ষণ করতে হয়। দুধকে সসপেনে একটু নাড়া দিয়ে বা ঘুরিয়ে সংরক্ষিত ছানার পানি বা বীজ ঢাললেই সব দুধ ছানা হয়ে যায়। খাঁটি দুধকে ফাটিয়ে ছানা সৃষ্টি করতে হয়। খারাপ দুধ বা যে দুধ চুলার উপর ফেটে যায় সেই দুধের ছানায় মিষ্টি তৈরি করা যাবে না। চিনির যে রং হবে মিষ্টিরও সেই রং হবে।

ছানা সৃষ্টি হওয়ার পর ছানাগুলো একটু ঠান্ডা করে পানি সরিয়ে নিয়ে finishing করতে হয়। ছানা গামছায় নিয়ে পানি সরিয়ে মসৃণ করা হয় এবং হাত দিয়ে ছানার গোল্লা তৈরি করা হয়। এই গোল্লাগুলো চিনির গরম সিরার মধ্যে দিয়ে মিষ্টি তৈরি করতে হয়। উল্লেখ্য, চিনির সিরা আগে তৈরি করে নিতে হয়। চুলার উপর ছানার গোল্লা মিশ্রিত সিরা রাখতে হয়। Boiling হবে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। একমাত্র কারিগর বুঝতে পারেন মিষ্টি তৈরি হয়েছে কিনা। চুলা থেকে নামিয়ে পানির হাউসে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর বিক্রি শুরু হয়।

রসমালাই তৈরির প্রক্রিয়া

রসমালাই তৈরির জন্য দুধকে অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়ে গাঢ় করতে হয়। দুধ ঘন হওয়ার পর ঠান্ডা করে মিষ্টির জন্য চিনি মিশাতে হয়। ছানার ছোটো ছোটো গোল্লা ঘন দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাকেট করতে হয়। ছানার গোল্লা তৈরির প্রক্রিয়া একইরকম। এই মিষ্টির চাহিদা বেশি। প্রতি কেজি স্পঞ্জের মূল্য ১৫০ টাকা। বর্তমানে প্রবাসী বাঙালিরা সৌদিআরব, আবুধাবি, কাতার, মালয়েশিয়া, ওমানে এই মিষ্টি নিয়ে যান। ইউরোপ ও আমেরিকায়ও এই মিষ্টি অনেকে নিয়ে যান।

খণ্ডলের মিষ্টি দোকানের মালিক মিজানুর রহমান পাটোয়ারি বলেন, "আমাদের নাম ব্যবহার করে বর্তমানে অনেকে নাম পাল্টিয়ে যেমন, আদি খণ্ডল, নিউ খণ্ডল, আসল খণ্ডল নাম দিয়ে খণ্ডলের মিষ্টির ব্যবসা করছেন। এটি কুমিল্লা মাতৃভাণ্ডারের মতোই। আমার ছেলে মহিউদ্দিন পাটোয়ারিও মিষ্টি বানাতে জানে। আমার ভাগিনা মোহাম্মদ আলমও মিষ্টি বানানো শিখেছেন। মজার ব্যাপার হলো আমার ভাগিনা আলম 'বক্কর খণ্ডলের মিষ্টি' নামে মিষ্টির দোকান দিয়েছে। তবে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। আমার মেয়ের জামাই রেজাউল করিম আমার নিকট থেকে মিষ্টি বানানো শিখেছে।

www.pathagar.com

আমার মেয়ে জামাই খণ্ডলের মিষ্টির নাম ব্যবহার করে আমজাদ হাটে মিষ্টির দোকান দিয়েছে।"[২]

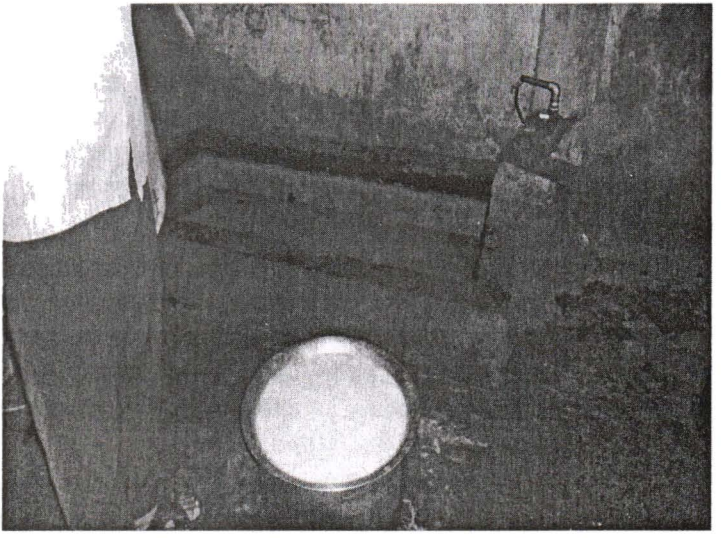

এ্যালুমিনিয়ামের সসপেনে জ্বাল দেয়া দুধ

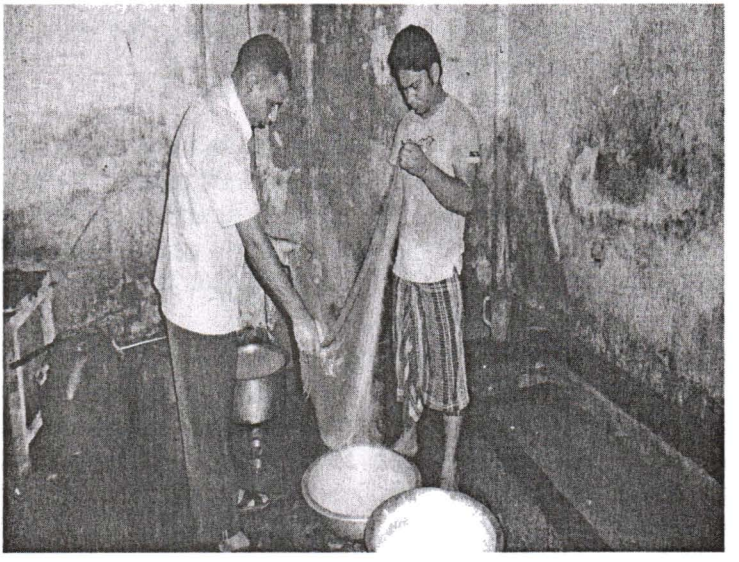

ছানা গামছায় নিয়ে পানি সরিয়ে মসৃণ করা হচ্ছে

www.pathagar.com

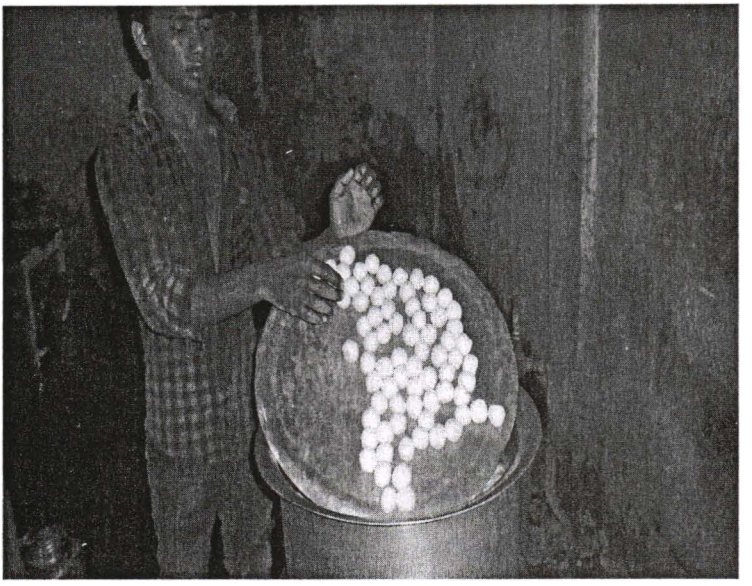

হাত দিয়ে ছানার গোল্লা তৈরি করা হয়েছে

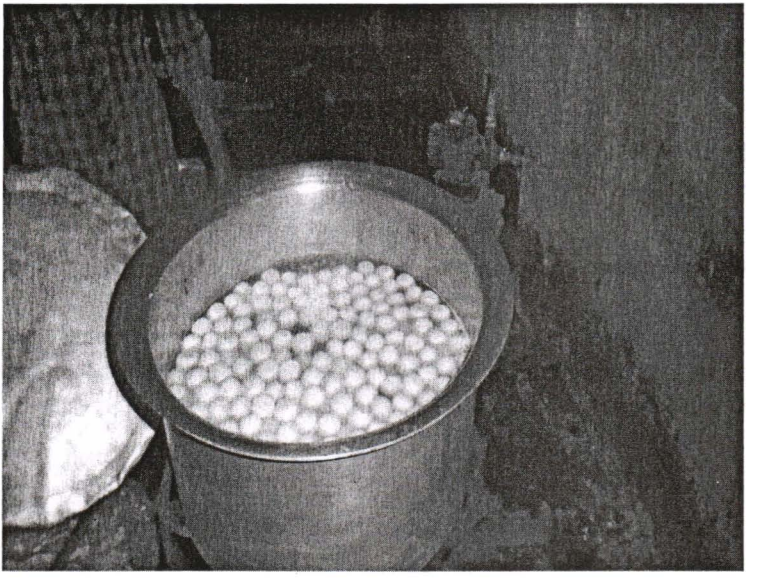

ছানার গোল্লা চিনির গরম সিরার মধ্যে দিয়ে মিষ্টি তৈরি করা হচ্ছে

www.pathagar.com

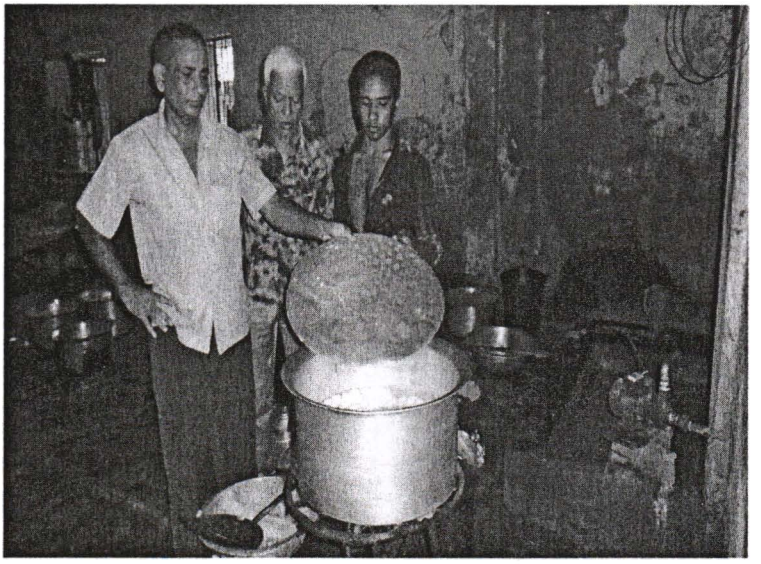

ছানার গোল্লা মিশ্রিত সিরা চুলার উপর রেখে জ্বাল দেয়া হচ্ছে

নারিকেলের চিড়া

এই এলাকার জলবায়ু নারিকেল চাষের অত্যন্ত উপযোগী। নতুন অতিথি আপ্যায়নে নারিকেলের চিড়া তৈরি করা হয়। বিশেষ পারদর্শী মহিলাগণ নারিকেলের চিড়া তৈরি করেন।

শসার মোরব্বা

গাজরের হালুয়ার মত শসাকেও সিদ্ধ করে তার সাথে চিনি মিশিয়ে শসার মোরব্বা তৈরি করা হয়।

খেজুর রসের পায়েস (শিরনি)

সাধারণত শীতকালের সকালবেলা খেজুরের রস ও চাউল দ্বারা এই শিরনি তৈরি করা হয়।

খাডা

শক্ত কদু কিংবা শক্ত শসার ভিতরের অংশ ছোটো ছোটো টুকরো করে তার সাথে চিনি এবং নারিকেল মিশিয়ে খাডা তৈরি করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. এ্যাডভোকেট স্বাধীন মজুমদার, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৪.০৯.২০১৩

২. মিজানুর রহমান পাটোয়ারি, পেশা : মিষ্টি তৈরি, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

www.pathagar.com

লোকনাট্য

পরশুরামে লোকনাট্যচর্চা

একসময় ফেনী জেলায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই এসব অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। চল্লিশের দশকে পরশুরামের সংস্কৃতির একটি মুখ্য বিষয় ছিল যাত্রা। পঞ্চাশের দশকের ভারত বিভক্তির কারণে অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে চলে যায়। ফলে পরশুরামের সাংস্কৃতিক অঙ্গন হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়ে। এই ঝিমিয়ে পড়া সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য যাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন বেড়াবাড়িয়ার বাবু অনাথ চক্রবর্তী ও বাবু গুরুচরণ রায়, অনন্তপুরের মাষ্টার নিশিকান্ত নাথ, কোলাপাড়ার রাখাল চন্দ্র সাহা। পরবর্তীতে অনন্তপুরের বাবু সুধীর চন্দ্র নাথ, কোলাপাড়ার বাবু অমর কৃষ্ণ নাথ ও অতুল চন্দ্র নাথ, এদের প্রত্যেকের এক একটি যাত্রাদল ছিল। যাত্রা যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন পঞ্চাশের দশকে কিছু দুঃসাহসী যুবক সমাজের বিরুদ্ধে অনেকটা বিদ্রোহ করে নাট্যচর্চা আরম্ভ করে নাটক মঞ্চস্থ করেন। তারা হলেন সলিয়ার জনাব আমিনুল করিম মজুমদার, উত্তর গুথুমার বাচা মিয়া চৌধুরী, কোলাপাড়ার সাহাবউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সামাদ চৌধুরী ও আরো অনেকে। পরশুরামে একসময় 'গুনাই বিবি', 'সাগর সেচা মানিক', 'সিঁদুর নিওনা মুছে', 'এক মুঠো অন্ন চাই' প্রভৃতি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হতো। অমরকৃষ্ণ, সুকুমার নাথ (প্রয়াত), কানু নাথ, নারায়ণ নাথ, জগদীশ দাস বোচা (প্রয়াত) যাত্রাগানের বিখ্যাত শিল্পী।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পরশুরামের কাজী মাসুক, কাজী কালাম, মোশাররফ হোসেন শাকের প্রমুখ নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। কাজী নূরুল আলম মাসুক 'বেছা মুন্সীর পলিটিক্স', 'তুই রাজাকার', 'হেকমত', 'রাজাকারের পোস্টমর্টেম' প্রভৃতি নাটক নিজে রচনা করেছেন এবং পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। শিক্ষা জীবনে ৫ম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক "বীর বেলাল"-এ মুখ্য চরিত্র 'বেলাল' চরিত্রের মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় জননন্দিত নেতা মরহুম ফকির মমতাজ-এর পরিচালনায় 'আকালের দেশ' নাটকে অভিনয় করেন। এর মাধ্যমে শুরু হয় নাটক অঙ্গনে পদচারণা। তিনি জানান ফেনীতে বর্তমানে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উপলক্ষে নাটক মঞ্চস্থ হয়।[১]

কোলাপাড়া গ্রামের লোকনাট্য শিল্পী শ্রী অমরকৃষ্ণ পাল

পরশুরামের প্রবীণ ও খ্যাতনামা লোকনাট্য শিল্পী শ্রী অমরকৃষ্ণ পাল। তাঁর বর্তমান বয়স ৮১ বছর। ১৪৪১ বঙ্গাব্দ ১০ আষাঢ় কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। দশ বছর বয়স থেকে গান গাওয়া শুরু করেন। স্মৃতিচারণ

www.pathagar.com

করে তিনি বলেন, 'হরিলুট, হরিসেবা থেকে গানের শুরু। মনশিক্ষা প্রার্থনা, গৌরগান সংকীর্তন গান, বিচ্ছেদ গান করেছি দশ বছর বয়স থেকে। যোগেশচন্দ্র নাথ, বিপীন চন্দ্র নাথ, ত্রিবিণী নাথ, রেবতী কুমার নাথ, সেনাপতি নাথ যাত্রা গাইতেন। লোকনাট্য, যাত্রাপালায় অভিনয় করেছি। জীতেন বসাক রচিত 'রক্তমুকুট', বিজয়কৃষ্ণ রচিত 'সতীর সাধনা', 'কাকনতলার মেয়ে', বিজয় অঘোর রচিত 'বিয়ে হলো বাসর হলো না', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সোনাই দীঘি' ইত্যাদি যাত্রাপালায় অভিনয় করেছি। গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। 'মানুষ' বইতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। 'মানুষ' বইতে দস্যু কোতোয়াল খাঁ, 'রক্তমুকুট'-এ কালুয়াসর্দার, পাহাড়িয়া রাজা, রূপবান যাত্রায় বাদশার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এই দেশকে মাতাইয়া ফেলেছি। জংলি রাজা ও ফকিরের ভূমিকায় অভিনয় করেছি।'

ফেনীর উত্তরকূলের সবাই এক কথায় অমরকৃষ্ণের কথা জানে। তাঁর যাত্রাদলের নাম মা মাতঙ্গী অপেরা পার্টি। মা মাতঙ্গী অপেরা পার্টির তিনি শিল্পী ও ম্যানেজার। বর্তমানে তিনি চোখে দেখেন না। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অর্জুন কুমার নাথ, কানু নাথ, সুধীর চন্দ্র নাথ, জয়কৃষ্ণ নাথ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে পরশুরাম হাই স্কুলের দপ্তরি। ছোটো ছেলে বাড়ির কাজ করে। অবসর সময়ে বার্নিশের কাজ করে। দুই মেয়ে পাটি বানানো কাজ জানে। বড়ো মেয়ে মিনতি কুমার নাথ পাটি বানায়।[২]

ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের একজন নামকরা মৃৎশিল্পী নির্মল পালের সঙ্গে যাত্রাপালা নিয়ে আলাপ হয়। তিনি বলেন, "উত্তর আঁধার মানিক গ্রামের বিশিষ্ট রাজেন্দ্র বাবু, হরি বাবু, হরিভূষণ মজুমদারের জমিদারি ছিল। এই গ্রামে একটি দপ্তরী বাড়ি ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রাগানের rehearsal হতো মাসা মাস। পাম্পলাইট জ্বালিয়ে আমরা যাত্রা করেছি। রাজা হরিশচন্দ্র, কৃষ্ণলীলা, সাবিত্রী সত্যবান, বেহুলা লখিন্দর, কোহিনূর যাত্রা করেছি। সাবিত্রী সত্যবান যাত্রায় ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। 'হরিশচন্দ্র' নাটকে বিশ্বমিত্রের অভিনয় করেছি। যাত্রা শুনে বিবেকবান লোকেরা কাঁদতো। বিভুরঞ্জন চক্রবর্তী হেডমাস্টার যাত্রাগানের পরিচালক ছিলেন। খেরকুটা বিছাই যাত্রাগান শুনতো লোকজন। মেয়েরা গান শুনতে আসতো। হিন্দু মুসলমান গলাগলি ছিল। 'মেঘনাধ বধ' যাত্রায় অভিনয় করেছি। মাটির কাজও করতাম, যাত্রাও অভিনয় করতাম।"[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নূরুল আলম মাসুক, পিতা : কাজী তাহের আহাম্মদ (মৃত), বয়স : ৫২ বৎসর, শিক্ষা : বিএ, বিএড, পেশা : প্রধান শিক্ষক (মডেল উচ্চ বিদ্যালয়), গ্রাম : উত্তর কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

২. অমরকৃষ্ণ পাল, বয়স : ৮১ বৎসর, পেশা : লোকনাট্য শিল্পী, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি পাস, গ্রাম : কোলাপাড়া, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

৩. নির্মল পাল, বয়স : ৮৫ বৎসর, পেশা : কুমার, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি পাস, গ্রাম : দক্ষিণ আঁধার মানিক, থানা : ছাগলনাইয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

একসময় সমাজে মানুষের অভাব-অনটন কম ছিল; চাহিদাও ছিল সীমিত। সমাজের মানুষ গ্রামীন খেলাধুলার মাধ্যমে অবসর বিনোদন করতো এবং মন ও শরীর সতেজ রাখতো। ঘরোয়া খেলাধুলা যেমন–কড়ি খেলা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, বাঘ চালা, গুটি চালা ইত্যাদির মাধ্যমে অবসর বিনোদন করতো। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে বাড়ির উঠোনে কানামাছি, লুকোচুরি খেলত।

দেশে বহু ঐতিহ্যবাহী খেলা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফেনীর পল্লিতে এখনও মাঠে ফসল কাটার পর ঘুড়ি উড়ানোর ধুম পড়ে যায়। আকাশে রংবেরঙের ঘুড়ি ওড়ে ও কাটাকাটি হয়। গ্রামীন খেলাধুলার মধ্যে গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, হাডুডু, সাঁতার প্রতিযোগিতা, ডাঙাগোলা এখনও প্রচলিত আছে। একসময় শীতকালে পাড়ার ছেলেরা খেলাধুলা করার জন্য চাঁদনী রাতে 'বদর বদর পির বদর' ধ্বনি দিতে দিতে খোলা মাঠে খেলোয়াড়দের জমায়েত করতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত খেলাধুলার মাধ্যমে পাড়াকে জাগিয়ে রাখতো। আগে ষাঁড়ের লড়াইয়ের কথা হাট-বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হতো। ষাঁড়ের লড়াই এখন তেমন দেখা যায় না। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে অনেক খেলাই লুপ্ত হয়ে গেছে।

১. পুতুল খেলা

বাড়িতে মাটি, কাঠ কিম্বা কাপড় দিয়ে মানুষের আদলে পুতুল বানানো হয়। হাটেবাজারে হরেকরকমের পুতুল তৈরি করা হয়। অবশ্য এখন প্লাস্টিকের পুতুলেরও খুব চল হয়েছে। ছেলে-মেয়ে, বর-কনে এমনি নানা ধরনের পুতুল কাপড় ও গয়না দিয়ে সাজানো হয়। রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন, মেয়ে পুতুলের সাথে ছেলে পুতুলের বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের অভিনয় করেই খেলা হয় পুতুল খেলা। পুতুল খেলার মধ্যে পুরো সংসারের একটা ছবি ফুটে ওঠে। পুতুলগুলো যেন ছোটো ছোটো মেয়েদের সন্তান। মায়ের মতো স্নেহ-আদর দিয়ে, খাওয়া থেকে শুরু করে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত সব কাজই করে খুকুমায়েরা। কেবল আদর সোহাগই নয়, প্রয়োজনে শাসনও করে ছোট্ট মেয়েরা তাদের পুতুল সন্তানকে। পুতুল খেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব হলো একজনের মেয়ে পুতুলের সঙ্গে আরেকজনের ছেলে পুতুলের বিয়ে দেয়া।

২. টোপাভাতি

পুতুল খেলার মতোই এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের আরেকটি প্রিয় খেলা হলো টোপাভাতি বা রান্না করার খেলা। টোপা অর্থ মাটির হাঁড়ি-বাসন আর ভাতি মানে ভাত রান্না করা। কঞ্চি বা লাঠি দিয়ে ঘরের খুঁটি, পাতার ছাউনি দিয়ে বানানো হয় খেলাঘর।

www.pathagar.com

ঘর লেপা, চুলা তৈরি, খুদ দিয়ে ভাত রান্না, ধুলোকে চিনি বা লবণ আর গাছের বড়ো পাতাকে ব্যবহার করা হয় বাসন হিসেবে। কেউ কেউ আশেপাশের ঝোপঝাড়ে যায় বাজার করতে। রকমারি কাল্পনিক কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। সেখানে থাকে মাছ-মাংস থেকে সব রকমের তরকারি। মেলা থেকে কেনা টিনের বটি দিয়ে চলে তরি-তরকারি কাটার কাজ। খেলনা চুলো না থাকলে তিনটে ইটের টুকরো বা ঢেলা দিয়ে বানানো হয় চুলা। সেই চুলায় ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। আগুনের ধোঁয়ায় চোখ হয়ে যায় লাল। সবটাই অভিনয়। কিন্তু দেখলে মনে হবে বাস্তব সংসারেই ঘটে চলছে এসব। মুখ দিয়ে শব্দ করে পাতার থালায় চলে খাওয়ার পর্ব। এ সময় এক অনাবিল আনন্দে ভরে থাকে বাচ্চাদের মুখ।

৩. এক্কাদোক্কা

এটি একটি জনপ্রিয় খেলা। ভাঙা মাটির হাঁড়ি বা কলসির টুকরা দিয়ে চাঁড়া বা ঘুটি বানিয়ে উঠানে কিম্বা খোলা জায়গায় আয়তাকার দাগ কেটে খেলা হয় এক্কাদোক্কা। ঘরের মধ্যে আড়াআড়ি দাগ টেনে তৈরি করা হয় আরো ছয়টি খোপ। বেশ সরল নিয়মের এই খেলাটি একা একাই খেলা যায়। আবার বন্ধুরা মিলে এক্কাদোক্কার প্রতিযোগিতাও করা যায়। এক এক করে প্রতিটি ঘরে চাঁড়া ছুঁড়ে এবং এক পায়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে ওই চাঁড়া পায়ের আঙ্গুলের টোকায় ঘরের বাইরে আনতে হয়। আঙ্গুলের টোকায় চাঁড়াটি কোনো দাগের উপর পড়লে কিম্বা দুই পাশের রেখা পার হয়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। তখন দান পায় দ্বিতীয় জন। এভাবে যে খেলোয়াড় সব ঘর পার হয়ে আসতে পারে সে-ই এক্কাদোক্কায় বিজয়ী হয়।

৪. ওপেনটি বায়োস্কোপ

এটি মেয়েদের একটি প্রিয় খেলা। এই খেলা নিয়ে ছড়াও আছে :

ওপেনটি বায়োস্কোপ
নাইন টেন টুইস্কোপ
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বিবির বৈঠকখানা
রাজবাড়িতে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
স্প্রিংয়ের চাবি আঁটা...।

এরকম ছড়া কাটা হয় খেলাটির সময়। এ খেলাতে দুটি মেয়ে মুখোমুখি অল্প দূরত্বে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত দুটো ধরে উঁচু করে রাখে যাতে মনে হয় একটা দরজা তৈরি হয়েছে। তাদের তৈরি দরজার মাঝ দিয়ে অন্যেরা লাইন ধরে চক্রাকারে ঘুরতে পারে। এসময় সবাই মিলে সুরে সুরে আবৃত্তি করতে থাকে ওপেনটি বায়োস্কোপের

www.pathagar.com

ছড়াটি। ছড়ার শেষ লাইনের শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মেয়ে দুটি তাদের হাত নামিয়ে সবচেয়ে কাছের মেয়েকে ধরে ফেললে সবাই মিলে তাকে ওপরে তুলে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। এভাবে শেষ হয় ওপেনটি বায়োস্কোপ।

৫. খেজুরের গোটা খেলা

খেজুরের বিচিকে দু'ভাগ করে মোট আটটি গুটি বানাতে হয়। দুজনে মিলে খেলাটি খেলতে হয় মাটিতে। চাল দেয়ার সময় গুটি উপুড় হয়ে পড়লে ওই খেলোয়াড় এক পয়েন্ট পায়। আর যদি চিত হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সকলে সেগুলো দ্রুত তুলে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করে। সফল হলে প্রতিটি গুটির জন্য এক পয়েন্ট পায়। এভাবে খেলতে খেলতে সর্বপ্রথম যার বিশ পয়েন্ট হয় সেই জয়ী হয়। অনেকে এই খেলার দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে 'জোড় না বিজোড়' নামে আরেকটি খেলা খেলে থাকে।

৬. গুটি খেলা

ছেলেমেয়েদের আরেকটি প্রিয় খেলার নাম গুটি খেলা। ষোলগুটি বা ছত্রিশগুটি নামে ছক কেটে ছেলেরা যে খেলা করে এটি ঠিক সেরকম খেলা নয়। সাধারণত দশ-বারো বছরের মেয়েরা এই খেলাটি খেলে। ইট বা পাথরের পাঁচটি গোল টুকরা নিয়ে খেলতে হয় এটি। শুরুতে গুটিগুলোকে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর মাটিতে ছড়ানো গুটিগুলো থেকে একটি হাতে নিয়ে তা উপরে ছুঁড়ে দেয়। ছুঁড়ে দেয়া গুটিটি মাটিতে পড়ার আগেই ওই গুটিসহ মাটিতে ছড়ানো এক বা একাধিক গুটি হাতে তুলতে হয়। খেলাটির প্রথম পর্বে একটি করে ছড়ানো গুটি তোলা হয়। এরপর দুটি করে। এভাবে গুটি খেলা এক থেকে শুরু হয়ে পঞ্চমে গিয়ে শেষ হয়। মনোযোগ ও হাতের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে এ খেলার জয় পরাজয়। অল্প পরিসরে এক জায়গায় বসেই খেলা যায় বলে বর্ষা-বাদলের দিনে গুটি খেলা মেয়েদের অবসরযাপন ও বিনোদনের সুযোগ এনে দেয়।

৭. হাডুডু বা কাবাডি

সারা দেশের মতো পরশুরাম-ফুলগাজী অঞ্চলেও এই খেলাটি জনপ্রিয়। প্রত্যেক দলে ৮ থেকে ১০ জন করে মোট দুটি দল খেলায় প্রতিযোগিতা করে। আয়তাকার কোর্টের মাপ হয় দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১২ মিটার এবং প্রস্থ ১০ মিটার। হাডুডু খেলায় ছুঁয়ে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর দমও থাকতে হয়। প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় একজনের পর আরেকজন একদমে 'ডু-ডু-ডু' বা 'কাবাডি কাবাডি' বলতে বলতে বিপক্ষ দলের সীমানায় ঢুকে যদি প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে বের হয়ে আসতে পারে তবে সেই দল যেমন পয়েন্ট পায়, তেমনি অপর দলের ছোঁয়া খেলোয়াড়টি খেলা থেকে বাদ পড়ে। অন্যদিকে বিপক্ষ দলকে ছোঁয়ার জন্যে ঢুকে সে যদি ধরা পড়ে ধস্তাধস্তি করেও নিজের সীমানায় ফিরতে না পারে তবে সে মারা পড়ে এবং খেলা থেকে বাদ পড়ে। আর এভাবেই একপক্ষ আরেকপক্ষের কতজনকে ছুঁয়ে বা ধরে ফেলে বাদ দিতে পারে তার উপরেই নির্ভর করে খেলার জয়-পরাজয়।

www.pathagar.com

৮. ঘুড়ি উড়ানো বা ঘুন্ডি উড়ানো

ঘুড়ি উড়ানো খেলাকে এ অঞ্চলে বলে ঘুন্ডি উড়ানো খেলা। আমোদ-প্রমোদের খেলা হিসেবে এটি এই অঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি খেলা। শীতের মৌসুমে ধান কাটা হয়ে গেলে খালি মাঠে ঘুড়ি উড়ানোর ধুম পড়ে যায়। লাল-নীল, সাদা-কালো, সবুজ-হলুদ, বেগুনি কাগজের ঘুড়িতে তখন ছেয়ে যায় আকাশ। বিস্তৃত আকাশের পটে সে দৃশ্য যে কত সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো সকলেই আনন্দের সাথে আকাশে তাকিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করে। কখনো রং মাখানো মাঞ্জা সুতো, কখনো বিনা রঙের সুতা দিয়ে ঘুড়ি উড়ানো হয়। ডিমের কুসুম, সাবু সিদ্ধ, ভাতের ফ্যান, অ্যারারুট (কাপড়ে মাড় দিতে ব্যবহৃত হয়), গাবসিদ্ধ, তেঁতুল-বিচি সিদ্ধ, বালি ইত্যাদির সঙ্গে কাঁচের মিহি গুড়ো মিশিয়ে দেয়া হয় সরু, চিকন ও মোটা সুতায়। একজনের ঘুড়ির সুতো দিয়ে অন্যের ঘুড়ির সুতোয় প্যাঁচ লাগিয়ে কেটে দেয়া এই ঘুন্ডি খেলার একটি আকর্ষণীয় বিষয়। আর এই উদ্দেশ্যেই ঘুড়ির মালিকরা কাঁচ মিহি গুড়ো করে আঠায় মিশিয়ে সুতোয় লাগায়। যার সুতার ধার বেশি সে সারাক্ষণ অন্যের ঘুড়ির সাথে প্যাঁচ খেলে ঘুড়ির সুতা কেটে দেয়। এই সুতা-কাটা ঘুড়িগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে চার-পাঁচ মাইল দূরেও চলে যায়। আর সেই সুতা-কাটা ঘুড়ি ধরার জন্য বাচ্চা ছেলে থেকে বুড়োরা অন্দি মাইলের পর মাইল দৌড়ায়। এ ধরনের ঘুড়ি যে ধরতে পারে সেটা তারই হয়। সব সুতো কাটা ঘুড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। কোনো ঘুড়ি বিলের পানিতে পড়ে নষ্ট হয়ে, কোনোটি গাছ বা খুঁটির আগায় বেঁধে ছিঁড়ে যায়। কিন্তু এমন ঘুড়ি উদ্ধারের জন্য শিশু-কিশোরদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। ঘুড়ি বা ঘুন্ডির আকৃতি ও বানানোর কৌশল একটি আরেকটির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনোটিতে লেজ থাকে, কোনোটি লেজ ছাড়া। পরশুরাম-ফুলগাজী অঞ্চলে সচরাচর যে সব ঘুড়ি দেখা যায় সেগুলো হলো–চং ঘুড়ি, পতিনা ঘুড়ি, নেংটা ঘুড়ি, ভোঁরা বা ভোঁমরা ঘুড়ি ইত্যাদি।

৯. ডান্ডা খেলা

ক্রিকেটের ব্যাট ও বলের মতো ডান্ডা খেলায় আছে ডান্ডা ও গুলি। এখানেও ক্যাচ ধরা বা ডান্ডায় আঘাত করে আউট করার নিয়ম আছে। দুই থেকে পাঁচ-ছয়জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলতে পারে। খেলার উপকরণ প্রায় দেড় হাত লম্বা একটি লাঠি, একে বলে ডান্ডা। আরও লাগে তিন-চার ইঞ্চি সমান একটি শক্ত কাঠি যা 'গুলি' নামে পরিচিত। খোলা মাঠে একটি ছোট্ট গর্ত করা হয় শুরুতেই। প্রথম দান পায় যে দল তাদের একজন গর্তের উপর ছোটো কাঠিটি রেখে বড়ো লাঠির আগা দিয়ে সেটিকে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে মারে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা চারদিকে দাঁড়িয়ে সেটিকে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করে। ধরতে পারলেই খেলোয়াড় আউট। অন্যথায়, খেলোয়াড় বড়ো লাঠিটিকে আড়াআড়ি ভাবে রাখে। অপরপক্ষ ছোটো কাঠিটি যে জায়গায় পড়েছে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারে গর্তের দিকে। কাঠিটি যদি বড়ো লাঠিটিকে আঘাত করে তবে প্রথম খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। তা না হলে প্রথম খেলোয়াড় পড়ে থাকা কাঠির কাছে গিয়ে বড়ো লাঠি দিয়ে বিশেষ কায়দায় আঘাত করে সেটিকে শূন্যে তোলে।

www.pathagar.com

শূন্যে থাকা অবস্থায় বড়ো লাঠি দিয়ে আঘাত করে দূরে পাঠিয়ে দেয়। আগের মতোই অন্যেরা সেটা ক্যাচ ধরে আউট করার চেষ্টা করে ওই ক্রিকেটের নিয়মে। কেউ আউট না হলে প্রথম খেলোয়াড় বড়ো লাঠিটি গর্তের উপর রাখে আড়াআড়ি ভাবে। দূর থেকে অপরপক্ষ কাঠিটি ছুঁড়ে যদি বড়ো লাঠিটিকে আঘাত করতে পারে, তাহলেও মূল খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় ছোটো কাঠিটি যেখানে পড়লো সেখান থেকে গর্তের দূরত্ব মাপা হয় লম্বা লাঠিটি দিয়ে- এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত- এভাবে কয়-লাঠি গোনা হলো এবং প্রতিপক্ষের খেলার সময় ও দুজনের গোনাগুনির পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে খেলার জয় পরাজয়।

১০. গোল্লাছুট

এটি কিশোর-কিশোরীদের প্রিয় খেলা। দুটো দল থাকে এ খেলায়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুসারে দল ছোটো বা বড়ো হয়। নদীর ধারে, মাঠে বা খোলা জায়গায় এই খেলা জমে ভালো। কারণ ছোটাছুটি করে খেলার জন্য বেশ অনেকখানি খোলা জায়গার প্রয়োজন হয়। খেলায় দলগঠন করার নিয়মটি বেশ মজার। দুজন দলপতি নির্ধারিত হয়। অন্যেরা জোড়ায় জোড়ায় আড়ালে গিয়ে নিজেদের নাম বানিয়ে নেতা দুজনের কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে : কে নেবে 'চাঁদ' আর কে নেবে 'সূর্য'? দলপতি দুজনের ডাক অনুযায়ী খেলোয়াড় দুজন তখন পৃথক দলে ভিড়ে যায়। আর এভাবেই গঠিত হয় পুরো দলটি।

একটি ছোটো গর্ত হয় খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা। ৫০/৬০ হাত দূরের ইট বা পাথর কিম্বা কোনো গাছকে বাইরের সীমানা হিসেবে ধরা হয়। গর্তে একটি লাঠি পুঁতে তাকে বলে গোল্লা। গোল্লা থেকে ছুটে বাইরে সীমানার গাছ বা পাথরকে ছোঁয়াই এ খেলার মূল লক্ষ্য। একারণেই খেলার নাম হয়েছে গোল্লাছুট। এই খেলায় যে প্রধান তাকে বলে সর্দার। সে গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। অন্যেরা তার ও নিজেদের হাত পরস্পর ধরে ঘুরতে থাকে। অন্যদিকে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সুবিধামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে ওত পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেউ হাত ছুটে বের হয়ে গেলে সে দৌড়ে গাছ ছোঁয়ার চেষ্টা করে। সেটি ছোঁয়ার আগেই প্রতিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে দিলে সে 'মারা' পরে, অর্থাৎ খেলার ওই দান থেকে বাদ পড়ে। এভাবে দলপতি বা সর্দারকেও দৌড়াতে হয়। যে কয়জন সফলভাবে বাইরের সীমানাকে ছুঁতে পারে তারা গর্ত থেকে জোড় পায়ে সীমানার দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। সব লাফ মিলিয়ে সীমানা ছুঁতে পারলে হয় এক 'পাটি'। না পারলে অথবা সবাই স্পর্শ দোষে মারা পড়লে প্রতিপক্ষ দল দান পায়। পাটির সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় জয়-পরাজয়।

১১. চাঁড়া মারা

চাঁড়া মারা মানে পানিতে চাঁড়া মেরে খেলা। মাটির কলসি বা হাঁড়ির ভাঙা টুকরো দিয়ে খেলাটি হয়। পরশুরাম-ফুলগাজী এলাকায় এ খেলা ছেলেরাই খেলে। পানিতে না নেমেই খেলা যায় এই খেলাটি। এটি খেলতে দরকার শান-পুকুর বা মরা নদী বা খাল-বিল। পাতলা চ্যাপ্টা মাটির টুকরো, ভাঙা হাঁড়ির চাঁড়া বা খোলামকুচি ডাঙা থেকে

www.pathagar.com

হাতের কৌশলে পানির ওপর ছুঁড়ে মারা হয়। চাঁড়াটি ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে গিয়ে ডুবে যায়। কয়েকজন মিলে প্রতিযোগিতা না করে খেললে খেলাটি জমে না। পানির ওপর দিয়ে চাঁড়াটি ছুটে যাবার সময় কতোবার লাফ দিল এবং কতো দূরে গেল, তার ওপরই নির্ধারিত হয় হারজিত।

১২. কানামাছি

এ খেলায় কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেয়া হয়, সে অন্য খেলোয়াড়দের ধরতে চেষ্টা করে। যার চোখ বাঁধা হয় সে হয় 'কানা'। অন্যরা 'মাছি'র মতো তার চারদিকে ঘিরে কানামাছি ছড়া বলতে বলতে তার গায়ে টোকা দেয়। চোখা বাঁধা অবস্থায় সে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। সে যদি কাউকে ধরতে পারে এবং বলতে পারে তার নাম তবে ধৃত ব্যক্তিকে 'কানা' সাজতে হয়।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

পাড়া বা অঞ্চল ভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয় ঘটে। আগে পল্লির মানুষের পরিচয় ছিল কামার, কুমার, ছুতার, জেলে, জুগী, হেকিম, বৈদ্য, কবিরাজ ইত্যাদি। এখন পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পল্লির মানুষ তাদের সনাতন পারিবারিক পেশা ছেড়ে শহরের শিল্প এলাকার বড়ো বড়ো কলকারখানায় চলে যাচ্ছে।

১. জেলে

ফেনী জেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের মাথিয়ারা গ্রামে বর্তমানে জেলে সম্প্রদায়ের ৩৪টি পরিবার বসবাস করছে। পরিবারসমূহের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ২৭৫ জন। তাদের পূর্বপুরুষরা এই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এদের গোত্র জলদাস এবং এরা জেলে সম্প্রদায়ের লোক। তারা পূর্বপুরুষদের ব্যবসা জাল বাওয়া ও মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত।

বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও নদীনালা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে এদের অর্থনৈতিক দূরবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। পুকুরে মাছের অভাব। একজন জেলে দুঃখ করে বলেন, "পুকুরে জাল নামালে পোকা ছাড়া কিছু আসে না। এখানকার জেলেরা প্রতিদিন সকালে জাল বাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফেরিওয়ালার মতো চিৎকার করে বলতে থাকে 'চাচা, পুকুরে জাল দিবেন নি'। পুকুরের মালিককে জাল বাওয়ার জন্য জেলেদেরকে টাকা দিতে হয়। টাকা দিলে জেলেদেরকে মাছ দেওয়া হয় না। একটি বড়ো পুকুরে এক টান দিলে ২০০/- টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

বর্ষাকালে জেলেদের ব্যবসা একটু বেশি হয়। এখানকার জেলেরা জীবিকা অর্জনের জন্য যশোর, বগুড়া, বরিশাল অঞ্চলে জাল বাওয়ার জন্য যান। কোনো বাড়িতে তারা আশ্রয় নেন। কাছারি ঘরে থাকেন। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চা নাস্তা খেয়ে জাল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দুই মাস/তিন মাস ভাসাইন্যা বদইল্যার মতো ঐসব এলাকায় জাল বাওয়া ও মাছ ধরার কাজ করেন। শ্রী হরি জলদাস বলেন, "আমাদের মহিলারা রাজা বাদশা। আমরা কামাই রুজি করি।"**লর প্রকার**

মাছ ধরার জন্য জেলেরা বিভিন্ন রকমের জাল ব্যবহার করেন। বেড় জাল, বিন্দি জাল, ঠেলা জাল, মই জাল, টুন জাল, দুইতা জাল, বইছা জাল ইত্যাদি। পানিতে মাছ কম থাকাতে এবং নদী, নালা, পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এসব জাল ব্যবহার হয় না। বর্তমানে তারা নাইলন ও কারেন্টের জাল ব্যবহার করেন। জালের মূল্য ২০,০০০/- টাকা থেকে ৩০,০০০/- টাকা। বিভিন্ন এনজিও ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে জেলেরা জাল কিনেছেন বলে জানা যায়। প্রতি হাজার টাকার সুদ সপ্তাহে ২৫/- টাকা।

www.pathagar.com

এখানে বসবাসরত জেলেদের জীবনে অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী। জেলেরা জাল বাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করে না। তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করে না। চার বছর ধরে তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বাড়ির নিকটে ব্র্যাকের সহযোগিতায় একটি প্রাইমারি স্কুল খোলা হয়েছে। জেলেপাড়ায় স্থাপিত ব্র্যাক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে লেখাপড়া শিখানো হয়।

তারা নিজেদের গোত্রের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিতে আগ্রহী। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদি হচ্ছে। বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

পুকুরে বা নদীতে জাল নামানোর পূর্বে জেলেরা 'মা গঙ্গা' কে স্মরণ করে। তাছাড়া হিন্দুধর্মের সকল দেবতাকে তারা মানেন।[১]

মাথিয়ারা গ্রামের শ্রী হরি জলদাস

সোনাগাজীর চরখোন্দকার জেলেপাড়া

১৯.১১.২০১৩ ও ২২.১১.২০১৩ তারিখ জেলেদের জীবনযাপন পদ্ধতি দেখার জন্য বর্তমান গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং গবেষক কাজী মোস্তফা কামাল সোনাগাজীর চরখোন্দকার জেলেপাড়ায় যান।

www.pathagar.com

চরখোন্দকার জেলেপাড়ায় আনুমানিক ১০০টি জেলে পরিবার বসবাস করেন। ফেনী নদীর মোহনায় নদীর তীরে ওয়াপদার জমিতে এরা ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করছেন। তাদের ঘরবাড়ি কাঁচা এবং জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। টিনের চৌচালা ঘরও দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাদাগাদি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এরা বাস করেন। একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫ থেকে ৭ জন। আনুমানিক ১০০ বছর আগে চর দরবেশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। প্রধান পেশা মাছ ধরা। এরা সবাই জলদাস।

সোনাগাজীর চরখোন্দকার গ্রামের জেলেদের কোনো জমি নেই। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। বিভিন্ন এনজিও ও সমিতি থেকে ঋণ নেন জেলেরা। প্রতি সপ্তাহে ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সুদের হার বেশি বলে তারা জানান। এক বছরের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া জলদস্যুদের কর দিতে হয়। অনেক সময় জলদস্যুরা জেলেদের ধরে নিয়ে যায় এবং মারধর করে। অনেকে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে চায়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া শিখাতে পারে না। জলদাস মেয়েদের জলদাস পরিবারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্য গোত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজও রয়েছে।

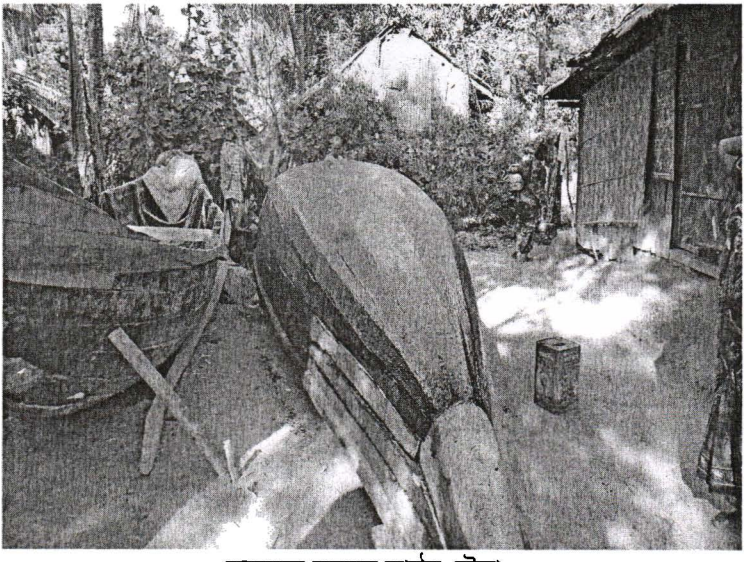

জেলেদের ব্যবহৃত কাঠের নৌকা

নৌকা ও জাল তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। সারা বছর জেলেরা মাছ ধরেন বড়ো ফেনী নদীতে। নদীর তীর থেকে প্রায় দশ/বারো কিলোমিটার দক্ষিণে নৌকা ও জাল নিয়ে চলে যান জেলেরা মাছ ধরার জন্য। প্রতিদিন যাওয়া আসা করেন। গুইল্যা, চিংড়ি, রিস্যা, বাটা, পোয়া, কোরাল ইত্যাদি মাছ ধরেন। বর্ষাকালে ইলিশ মাছও ধরেন। শহর থেকে মাছ ব্যবসায়ীরা এসে সব মাছ নিয়ে যায়। অনেকে শহরের

www.pathagar.com

বাজারে গিয়েও বিক্রি করে। সোনাগাজী বাজারে প্রতি কেজি গুইল্যা, বাটা মাছ ৬০০/- টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ছোটো ছোটো পাংগাস মাছের কেজি ৩০০/- টাকা।

নদীতে ভাসমান জেলেদের মাছ ধরার নৌকা

কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত জেলেরা তাজা মাছ সরবরাহ করে মানুষের প্রোটিনের চাহিদা মিটাচ্ছেন। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন অপরিহার্য।[২]

২. কামার

পদ্মরাজ কর্মকার

স্কুল জীবন থেকেই তিনি এই কাজ করে আসছেন। তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ছোটোবেলায় লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তার বাবার সঙ্গে ফেনীর আমতলী গ্রামে কামারের কাজ করতেন। তিনি দা, বটি, ছুরি, খন্তা, কুড়াল, কাচি, কোদাল, সুপারি কাটার জাতা (আঞ্চলিক ভাষায় স্রোতা), হাড্ডি কাটার ধামা, নিড়ানি প্রভৃতি তৈরি করেন।

তিনি যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

ক. ভাতি : বাতাস দেওয়া জন্য ব্যবহৃত হয়।

খ. নি : লোহার তৈরি। এটির উপর লোহা রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে লোহাকে সাইজ করা হয়।

গ. হাতুড়ি : এটি দিয়ে লোহা পিটিয়ে লম্বা, বড়ো বা চিকন করা হয়।

ঘ. হাম্বল : বড়ো হাতুড়ি। দুই হাতে ধরে লোহা পিটানো হয়।

www.pathagar.com

ঙ. সাঁড়াশি : সাঁড়াশি দিয়ে লোহাকে ধরে নি-র উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সাইজ করা হয়।

চ. হাইটগা : কাঠের তৈরি 'হাইটগার' উপর দা, বটি রেখে রেত দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়।

নির্মাণ প্রক্রিয়া :

১. কর্মকার প্রথমে এক টুকরা লোহাকে ভাতির সাহায্যে বাতাস করে কাঠকয়লা বা পাথুরি কয়লার আগুনে পুড়িয়ে লাল করেন।

২. এরপর পোড়ানো লোহা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নি-র উপর রাখেন এবং হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দা, বটি, ছুরি, কোদাল, খন্তা, কুড়াল ইত্যাদি যা বানাবেন তার আকার বানিয়ে নেন।

৩. এরপর হাইটগার ওপর দা, বটি রেখে রেত দিয়ে ঘষে মসৃণ বা ধার করেন। ধার হওয়ার পর আগুনে পুড়িয়ে temper দেওয়া হয় লবণ পানিতে চুবিয়ে।

সাধারণ দা বানানোর জন্য লোহাসহ মজুরি নেয়া হয় ১৫০/- টাকা। কুড়াল ১০০/- টাকা থেকে ২৫০/- টাকা। লোহার ওজনের উপর মূল্য নির্ভরশীল। কোদাল ৫০/- টাকা থেকে ৫৫/- টাকা। কাচি ৮/- টাকা থেকে ১০/- টাকা, ছুরি ৫০/- টাকা থেকে ১২০/- টাকা।

ধান ও পাট কাটার মৌসুমে এবং কোরবানি ঈদের সময় কাজ বেশি চলে। এই সময় তিনি একজন সহকারী রাখেন। তাকে দৈনিক ১০০/- টাকা থেকে ১৫০/- টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হয়। তাছাড়া সহকারীকে নাস্তাসহ দুইবেলা খাবার দেয়া হয়। সকাল আটটা-নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত কারখানার কাজ চলে। কাজ শুরুর পূর্বে তিনি গুরুর নাম স্মরণ করেন। পঞ্জিকা তিথি অনুযায়ী বছরে একবার বিশ্বকর্মার পূজা সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, হাতের কাজ যারা করে তাদেরকে অবশ্যই এই পূজা করতে হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কর্মকারদের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগে কৃষিকাজের জন্য লাঙল ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। কাচি দিয়ে ধান কাটার পরিবর্তে মেশিনে ধান কাটা ও মাড়াই হচ্ছে। লাঙলের ফলার ব্যবহার দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কর্মকারদেরকে অনেকে স্থায়ীভাবে ঘর ভাড়া দিতে চায় না। অস্থায়ীভাবে কারখানা বানিয়ে কর্মকাররা কাজ করে। মাসিক আয় নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কোনোদিন ১০০/- টাকা, কোনোদিন ২০০/- টাকা আবার কোনোদিন ৫০০/- টাকাও আয় হয়। এটি অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। কারখানায় আগুনের তাপে কাজ করতে হয় বলে হার্টের সমস্যাসহ নানা ধরনের অসুখ হয় কর্মকারদের।

পদ্মরাজ কর্মকার-এর গ্রামের বাড়ি আমতলীতে। তিনি জানান, পাকিস্তান আমলে এই গ্রামে বিপুল সংখ্যক ঘর কর্মকার ছিল। বর্তমানে দশ/বার পরিবার কর্মকার আছে।

www.pathagar.com

তাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম। তাঁর দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়েরা বিবাহিত। বড়ো ছেলে স্বর্ণকারের কাজ শিখছে। ছোটো ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাঁর দুই ভাই বর্তমানে এই পেশায় নিয়োজিত। আগের দিনে একটি দা বানাতে পাঁচসিকা মজুরি নিতেন।

ফেনীর আমতলীতে কর্মকারের কামারশালা

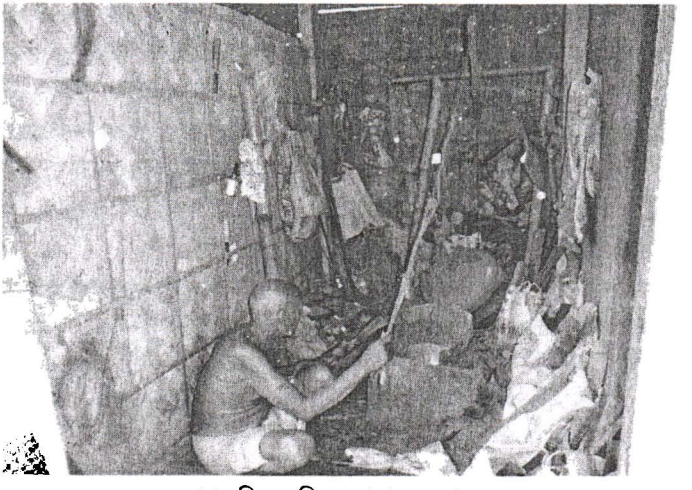

হাপর দিয়ে চুল্লিতে বাতাস দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

বর্তমানে মজুরি নেন ১৫০/- টাকা। তখন একগাড়ি কয়লার দাম ছিল পাঁচ টাকা। এখন এক বস্তা কয়লার দাম ৫০০/- টাকা। আগে লোহার সের ছিল চার আনা/ছয় আনা। বর্তমানে এক কেজি লোহার দাম ৫০/- টাকা। শহরে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না। এতসব সমস্যা সত্ত্বেও কর্মকারদের কাজ এখনও চলছে। দা, বটি, ছুরি, খন্তা, কোদাল ইত্যাদির ব্যবহার কৃষিসমাজে এখনও রয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কর্মকারের ছেলেরা বর্তমানে এই পেশা ছেড়ে অন্য লাভজনক পেশায় চলে যাচ্ছেন। কেউ লেখাপড়া শিখছে, কেউ স্বর্ণকারের পেশা গ্রহণ করছে। তাদের পরিবর্তনশীল সমাজে এখনো কর্মকাররা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

হাইটগার উপর রেখে লোহাকে রেত দিয়ে ঘষা হচ্ছে

৩. ধোপা

পুষ্পরাণী ধোপা

পুষ্পরাণী দাস ধোপার কাজ করেন। তিনি সনাতন ধর্মের অনুসারী। তিনি তার শ্বশুরের নিকট থেকে কাপড় ধোয়ার কাজ শিখেছেন। ৪০ বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত। কাপড় ধোয়া ছাড়াও তিনি একটি গরু লালন পালন করেন।

কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

ক) ব্লিচিং পাউডার
খ) নীল
গ) সোডা, টিনাফল, হুইল পাউডার, সাবান ইত্যাদি

www.pathagar.com

পদ্ধতি

খাইসোডা, সাবান, হুইল পাউডার নদী বা পুকুরের পানিতে মিশ্রিত করে শাড়ি, পাঞ্জাবি, ধুতি, পাজামা, বিছানার চাদর প্রভৃতি ১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। নদী বা পুকুরের পানিতে ধৌত করে রোদে শুকানো হয়। পানিতে কাপড় ধোয়ার জন্য তিনি টিনাফল বা হুইল পাউডার ব্যবহার করেন। কাপড় শুকানোর পর ইস্ত্রি করেন। লোহার তৈরি কয়লার আগুনে গরম করে ইস্ত্রি করা হয়। পুষ্পরাণী নিজে কাপড় ধোয়ার জন্য এবং ইস্ত্রি করার জন্য যেমন—পাঞ্জাবি ধোয়ার জন্য ১০/- টাকা, শাড়ির জন্য ৪০/- টাকা, পাজামা ধোয়া ও ইস্ত্রির জন্য ৫/- টাকা পারিশ্রমিক নেন। শুধু ইস্ত্রির জন্য তিনি শাড়ি ১০/- টাকা, পাঞ্জাবি ৫/- টাকা ও পাজামা ৩/- টাকা নেন।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ছানুয়া গ্রামে পুষ্পরাণী হচ্ছেন বর্তমানে জীবিত একমাত্র ধোপা যিনি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ধোপার পেশায় নিয়োজিত। ঐতিহ্যসচেতন পুষ্পরাণী দাস গর্ব করে বলেন, "জাতীয় ব্যবসা বলে রেখে দিয়েছি। একেবারে ছেড়ে দেয়া যায় না। যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এই কাজ করব।" তাঁর ছেলে কুয়েতে থাকে। দুইজন দেবর বিদেশে থাকে। ছেলে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু পুষ্পরাণী পুনরায় বলেন, "এটি মুরসী (মুরব্বীদের) ব্যবসা। এই ব্যবসা কি আমরা ছাড়তে পারি? আমার ছেলে পয়সাওয়ালা হলেও আমি এই কাজ করব। বাপের দিনা (বাপের দিনের) এই ব্যবসা করে যাব।"

তিনি তাঁর শ্বশুর প্রকাশ চন্দ্র দাসের নিকট থেকে ধোপার কাজ শিখেছেন। পুরনো দিনের অনেক ধোপা তাঁদের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছেন। ধোপা সম্প্রদায়ের অনেকেই নানা কারণে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। বর্তমানে পুরনো পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া কম হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে গ্রামেগঞ্জে লন্ড্রি স্থাপন করেছেন। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির সাহায্যে বর্তমানে কাপড় ইস্ত্রি করা হয়। অনেকে নিজেরাই বাসায় কাপড় ধোয়ার কাজ সেরে নেন এবং দোকানে কাপড় ইস্ত্রি করেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা পরিবর্তনের ফলে এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে।[৩]

৪. পাটি শিল্পী

পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় শীতল পাটি

গরমে ঘুমানোর জন্য স্বস্তিদায়ক বলে গ্রামবাংলায় শীতলপাটির কদর যুগ যুগ ধরে। পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় এখনো অনেক পরিবার, বিশেষ করে অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থরা অতিথির আরামের জন্য শীতলপাটি বিছিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হন। বিদ্যুতের বিপর্যয় বা লোডশেডিং-এর অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে শুয়ে-বসে একটু শান্তি পাবার আশায় গৃহস্থরা বাড়িতে শীতলপাটি রাখেন। গায়েহলুদ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আভিজাত্য ও মর্যাদা বাড়ায় এই লোকজ ঐতিহ্য। তবে বিভিন্ন কারণে শীতলপাটির ব্যবহার এখন

www.pathagar.com

আর আগের মত নেই। এরপরও কিছু মানুষ নাড়ির টানের মতো ধরে রেখেছেন এই পাটি বোনার পেশাকে। পরশুরামের অনন্তপুর গ্রামে গেলে দেখা মিলবে তাদের। এই গ্রামের দেড় শতাধিক পরিবারের জীবিকা শীতলপাটি বোনা।

একসময় পরশুরামের গ্রামে গ্রামে শীতলপাটি বোনা হতো। এখন অনন্তপুর গ্রাম ছাড়া উপজেলার অন্য কোনো গ্রামে শীতলপাটি বোনার কাজ তেমন নেই। পাশের কোলাপাড়া গ্রামের কিছু অংশে প্রায় ৫০টি পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত। শীতলপাটি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পাটি বোনা হয় অনন্তপুরে। সাধারণত পরিবারের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শীতলপাটি বোনেন। কম বয়সী সদস্যরা অন্য পাটি বোনে। একটি বড়ো সাধারণ পাটি ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হয়। একই মাপের একটি শীতলপাটি বিক্রি হয় ৮০০ থেকে এক হাজার টাকায়। এ ছাড়া মাঝারি ও ছোটো আকারের শীতলপাটিও আছে। এগুলো আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়।

অনন্তপুরের পাটির কারিগর জ্যোতিরানী নাথ (৬০) বলেন, আগে পাটি বোনানোর পর বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হতো, এখন লোকজন এসে বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যায়। পরশুরাম পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শেখ আহাম্মদ বলেন, অনন্তপুর গ্রামের প্রায় সব পরিবারেই পাটি বোনার কাজ হয়। নিজেদের বোনা পাটি বিক্রি করেই তারা জীবিকা চালায়। পূর্বপুরুষের পেশা ও পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখতেই তারা অন্য পেশার দিকে যাচ্ছে না। বর্তমানে বাইরে থেকে কয়েকটি পরিবার এসে ওই গ্রামে জমি কিনে বাড়ি করেছে। তারাই কেবল এই পেশার সঙ্গে জড়িত নয়।

গত ১৩ জুন, ২০১২ তারিখে অনন্তপুরে গিয়ে দেখা যায়, পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন বাড়িতে পাটি বোনার কাজ চলছে। একটি বাড়িতে গিয়ে দুই সহোদর সরেসচন্দ্র নাথ ও বাবুলচন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা হয়। উঠানে বসে শীতলপাটি বুনছিলেন তারা। এতে সহযোগিতা করছেন তাদের স্ত্রীরা। তারা বলেন, পূর্বপুরুষের এই পেশার প্রতি তাদের এক ধরনের মায়া জন্মেছে। তাই প্রতিকূলতার মধ্যেও অন্য পেশায় যেতে পারছেন না। গ্রামের রমেশ স্বপন নাথ বলেন, তিনি ও তার স্ত্রী মিলে পাটি বুনে সংসার চালান। তিনি বলেন, মোর্তাক গাছের পর্যাপ্ত উৎপাদন না থাকায় এই পেশা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এরপরও গ্রামের মানুষ সামাজিকভাবে এই পেশাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

গ্রামের সুকেনচন্দ্র নাথ ১৪ বছর আগে বিয়ে করেন চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার পূর্ব মায়ানি গ্রামের বকুল রানী নাথকে। বকুল পাটি বুনতে জানেন বলেই এ বিয়ে হয়েছে বলে জানান সুকেন। পরশুরাম বাজারের পাটি ব্যবসায়ী তপন ও মানিকচন্দ্র নাথ বলেন, অনন্তপুর থেকে শীতলপাটিসহ অন্যান্য পাটি কিনে এনে তারা বিক্রি করেন। তবে চাহিদার তুলনায় শীতলপাটির সরবরাহ কম। প্রতিটি পাটি বিক্রি করে তাদের ১০০ থেকে ১৫০ টাকা লাভ হয়। দোকানে পাটি কিনতে আসা একজন ক্রেতা ৬৫০ টাকা দিয়ে মাঝারি আকারের শীতলপাটি কেনেন। তিনি বলেন, গরমের সময় তোশকের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে শুলে আরামে ঘুমানো যায়। পরশুরাম উপজেলা চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন মজুমদার বলেন, অনন্তপুর গ্রামের লোকেরা তাদের

www.pathagar.com

বাপ-দাদার আমল থেকে পাটি বানানোর পেশায় জড়িত। প্রতিকূলতার মধ্যেও পূর্বপুরুষের পেশা এভাবে ধরে রাখার ঘটনা বিরল।

পাটি শিল্পী সাবিত্রী দেব নাথের (৩৫) সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি বলেন, "আমার মার কাছ থেকে শিখেছি। মায়ের নাম মিন্টু বালা নাথ। আমার মা পাটি বানাইয়া গ্রামীণ ব্যাংকের কিস্তি শোধ করেছেন। আমার বাবা ছোট্ট বেলায় মারা যান। আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। আমার বড়ো ভাই ডাক্তার। কুমিল্লা ময়নামতি সাবের বাজারে আমার বাপের বাড়ি। সেখানেও পাটি বানায়। আমার মায়ের বয়স বর্তমানে ৭০ বছর। তিনি এখনও পাটি বানান। মায়ের মতো বানাতে পারি না। ৫′×৭′ মাপের পাটি বানাতে ১৫ দিন লাগে। একটি বেতের পাটির মূল্য ২৫০ টাকা।"

কোলাপাড়া গ্রামের পাটিশিল্পী সাবিত্রী দেবনাথ

ফেনী পরশুরাম অঞ্চলে শিক্ষিতের হার আগে কম ছিল। বর্তমানে শিক্ষিতের হার বেশি। কোনো কোনো নাথ পরিবারের নিজস্ব ঘরবাড়ি ও জমি আছে। তারা জমি চাষ করে। ফসল উৎপাদন করে। লেখাপড়া যারা শিখেছে তারা পাটি বানানোর কাজে আগ্রহী নয়। পড়ালেখা যারা করেছে তারা এই কাজ করতে চায় না। আইএ পাশ করার পর অনেকের বিয়ে হয়ে যায়।

কোলাপাড়া গ্রামে অনেকের নিজস্ব জমি আছে। কেউ কেউ বর্গা চাষ করে। কেউ কেউ ছোটো মুদি দোকান ও কেউ কেউ বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে। কারো কারো নিজস্ব ওয়ার্কশপ আছে। সাবিত্রী দেব নাথ বলেন, "আমার স্বামী নিজের ইনকাম থেকে ঘর পাকা করেছেন এক গণ্ডা জমির ওপর। আমাদের বাড়িতে মোট তিন গণ্ডা জমি

www.pathagar.com

আছে। আমরা সব পুজা করি : দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, ধন পূর্ণিমা। স্বামী সন্তান, ছেলেমেয়ের মঙ্গল কামনার জন্য মনসা পূজা করি। শ্রাবণ মাসের ৩১ তারিখ আমরা মনসা পূজা করি।"

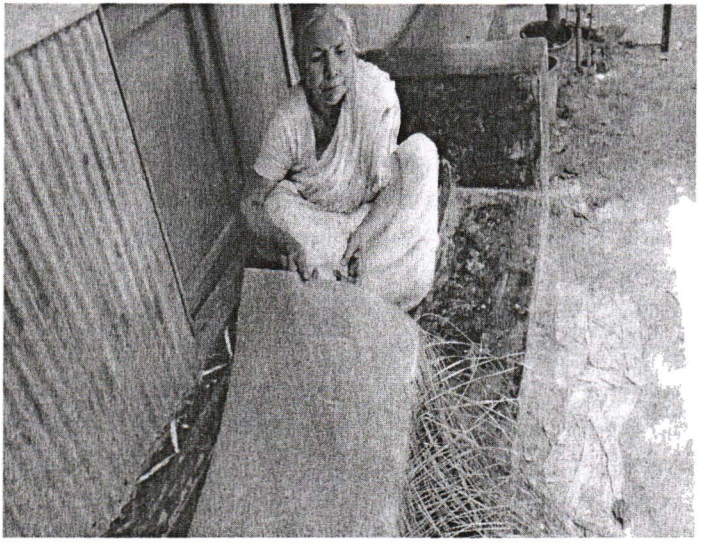

কোলাপাড়া গ্রামের বিখ্যাত পাটি শিল্পী রেঞ্চুবালা দেবনাথ

পরশুরামের শীতল পাটির বিখ্যাত শিল্পী রেঞ্চুবালা দেবনাথ

পশুরামের কোলাপাড়া গ্রামের শীতলপাটির নাম করা শিল্পী রেঞ্চুবালা দেবনাথের (৬৫) সঙ্গে আলাপ হয়। তার গ্রামের বাড়ি ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া গ্রাম। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি বলেন, "ছঘইরা আমার শ্বশুর বাড়ি। পরশুরাম কোলাপাড়া আমার নিজের বাপের বাড়ি। মা যশোদা বালা মসজিদে ব্যবহারের জন্য ৩০ হাত লম্বা পাটি বানাতেন। চিকন পাটিও বানাতেন। মার নিকট থেকে ছোটোবেলায় দেখে দেখে পাটি বানানো শিখেছি। ১০/১২ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। শখ করে শ্বশুরবাড়িতে পাটি বানাইছি। ওখানে হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। আমরা যাই নাই। স্বামী নিয়ে পরশুরাম আসি আমার বাপের বাড়িতে, পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালে। পরশুরাম বাপের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বামী মারা যান। স্বামী রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন চট্টগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ায় চলে যাই। আমার ছেলে সন্তান হয় সেখানে। সাত মাস বয়সের ছেলে সন্তান নিয়ে পরশুরাম বাপের বাড়িতে আসি। মোড়া বানাই, বাঁশ-বেত দিয়ে চালইন বানাই, পাটি বানাই। সন্তানকে মানুষ করি। আমার ছেলে স্বাধীন চন্দ্রনাথ। পরশুরাম বাজারে তার মুদির দোকান আছে। আমি চিকন পাটি বানাই। ডিজাইনের নাম উয়া ধাইর-পাশ বা হাতারি ধাইর।

www.pathagar.com

উয়া ছেমরা চাইলতা ফুল ডিজাইন। একটা ঘর করি ডবল, তার মধ্যে একটা চাইলতা ফুল। ইচ্ছা করলে চাইলতা ফুলের ডিজাইন সারা পাটিতে দেওয়া যাবে। কিন্তু খাটনি বেশি তাই সারা পাটিতে চাইলতা ফুল ডিজাইন দেইনা। উয়া ধাইর-পাশ ধাইর সারা পাটিতে দেওন যায়। সারা পাটিতে খুপরি বা ঘর ডিজাইন দেওয়া যায়। বাইনের মধ্যে যারা জানে না তাদের জন্য পরিশ্রম বেশি। আমরা যারা জানি, আমাদের জন্য সহজ। বাইনটা সহজ কাজ নয়। সময় বেশি লাগে। ডিজাইন করতে পছন্দ করি। মনের কল্পনা থেকে কাজ করি। একটা পাটি দেখেছিলাম ১৩/১৪ বছর বয়সে। ঐ পাটির ডিজাইন পাশাখেলা ঘর ডিজাইন। চিন্তা কইরলাম ঐ ডিজাইন আমি কইরতে পারি কি না। একদৃষ্টে দেখি পাশা খেলার ঘর আমার পাটিতে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ডিজাইন করার পর দেখি যে, আমি করতে পারব। দেইখলাম যে পাটির মইধ্যে মইধ্যে এমনে ডিজাইন দেওয়া যায়। নিরাধারে দিতে গেলে ডিজাইন হালকা হয়। সুন্দর দেখা যাবে না। মাঝে মইধ্যে দিলে সুন্দর দেখা যাবে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় করাই আমার উদ্দেশ্য। টাকা পরের কথা। জিনিসটা যদি ভালো হয়, একমাস লাইগলো আমার খাটনির মূল্য তারা দিবে, যারা পাটি নিবে। ফরমাইশ দিলে আমি করতে পারি। কারণ টাকা বেশি পাব। আমার এই ছাড়া পথ নাই। আমার বাড়িতে কুটির শিল্পী আইছিল ঢাকা থেকে। তারা আমার পাটি নিছে। আমি চিকন কাজ করি। আরো চিকন করা যায়। বর্তমানে মোটা ডিজাইনের কাজ করি না। বয়স হই গেছে অনেক, চোখে দেখি না।"

জানা যায় যে, নাথদের মৃত্যুর পর পাটিতে বসিয়ে মাটি দেওয়া হয়। নারী পুরুষ সবাইকে কবরে পাটি বিছিয়ে পাটির উপর মৃতদেহ বসিয়ে সাড়ে তিন হাত মাটি খুঁড়ে এক মাথায় পাটি বিছিয়ে পাটির অন্য মাথা দিয়ে মৃতকে ঢেকে দিয়ে মাটি দেওয়া হয়।

৫. কারুশিল্পী

পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলার প্রায় ৬টি ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের শতাধিক পরিবার কারুশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকে এ শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। পরশুরাম উপজেলার বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের দক্ষিণ তালবাড়িয়া গ্রামের প্রায় ২০টি পরিবার এ কাজে যুক্ত। ঐ গ্রামে গেলে কানে ভেসে আসে ঠুকঠাক শব্দ। কেউ বাঁশ কাটছেন, কেউ বেতি তৈরি করছেন। বাঁশের বেতি নারী ও পুরুষের নিপুণ ছোঁয়ায় হয়ে উঠে রকমারি নিত্য ব্যবহার্য ডোল, তালাই, মাছ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী, চাটাই, হোচা, ঝুঁড়ি ও কুলা। বাঁশের বেতির তৈরি এসব সামগ্রী ফুলগাজীসহ পরশুরামের বিভিন্ন এলাকায় বেপারিরা কিনে থাকেন। ওই গ্রামের কারুশিল্পের কারিগর মফিজুল হক জানান, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা বাঁশের কাজের সাথে জড়িত। এ পেশায় নিয়োজিত পরিবারগুলো প্রায় ২০-৩০ বছর ধরে এ পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

www.pathagar.com

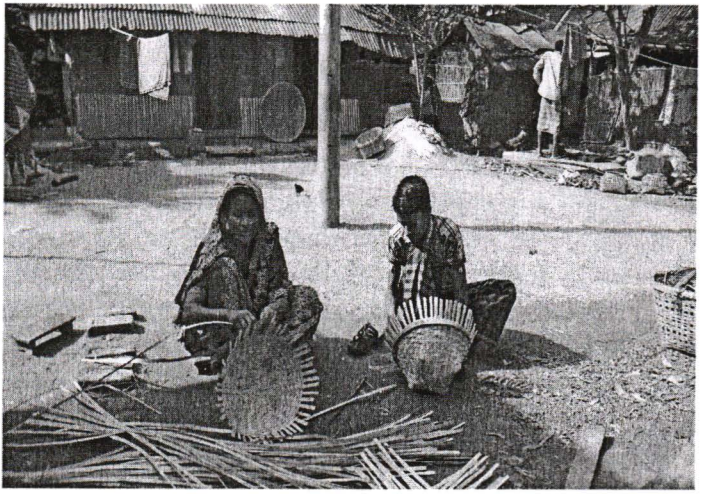

পরশুরাম উপজেলার দক্ষিণ তালবাড়িয়া গ্রামের কারুশিল্পী

৬. মুচি

পরশুরামের মুচি সম্প্রদায় অনেক পুরোন। পরশুরামে অনেক আগে ৮/১০ পরিবার মুচি ছিল। রবিদাস নামে পরিচিত মুচি সম্প্রদায়।

ফেনীর মুচি সম্প্রদায়ের দোকান

এক সময় এখানে মুখুয়া, বাখাল, উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত মুচি ছিল। বর্তমানে দুই তিনটা পরিবার আছে। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। সম্ভবত এরা উত্তর ভারত থেকে

www.pathagar.com

এখানে এসেছিল। এদের আচার-আচরণ আলাদা। জুতা তৈরি এদের পেশা। এরা চোলাই মদ তৈরি করে এবং বাজারজাত করে। এটি বাংলা মদ নামে পরিচিত।[৪]

৭. পাল

বাউর পাথর গ্রামের দিলীপ কুমার পাল বিশ্বকর্মা মূর্তি তৈরি করেন। কুমার, কামার, বণিক, স্বর্ণ ব্যবসায়ী, নাপিত বিশ্বকর্মার পূজা করেন। অরুণ পালের নিকট তিনি মূর্তি বানানো শিখেছেন। অরুণ পাল দুর্গা, কালী, বিশ্বকর্মার মূর্তি বানাতেন। দিলীপ কুমার পাল বিশ্বকর্মা, দুর্গা, সরস্বতী মূর্তি বানাতে জানেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৪৬। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। সংসার চলে না। একটা মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী মাটির হাঁড়ি, পাতিল, পিঠার খোলা তৈরি করতে পারেন। দুর্গা মূর্তি ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা যায়। বিশ্বকর্মা এক হাজার দুইশত টাকা থেকে এক হাজার তিনশত টাকা, কালী এক হাজার পাঁচশত থেকে দুই হাজার টাকা। দুর্গা মূর্তি বানাতে একমাস সময় লাগে। পরশুরাম বাজারের সেলুন সমিতি, টেইলার সমিতি বিশ্বকর্মা মূর্তি তৈরির অর্ডার দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বকর্মা পূজা করেন। মূর্তি ছাড়া মাটির খেলনাও তিনি তৈরি করেন।

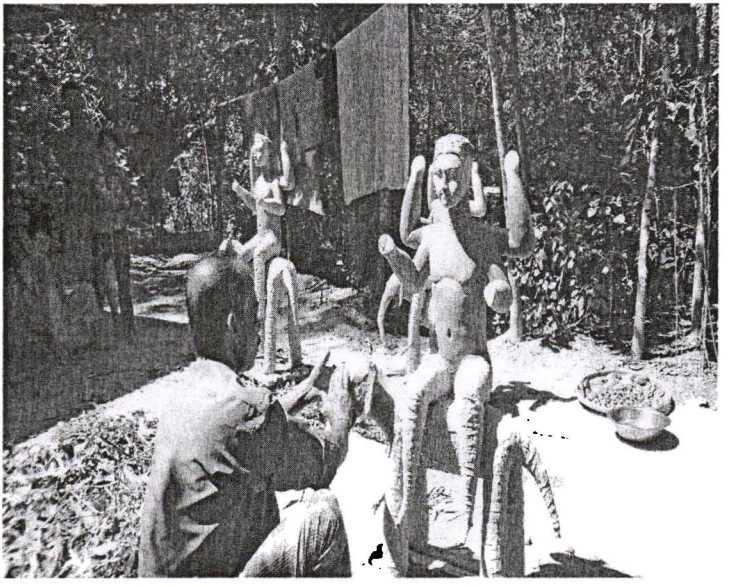

বাউর পাথর গ্রামের দিলীপ কুমার পাল বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরি করছেন

বিশ্বকর্মার মূর্তি বানাতে পাঁচদিন লাগে। রোদে শুকানো হয় তিন দিন। মানুষের শরীরের রঙের মতো রং দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মূর্তি তৈরির জন্য মইনা মাটি বাড়িতে এনে পাইট করা হয়। এরপর কাজ শুরু হয়। ব্রাশ, তুলি সব হাতের কাজ। খড়ের বেনা দিয়ে হাতির কাঠামো তৈরি হয়। বেনার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। খড়ের বেনা দিয়ে মূর্তির গড়ন তৈরি হয়। এর উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। হালকা গোলাপী রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হয়। শরীরের সঙ্গে মাথা যুক্ত করা হয়। বিশ্বকর্মার চার হাত, দুটি পা এবং মুখমণ্ডল। বিশ্বকর্মার আসন হাতির উপর। এরপর নতুন কাপড়ের সাদা ধুতি পরানো হয়। মাথায় শোলার তৈরি চূড়া থাকে। নিচে বাম হাতে দাড়িপাল্লা, নিচের ডান হাতে হাতুড়ি, উপরের বাম হাতে শঙ্খ ধ্বনি দেওয়ার জন্য থাকে শঙ্খ এবং উপরের ডান হাতে চুঙ্গা। গলায় মালা দিয়ে বিশ্বকর্মার মূর্তিটি সাজানো হয়।[৫]

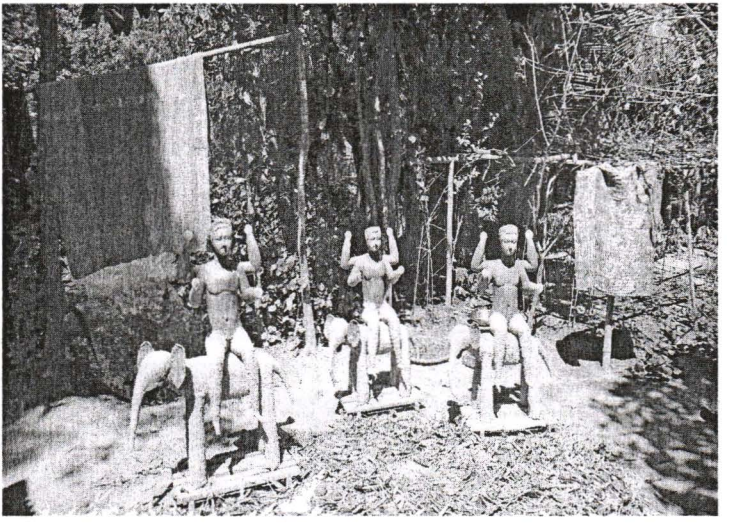

বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরি করে রোদে শুকানো হচ্ছে

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী হরি জলদাস, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : মাথিয়ারা, পাঁচগাছিয়া, জেলা : ফেনী; প্রফুল্ল জলদাস, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : মাথিয়ারা, পাঁচগাছিয়া, জেলা : ফেনী

২. সাক্ষাৎকার : হরিশচন্দ্র জলদাস, সুরেশ জলদাস, মরণচন্দ্র জলদাস, স্থান : সোনাগাজীর চরখোন্দকার জেলেপাড়া, তারিখ : ১৯.১১.২০১৩ ও ২২.১১.২০১৩

৩. পুষ্পরাণী দাস, বয়স : ৬০ বৎসর, পেশা : ধোপা, গ্রাম : দক্ষিণ ছানুয়া, জেলা : ফেনী

৪. সাক্ষাৎকার : কাজী তোফায়েল আলম বাবর

৫. দিলীপ কুমার পাল, গ্রাম : বাউর পাথর, থানা : পরশুরাম, জেলা : ফেনী

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্র-মন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

বর্তমান ফেনী জেলায় প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে আধুনিক হাসপাতাল। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের ফলে গ্রামে-গঞ্জে রয়েছে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়েও নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়। তথাপি গ্রামাঞ্চলের কিছু মানুষ আজো কবিরাজি চিকিৎসায় বিশ্বাস করে। বিশেষ করে নিরক্ষর ও অভাবী মানুষ আজো নানা অসুখ-বিসুখে ছুটে যায় লোকচিকিৎসক বা কবিরাজের কাছে।

জন্ডিস

ফেনী জেলার মাথিয়ারা গ্রামের (পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন) কালা চান একজন লোকচিকিৎসক। তাঁর বাবা প্রমদানন্দ জলদাস। মাথিয়ারা গ্রামে জেলে সম্প্রদায়ের কিছু লোক বসবাস করে। কালা চান ছোটোবেলায় মাছ ধরার কাজ করতেন। তাঁর পিতা একজন জেলে ছিলেন। তাঁরা বাবা ১১৬ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বলে তিনি জানান। বাবা প্রমদানন্দ জলদাস জন্ডিস রোগের চিকিৎসা করতেন। মানুষের দোয়ায় তাঁর বাবা দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন বলে জানান। কালা চানের বয়স ৬৫ বছর। ৩৫ বছর বয়স থেকে তাঁর বাবার নিকট এই চিকিৎসা শেখেন। মাথিয়ারায় রয়েছে আকবর শাহ ফকিরের মাজার। আকবর শাহ ফকিরের নিকট তাঁর বাবা জন্ডিসের চিকিৎসা শেখেন।

কালা চান জানান, আকবর শাহ ফকির একবার নিজের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে নদীর পানিতে ধুচ্ছিলেন। প্রমদানন্দ জলদাস মাছ ধরার জন্য সেই নদীতে গিয়েছিলেন। তিনি স্বচক্ষে আকবর শাহ ফকিরের নাড়িভুঁড়ি ধৌত করার দৃশ্য দেখে ফেলেন। প্রমদানন্দ জলদাস এতিম ছেলে। বাবা মা ছিল না। তাই আকবর শাহ ফকির দয়াপরবশ হয়ে তাকে জন্ডিস ও লিভারের জটিল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। কালা চান তার বাবার নিকট থেকে জন্ডিস ও লিভারের জটিল রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি শিখেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

জন্ডিস রোগের চিকিৎসার জন্য কালা চান বরুণ গাছের মুড়া, খেজুর কাঁটা ও লবণ ব্যবহার করেন। প্রথমে মন্ত্র পড়ে খেজুর গাছের কাঁটা দিয়ে বরুণ গাছের মুড়া খুঁচিয়ে কাঁটা গেঁথে দেন। সাতটা খেজুর কাঁটা এইভাবে গেঁথে দেন। এরপর মন্ত্র পড়ে লবণ খেতে দেন রোগীকে। এরপর বরুণ গাছের একটি মুড়া রোগী তাঁর বাড়িতে জলন্ত

www.pathagar.com

চুলার উপর ঝুলিয়ে রাখবে। আস্তে আস্তে আগুনে এটি শুকাবে এবং লিভার আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে এবং রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যাবে। মন্ত্রগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কালা চান জানান, "মন্ত্র গোপনীয়। আল্লার দান এই জিনিস। কাউকে বলা যাবে না।"

এরপর তিনি ১০১টি গাছের পাতার রস দিয়ে পাচন তৈরি করে রোগীকে খেতে দেন। কেউইচ্চা, ঠনা গাছের ছাল, সুতামন পাতা, লজ্জাবতীর মুড়া, ক্ষেতপাকরা, দূর্বাঘাস, রিফিউজির পাতা, কেলা কচুর পাতা, চোখকুনি পাতা, ছইন্নার লতা, আমের ছাল, হরিংগা বেলের রস ইত্যাদিসহ ১০১টি গাছের পাতার রস দিয়ে পাচন তৈরি করেন। তাঁর মেয়ে পাতা ছেঁচার কাজে সাহায্য করেন।

জন্ডিস রোগী জন্য পুটি মাছ, বোয়াল মাছ, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, হাঁসের ডিম, হাঁসের গোস্ত, আঙ্গুর, তেঁতুল খাওয়া নিষেধ। সারাদিন পর্যন্ত ঝুপা নারকেল পুড়িয়ে গুড় দিয়ে খাবে। কচি ডাবের পানি, তেল হলুদ ছাড়া তরকারি, কুস্যাইরের রস, জাম্বুরা খেতে পারবে। মুরগির গোস্ত, মুরগির ডিম ও কাগজি লেবু খাওয়া যাবে। কালা চানের স্ত্রী আরতি বালা দাসও কালা চানের বাবার নিকট থেকে জন্ডিস রোগের চিকিৎসা শিখেছেন। কালা চানের মেয়ে মিনা রানী দাস কালাচানের নিকট থেকে চিকিৎসা শিখেছেন।

০২.০৬.২০০৫ তারিখ সকাল বেলায় প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী কালা চানের বাড়িতে যান এবং দেখতে পান রোগীর ভিড়ে বাড়ির আঙিনা, পুকুরের পাড় পরিপূর্ণ। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধ-যুবক বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে চিকিৎসার জন্য। তাদের বিশ্বাস কালা চানের নিকট চিকিৎসা করালে তাদের রোগ সেরে যাবে। কিছু রোগীকে গায়ে পাথুরিয়া চুন মেখে পুকুরে গোসল করতে দেখা যায়। একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে মহিলা রোগীদের পাথুরিয়া চুন মেখে কালা চানের স্ত্রী ও মেয়ে মাথায় পানি ঢেলে মন্ত্র পড়ে গোসল করাচ্ছেন। জন্ডিস চিকিৎসার জন্য কালাচান নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেন না, যার যা খুশি টাকা-পয়সা দেন বলে তিনি জানান। রোগীর সমস্ত শরীরে পান খাওয়া চুন মন্ত্র পড়ে মাখিয়ে দেন। 'উইতলেংগা' গাছের শিকড় রোগীর কানে রেখে মন্ত্র পড়ে গায়ে পানি দিলে হলুদ রং-এর পানি রোগীর শরীর থেকে বের হয়ে যায়। মাথার উপর দিলে রোগগুলো নামে। তারপর রোগী সাবান মেখে গোসল করে বাড়ি চলে যাবে। কারো সাত দিন, কারো পনেরো দিন, কারো একমাস এইভাবে চিকিৎসা করলে চোখের হলুদ রং চলে যাবে। জনৈক রোগী সুস্থ হয়ে পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট তৈরি করে দিয়েছেন বলে কালা চান জানান।

কালাচান চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বর্তমানে তাঁর পরিচয় একজন লোকচিকিৎসক হিসেবে। জেলে বংশের পরিচয় প্রায় মুছে গেছে। প্রতিদিন শত শত রোগী বাড়িতে আসে। প্রতিদিন তার চার/পাঁচ হাজার টাকা আয় হয়। তিনি গরিব দুঃখীদের সাহায্য করেন নানাভাবে। তিনটি মেয়েকে লালন পালন করে বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে একটি মন্দির তৈরি করেছেন। মন্দিরের নাম শ্রী গুরুর আঙ্গিনা। প্রতিবছর পৌষ মাসের ২২ তারিখে তার বাড়িতে ছয় দিনব্যাপী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গানের অনুষ্ঠান হয়। ভগবত ও গীতা পাঠ হয়। এলাকায় তার বেশ সুনাম রয়েছে। লোকচিকিৎসক কালা চান ফেনীর জনগণের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।[১]

www.pathagar.com

খ. তন্ত্র-মন্ত্র

লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী ভূত বা অশরীরী আত্মার বাসস্থান হচ্ছে বন-জঙ্গল, নির্জন স্থান, ভাঙা মন্দির, কবরস্থান বা শ্মশান। এদের অশুভ দৃষ্টি বা প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। ব্রাহ্মণরা দেয় নানা প্রকার তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র, মৌলবি সাহেবরা দেন কোরানের আয়াত তামার মাদুলীতে ভরে গলায় ঝোলাতে, ফকির, দরবেশ, ওঝা, বৈরাগীরা পয়সার বিনিময়ে বিতরণ করেন জাদুগুণসম্পন্ন হাড়ের টুকরো, কোনো পশুর দাঁত, বাঘের নখ, লোহার টুকরো, কিংবা সুগন্ধি কাঠের টুকরো।

অশুভ দৃষ্টি বা নজর লাগা সম্পর্কিত প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানরা কালো হাঁড়ির গায়ে সাদা রং-এর ক্রশ বা কোনোরূপ চিহ্ন এঁকে লটকিয়ে দেয় বাঁশের খুঁটির মাথায়। গ্রাম বাংলায় ধান ক্ষেত বা ফসলের ক্ষেতে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। অশুভ দৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য বাড়ির দরজায় কেউ কেউ লাল রঙের স্বস্তিকা চিহ্ন বা লক্ষ্মীর হাত ছেপে দেয়। কুনজর লাগার ভয়ে মা শিশুদের ললাটে এঁকে দেন কালো কালির ফোঁটা। শিশুর কড়ে আঙ্গুলে মৃদু কামড় দেবার বা পুরুষ শিশুর নাক কান বিঁধিয়ে দেওয়ার যে রীতি তার উদ্দেশ্য এই অশুভ দৃষ্টির ভয় প্রতিরোধ করা।

আগে গ্রামের বড়ো বড়ো পুকুর ছিল মানুষের পানীয় জলের প্রধান উৎস। দূষিত পানি পান করার ফলে কোনো কোনো সময় কলেরা, ডায়রিয়া বা পেটের পীড়া, মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ব্যাপক আকার ধারণ করতো। কোনো বাড়িতে কলেরা রোগ দেখা দিলে পাড়ার মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। এমন কি মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন বা সৎকার করার জন্য প্রতিবেশীরা আসতে সাহস করতো না। কলেরা রোগ গ্রামে মহামারীর রূপ ধারণ করতো। গ্রামবাসীরা এটাকে 'ওলা বিবি ও তার বোনদের আছর' বলে মনে করতো। মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মসজিদ-মন্দিরের নামে 'মানত' করতো; গুনিন বা মৌলবি সাহেবকে দিয়ে বাড়ি 'বন্ধ' করতো, তাবিজ-তুমার ব্যবহার করতো।[২]

চিকিৎসা বা তুকতাকের মাধ্যমে ভূত বা জিন তাড়ানোর গল্প আজো লোকে মুখে শোনা যায়। তবে এখন ফেনীর নিভৃত পল্লি অঞ্চলেও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তবে গ্রামের নিরক্ষর ও নিম্নবিত্তের কিছু মানুষ প্রাচীন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। নানা আপদে-বিপদে তারা আজো কবিরাজ ও ওঝাদের কাছে ছুটে যান বিপদমুক্তির আশায়।

তথ্যনির্দেশ

১. কালা চান, বয়স : ৬৫ বৎসর, পিতা : প্রমদানন্দ জলদাস (মৃত), পেশা : লোকচিকিৎসক, গ্রাম : মাথিয়ারা, ইউনিয়ন : পাঁচগাছিয়া, জেলা : ফেনী, তারিখ : ০২.০৬.২০০৫

১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ.১৯

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

১. হেতে হুইসের হোন্দেদি কুরাইল চালায়।
(হুইস- সুঁই, হোন্দেদি- গোড়াদি, কুরাইল- কুড়াল)
ব্যাখ্যা : অন্যের কাছে যে কাজ অতি কঠিন মনে হয়, অভিজ্ঞ লোক অতি সহজে তা সমাধা করতে পারে।

২. হরের হুত
কুত্তার মুত।
(হুত- ছেলে সন্তান, মুত- প্রসাব)
ব্যাখ্যা : আপন সন্তানের উপর যতটুকু নির্ভর করা যায় পরের সন্তানের প্রতি তা করা যায় না।

৩. মাথাত থোয় না উনের ডরে
মাডিতে থোয় না হিম্বার ডরে।
(থোয়না- রাখে না, ডরে- ভয়ে, মাডিতে- মাটিতে, হিম্বা- পিঁপড়া)
ব্যাখ্যা : উভয় সংকট অর্থে।

৪. আঁতি যখন খাদে হড়ে
হুজালী ও চাবি ধরে।
(আঁতি- হাতি, হুজালী- ক্ষুদ্র মশা-মাছি)
ব্যাখ্যা : সুদিন-দুর্দিন অর্থে। বিপদে পড়লে বিশাল জন্তু হাতিকেও ক্ষুদ্র জীব অপমান করে।

৫. কুত্তার লেজ বারো বছর
চুঙ্গার বইললেও যে বেঁয়া হেই বেঁয়া।
(কুত্তা- কুকুর, চুঙ্গা- বাক্স)।
ব্যাখ্যা : স্বভাব অপরিবর্তনীয় অর্থে। সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের মন্দ স্বভাব সহজে পরিবর্তন হয় না।

www.pathagar.com

৬. কাউয়া চিনে ঘাউয়া কাঁড়ল।
(ঘাউয়া- ক্ষতওয়ালা, কাঁড়ল- কাঁঠাল)
ব্যাখ্যা : কাক যেমন ভালো ফল দেখেও খায় না, তার দৃষ্টি সব সময় আবর্জনার দিকে, তেমনি মন্দ লোকও সর্বদা মন্দের সাথে যুক্ত হতে চায়।

৭. হাইদলে বউ তরাই যায়
চুরি করি চাইল চাবায়।
(হাইদলে- সাধলে বা আগ্রহ দেখালে, তরাই- অসম্মতি)
ব্যাখ্যা : পরিহাস অর্থে। আগ্রহ করে কাউকে কিছু খেতে দিলে সে যদি প্রত্যাখান করে।

৮. নাপিত দেইখলে
নোক্কনি বাড়ে।
ব্যাখ্যা : সুযোগ অর্থে। কোনো ব্যাপারে সুযোগ পেয়ে বাড়াবাড়ি করা ।

৯. হোলা কারবারি মাইয়া দরবারি।
(হোলা- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, মাইয়া- মেয়ে)
ব্যাখ্যা : অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের কাজকারবার বোঝাতে।

১০. জুদা ভাত হুদা ভালা।
(জুদা- আলাদা)
ব্যাখ্যা : সংসার থেকে পৃথক হয়ে শুধু ভাত খেয়ে থাকলেও তৃপ্তি।

১১. নাইছতো না জাইনলে
উডান বেঁয়া।
ব্যাখ্যা : অনভিজ্ঞ অর্থে। নিজের দোষ অন্যের উপর চাপানো।

১২. তুই আঁডছ ঠাইলে ঠাইলে
আঁই আঁডি হাতায় হাতায়।
(আঁডছ- হাঁটা, ঠাইলে-ডালে, আঁই-আমি)
ব্যাখ্যা : অন্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে বেশি বুঝাতে গিয়েই এমন কথা বলে।

১৩. সরকারে খায় মোছইদে আযান দেয়।
(মোছইদে- মসজিদে)
ব্যাখ্যা : যাদের রুজি রোজগারের চিন্তা নাই, বেকার, অকর্মণ্য জীবন।

১৪. যে হাতে খায় হেই হাতে আগে।
(হাতে- খাওয়ার প্লেট, আগে- পায়খানা করা)
ব্যাখ্যা : উপকারীর ক্ষতি করা অর্থে।

www.pathagar.com

১৫. যারলাই কইরলাম চুরি হেতে কয় চোর
যার গর কইরলাম চুরি হেতেও কয় চোর।
(হেতে- সে)
ব্যাখ্যা : উপকারীর উপকার স্বীকার না করে উল্টো অপবাদ দেয়া।

১৬. আঁই ভালা তো আঁর দুইন্নাই ভালা।
(আঁই- আমি, দুইন্নাই- দুনিয়া)
ব্যাখ্যা : নিজে ভালো হলে অন্য সকলকে ভালো মনে হয়।

১৭. কারো ঘর হোড়া যায়
কেয় আগুন হোয়ায়।
(হোড়া - আগুন লাগা)
ব্যাখ্যা : পরের ঘোর বিপদের সময়ও কেউ কেউ আপন সুখ সন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

১৮. মা কয় না হুত
খালা কয় আঁর বইন হুত।
(হুত- পুত্র, বইন হুত- ভাগিনা)
ব্যাখ্যা : অন্য আত্মীয় যতই আদর-যত্ন দেখাক না কেন, তা মায়ের মত নয়।

১৯. কাটা গায়ে লবণ ছিঠা।
ব্যাখ্যা : কারো বিপদের সময় আরো আঘাত করা।

২০. কোম্পানিকা মাল
দারিয়া মে ঢাল।
ব্যাখ্যা : পরের জিনিসপত্র ইচ্ছা পূর্বক অপব্যবহার করা।

২১. নাই মামার তুন কানা মামা ভাল।
ব্যাখ্যা : কিছু না থাকার চাইতে, কিছু কম থাকা ভালো।

২২. ভাইয়ে কইছে বাঁইনতো ধান
বাইনতে আছে ওদা ধান।
(বাইনতো- ভানতে, ওদা- ভেজা)
ব্যাখ্যা : বোকা লোকেরা কখনও সঠিক কাজটা করতে পারে না এবং ভালো মন্দের তফাত বোঝে না।

২৩. ডেঁই স্বর্গে গেলেও বারা বাঁন্দে।
(ডেঁই- ঢেঁকি, বান্দে- বাঁধে)
ব্যাখ্যা : খারাপ লোকের স্বভাব অপরিবর্তনীয়।

২৪. উপরে সাদা
ভিতরে কালা।
ব্যাখ্যা : মুখে এক রকম, অন্তরে আরেক রকম।

www.pathagar.com

২৫. হরের মাথায় নুন থুই বরই খায়।
(হরের- পরের)
ব্যাখ্যা : নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যকে ব্যবহার করা।

২৬. চোরেরে কয় চুরি কর
গিরস্তরে কয় হুজাগ থাক।
ব্যাখ্যা : উভয় পক্ষকে একই সাথে সমর্থন করা।

২৭. হাড়া হুতার ঘষাঘষি
মইরচের দফা শেষ।
(হাড়া- পাটা)
ব্যাখ্যা : বিত্তশালীদের মধ্যে রেষা-রেষি শুরু হলে তাদের অধীন দরিদ্ররা পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২৮. নিজেরআন হোলআনা
হরেরআন কিচ্ছু না।
(নিজেরআন- নিজেরটা, হোল- ষোল, হরের- অপরের)
ব্যাখ্যা : সমাজে বহু লোক আছে যারা নিজের স্বার্থের কথাই ভাবে, অপরের কোনো মূল্যই স্বীকার করে না।

২৯. দয়া আছে মায়া আছে
গলা ধরি কাঁন্দে
আধা হইসার আঁইট্টা কেলা
হরান গেলেও ন দে।
(হইসার- পয়সার, হরান- পরান)
ব্যাখ্যা : পরের দুঃখে কাঁদতে পারে বটে, কিন্তু নিজের পকেটের একটি কানাকড়িও খরচ করতে রাজি নয়।

৩০. উনা ভাতে দুনা বল
বেশি ভাতে রসাতল।
ব্যাখ্যা : পুষ্টিকর খাদ্য অপূর্ণ উদরে ভোজন হিতকর। অতি ভোজনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

৩১. যার বিয়া তার খবর নাই
ফাড়া হড়শির ঘুম নাই।
(বিয়া- বিবাহ, হাড়া- হড়শি- প্রতিবেশী)
ব্যাখ্যা : যার বিয়ে তার চেয়ে অন্যদের উৎসাহ বেশি।

৩২. দুই দিনের বৈরাগী
ভাতেরে কয় অন্ন।
ব্যাখ্যা : অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে জ্ঞান জাহির করা।

www.pathagar.com

৩৩. পাফ গাভীন অইছে।
(পাফ- পাপ, গাভীন- পরিপূর্ণ হয়েছে)
ব্যাখ্যা : পাপের পূর্ণতা বোঝাতে।

৩৪. হয় তোর একদিন
না হয় আঁর একদিন।
(আঁর-আমার)
ব্যাখ্যা : হয় তোমাকে বিনাশ করব, নয় নিজে বিনষ্ট হব–এই রকম দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করা।

৩৫. গাছ তোর নাম কি
হলে পরিচয়।
(হলে- ফলে)
ব্যাখ্যা : ফল দেখে যেমন গাছ চেনা যায়, তেমন কাজ দেখে মানুষ চেনা যায়।

৩৬. হগুনের দোয়ায় গরু মরে না।
(হগুন- শকুন)
ব্যাখ্যা : অসৎস্বার্থ সাধনে ব্যর্থ হয়ে কাউকে অভিশাপ দিলে তা কার্যকর হয় না।

৩৭. মইচ্ছে আগুনে
কাইনতো আইছে হাগুনে।
(কাইনতো- কাঁদা, হাগুন- ফাল্গুন মাস)
ব্যাখ্যা : সময় পার হওয়ার পর কোনো কাজ শুরু করা।

৩৮. হাত দিন চোরের
এক দিন গিরির।
বা,
চোরের হাত (সাত) দিন
গিরস্তের একদিন।
ব্যাখ্যা : অন্যায়কারী একদিন প্রতিফল পাবেই- এটা বোঝাতে।

৩৯. আঁর ভাই বরগোল্লাই গেছে
আঁরে মাডিত্তে দে।
(আঁর- আমার, বরগেল্লা- কলাপাতার জন্য, মাডিত্তে- মাটিতে)
ব্যাখ্যা : খেতে যাদের তর সয়না।

৪০. জাতের মেয়ে কালা ভালা
নদীর হানি ঘোলা ভালা।
(হানি- পানি, ভালা- ভালো)
ব্যাখ্যা : গুণবতী নারী কালো হলেও সে সকলের নিকট আদরণীয়। অকর্মা নারী রূপবতী হলেও মূল্যহীনা।

www.pathagar.com

৪১. দো-দিন বান্দা কলমা চোর
না পায় বেশত না পায় গোর।
ব্যাখ্যা : যে একবার সত্যকে আবার সুযোগমত মিথ্যাকে গ্রহণ করে, তাদের পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়।

৪২. তোরে আল্লা ভাতে হুতে বাড়াক।
ব্যাখ্যা : দোয়া অর্থে। অর্থাৎ ভাত আর সন্তানের দিক থেকে সে যেন ভালো থাকে।

৪৩. দুধ দেইন্না গরুর লাথিও ভালা।
(দেইন্না- দেয়া)
ব্যাখ্যা : উপকারীর দেয়া কষ্ট সহ্য করা যায়।

৪৪. এক মাঘে শীত যায় না।
ব্যাখ্যা : মানুষের সময় এক রকম যায় না।

৪৫. বাড়ির গরু ঘাঁডার ঘাস খায় না।
(ঘাঁডার- বাড়ির দরজা)
ব্যাখ্যা : নিত্য দেখাশুনার প্রতি সাধারণ মানুষ অবহেলা করে- এই অর্থে।

৪৬. হঁচা হামুকে বইর কাডা যায়।
(হঁচা- পঁচা, হামুক- শামুক, বইর- পা, কাডা- কাটা)
ব্যাখ্যা : অসাবধানতার কারণে সামান্য পদস্খলনেও বিপদ আছে।

৪৭. ইসাব কইরলে কিতাব মিছা।
(ইসাব- হিসাব)
ব্যাখ্যা : প্রতিপদে নিয়ম-কানুন মেনে চলা যায় না বোঝাতে।

৪৮. মোল্লার দৌড় মছইদ হয্যন্ত।
(মছইদ- মসজিদ, হয্যন্ত- পর্যন্ত)
ব্যাখ্যা : যার ক্ষমতা নাই সে যদি ক্ষমতা দেখায় তখন এটি ব্যবহৃত হয়।

৪৯. আগের আল যেমনে যায়
হিছের আলঅ হেমনে যায়।
(আল- হাল, হিছের- পিছের)
ব্যাখ্যা : অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ করা বোঝাতে।

৫০. গা সোন্দর খালতো বাই।
(সোন্দর- সুন্দর, বাই- ভাই)
ব্যাখ্যা : অকর্মণ্য ব্যক্তি বোঝাতে।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে নানাবিধ বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই এসব বিশ্বাস ও সংস্কারে বিশ্বাসী। বর্তমানেও তারা দৈবজ্ঞের গণনায় বিশ্বাস করে। বিয়ে-শাদি, গাছাকাটা– বিশেষ করে বাঁশকাটা, গৃহনির্মাণ বা কোথাও যাওয়ার সময় বিচার করে থাকে দিনক্ষণ। হাঁচি, টিকটিকির আওয়াজ হলে এটিকে যাত্রাকালে বাধা বা বিঘ্ন বলে মনে করা হয়। কাক বা প্যাঁচার ডাককে বর্তমানেও বিবেচনা করা হয় অশুভ ইঙ্গিত বলে। মহামারীর সময় তারা স্মরণ করে শীতলা, ওলা বিবি, রক্ষাকালীর। সন্তান লাভে জন্য তারা নানা রকম পূজা ও মানত করে থাকে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নানা ধরনের আদি লোকবিশ্বাস বা সংস্কার এবং শুভ-অশুভ বিশ্বাস ফেনীর মানুষের মধ্যে বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। তবে কালের আবর্তে অনেক লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। বিয়ে-শাদি বা অন্য কোনো শুভ কাজের দিন-তারিখ নির্ধারণ করার জন্য তারা পঞ্জিকা দেখে। সাধারণত বর বা কনের জন্ম মাসে বিয়ে-শাদি হয় না। পশু-পাখির আচরণের মধ্যে কোনো কোনো সময় মানুষ শুভ-অশুভ চিন্তা করে। গৃহস্থের গরুর চোখে জল পড়তে দেখা গেলে বা রাতে কুকুর একটানা ডাক দিলে বাড়ির রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয়। কুকুরের কান্না দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আনে। ঘরের কাছে দিনে দুপুরে কাকের ডাক অশুভ বলে বিবেচনা করা হয়। নতুন চাঁদ বাঁকা হয়ে উঠলে মানুষ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে। কোনো কোনো মাসে পাঁচ রবিবার পড়লে খনার বচন অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা করা হয়। গৃহস্থের দুগ্ধবতী গাভী দুধ কম দিলে গৃহস্থ মনে করে রাত্রে গোয়ালঘরে সাপ এসে গাভীর দুধ খেয়ে যায়। তাই তারা গোয়ালঘরের পাশে 'সাপের যম' বলে কথিত 'ফণী মনসার' গাছ লাগায়।

কোনো বাড়িতে চুরি হলে বা কোনো জিনিস হারানো গেলে চোর ধরার জন্য 'জিন' হাজিরা দেয়া, লাঠিচালা, বাটিচালা, পান লেখা, চালপড়া খাওয়ানো; দীর্ঘদিন রোগগ্রস্ত থাকলে দুশমনের যাদুটোনা থেকে মুক্ত হবার জন্য 'গুনিন' ডাকার রেওয়াজ একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। এখানে ছাত্ররা পরীক্ষার দিন ডিম ও কলা খায় না।

পুরুষরা কোথাও যাত্রাকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় 'হোঁচট' খেলে বা খালি কলসি দেখলে যাত্রা শুভ হয় না বলে বর্তমানেও বিবেচনা করা হয়। সকালবেলায় 'বাসিঘর' থেকে যাত্রা শুভ হয় না। তাই এক সময় দেখা যেত প্রচণ্ড শীতের সকালে বাড়ির মহিলারা শুধু ঘর-দুয়ার না, বাড়ির উঠান-ঘাটা পর্যন্ত ঝাড়ু দিয়ে রাখত।

এখানকার মহিলাদের মধ্যে আগে এক ধরনের সংস্কার ছিল। তারা স্বামীর নাম উচ্চারণ করতো না। রাতের বেলায় ঘর ঝাড়ু দেয়া বা রান্নাঘরের 'আইড্যা' (এঁটো)

www.pathagar.com

পানি বাইরে ফেলা অলক্ষ্মীর লক্ষণ মনে করতো। মায়েরা শীতকালে তৈরি 'খোলার পিঠা' প্রথমটা ছেলেকে খেতে বারণ করতো। সন্তানদের সাপে কাটলে বাবা-মা সন্তানকে স্পর্শ করতো না।

ফেনীতে বর্তমানেও গর্ভবতী মহিলারা অমাবস্যা-পূর্ণিমা রাতে, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের সময় তরিতরকারি বা মাছ-মাংস কাটাকুটি করে না। তারা 'জো' কলা খায় না। অনেকে এখনো এই সংস্কার মেনে চলেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে এসব সংস্কারেরও পরিবর্তন হচ্ছে।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০ পৃ. ২০০

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

একসময় ফেনীর প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বুড়িরা চরকায় সুতা কাটতো, জুগী পাড়াতে জুগীরা বস্ত্র বুনন করতো, গৃহিণীরা অবসর সময়ে বাঁশের দাঁড়া তৈরি করতো, বাঁশ ও বেতের দ্বারা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয়–লাই, কোরা, দোছনা, আন্তা, জঁই, ঢুলা ইত্যাদি তৈরি করতো। গ্রামে ধান ভাঙার মেশিন আসার ফলে অনেক বাড়ির ঢেঁকি অদৃশ্য হয়ে গেছে। শিমের পাতা ও পুঁই শাকের রস দিয়ে লেখার কালি তৈরি, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি বা কলাপাতা ও তালপাতায় লেখার কথা এখন গল্প বলে মনে হয়। গ্রামের কোনো কোনো বাড়িতে মহিলারা শিমগাছের লতা পুড়িয়ে এখনো হয়ত তামাক খাবার জন্য 'টিক্কা' তৈরি করে। তবে ভেজা ঘাসের ধোঁয়া দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় মশা তাড়ানো বা শুকনো ঘাসের বেণিতে আগুন দিয়ে অন্ধকার রাতে পথ চলার কথা অতীত হয়ে গেছে।

১. বাঁশের তৈরি সরঞ্জাম

হাজারি

ধান রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি হাজারিতে পাঁচ মণ ধান রাখা যায়। কোনো কোনো এলাকায় এটি ডোল নামেও পরিচিত। মূল্য ৪৫০/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা। বড়ো বাঁশ দিয়ে হাজারি তৈরি করা হয়। একটি বাঁশের মূল্য ৩০০/- টাকা। মেয়েরা হাজারি তৈরি করে। বাজার থেকে বাঁশ ক্রয় করা হয়। বাড়িতে নিয়ে দা দিয়ে প্রথমে বাঁশকে কদ্দাইতে বা টুকরা করতে হয়। এরপর এক কদ্দা বাঁশকে আটটি 'চিড়ি' বা ছোটো টুকরা করা হয়। চিড়ি থেকে 'বেতা' তোলা হয়। বেতা উঠানোর পর রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। এরপর হাজারি বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে জো উঠিয়ে তলা বানাতে হয়। এরপর কোণা ফিরিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে বেরাইতে বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বানাতে হয়। নির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়ার পর বাঁশের চাক বাঁধতে হয় প্লাস্টিকের সুতা দিয়ে। অন্য কোনো কাজ না করলে একদিনে একটি হাজারি বানানো যায়।

বাঁশের খাঁচা

তৈরির প্রধান উপকরণ বাঁশ। এটি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে বাঁশের ফালি বানাতে হয়। এটিতে গরুর খেঁড় কেটে রাখা হয়। মূল্য ৬০/- টাকা।

কোরা

বাঁশের তৈরি কোরায় ধান, চাল রাখা হয়। কোরায় ধান চাল বহন করে বাজারে বিক্রির জন্য নেওয়া হয় এবং বাজার থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারি, ফলমূল ক্রয় করে বাড়িতে আনা হয়। মূল্য ৮০/- টাকা। বোন বাঁশ দিয়ে কোরা বানাতে হয়। একটা বাঁশ দিয়ে ৬০/৭০ টি কোরা তৈরি করা যায়। একটি বোন বাঁশের মূল্য ৩০০/- টাকা।

www.pathagar.com

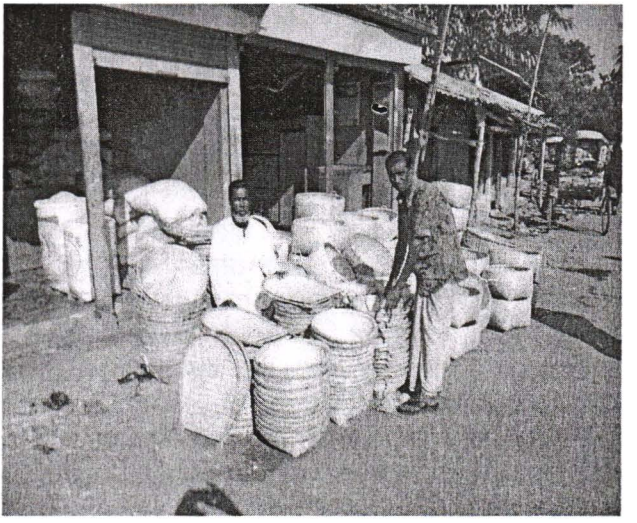

লেমুয়া বাজারে বাঁশের তৈরি সরঞ্জাম

খাঁচি

খাঁচির মধ্যে মুরগির বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা ভরে রাখা হয়। খাঁচি সেমাইর টুকরি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাঁচির মধ্যে খড় দিয়ে ঔষধের বোতলও রাখা হয়। বেগুন, মুলা, অন্যান্য তরিতরকারি খাঁচিতে ভরে বাজারে নেওয়া হয়। মাছ ও তরকারির আড়তে এগুলোর বেশি চাহিদা রয়েছে। একটি বাঁশ দিয়ে ২০০/৩০০ খাঁচি তৈরি করা যায়। একটি খাঁচি বানাতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে।

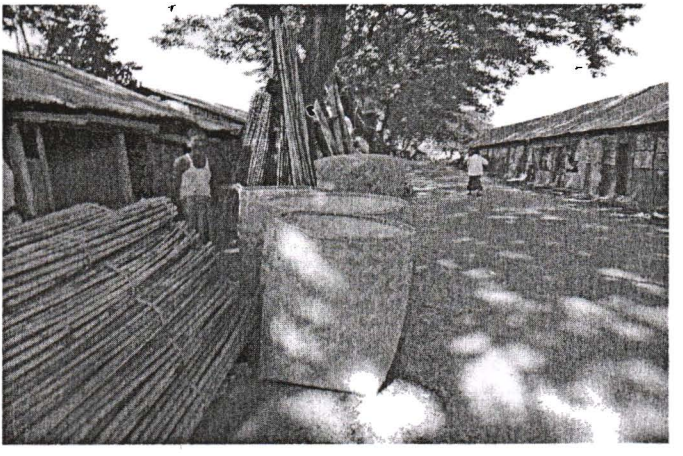

লেমুয়া বাজারে বাঁশের তৈরি ধান সংরক্ষণের ডোল

www.pathagar.com

মুরগির খাঁচা

বাঁশ দিয়ে মুরগির খাঁচা তৈরি হয়। এই খাঁচায় হাঁস, মুরগি রাখা হয়। মুরগির বাচ্চা ফুটানো যায়। খাঁচায় শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে ডিম রেখে তাও দেওয়া হয়। মূল্য ১০০/- টাকা।

ওড়া

মাটি কেটে ওড়ায় বহন করা হয়। ময়লা আবর্জনা ফেলা যায়। ওড়াতে ছাই ও গোবর ভর্তি করে বাড়ির কোণায় গর্তে ফেলা হয় ও সংরক্ষণ করা হয়। বছরে ছয়মাস ওড়ার চাহিদা রয়েছে। বড়ো বাঁশ দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। বেতনি বেত দিয়ে ওড়ায় ধরার জন্য তোরা লাগানো হয়। কোনো কোনো ওড়ায় মেশিনের সাহায্যে রাবারের তোরা লাগানো হয়। একদিনে বিশটি ওড়া বানানো যায়। একটি মূল্য ১৭০/- টাকা।

কুলা

ধান, চাল ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। মূল্য ৬০/- টাকা।

ধোচনা

গ্রামে চাল ও শাকসবজি ধোয়ার কাজে ধোচনা ব্যবহৃত হয়। মূল্য ৪০/- টাকা।

চালইন

চালইন দিয়ে ধান, সরিষা, কলাই ইত্যাদি চেলে ময়লা পরিষ্কার করা হয়।

২. মাছ ধরার সরঞ্জাম

নৌকা

বর্তমানে দুই রকমের নৌকা ব্যবহৃত হয়। ক. হস্তচালিত কাঠের নৌকা ও খ. ইঞ্জিনচালিত নৌকা। নৌকাগুলো সরংগা নৌকা নামে পরিচিত। ইঞ্জিনচালিত নৌকার মূল্য ৩৫,০০০/- টাকা। গ্রাম থেকে ভালো জাতের গাছ ক্রয় করা হয়। নৌকা মিস্ত্রিদের মধ্যে জলদাস ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক আছেন। একটি নৌকা তৈরি করতে ৮/১০ দিন সময় লাগে। দৈনিক মজুরি ৮০০/- টাকা।

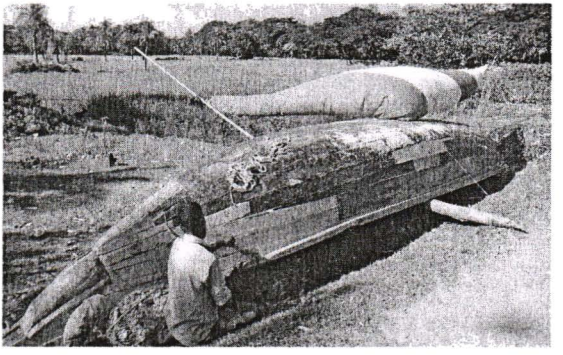

মাছ ধরার জন্য জেলেদের ব্যবহৃত নৌকা

www.pathagar.com

জাল

নাইলন সুতার তৈরি বিন্তি জাল ৫২ হাত লম্বা এবং ১০/১২ হাত চওড়া। জালের মূল্য ৪০,০০০/- টাকা। একটি জাল তৈরি করতে একমণ দশ কেজি সুতা লাগে। ১৫ কেজি প্লাস্টিকের কাছি/রশি লাগে। এক কেজি সুতার মূল্য ৩০০/- টাকা। জেলেরা নিজেরাই জাল তৈরি করে। একটি জাল তৈরি করতে পাঁচ থেকে ছয়মাস সময় লাগে। কোনো কোনো সময় জাল বুনার জন্য মিস্ত্রি/কারিগর রাখা হয়। তাঁর সম্মানী ১০,০০০/- টাকা। মেয়েরাও জাল বুনতে সাহায্য করে। বাঁশের 'তাবিলে' সুতা আটকিয়ে জাল তৈরি করা হয়।

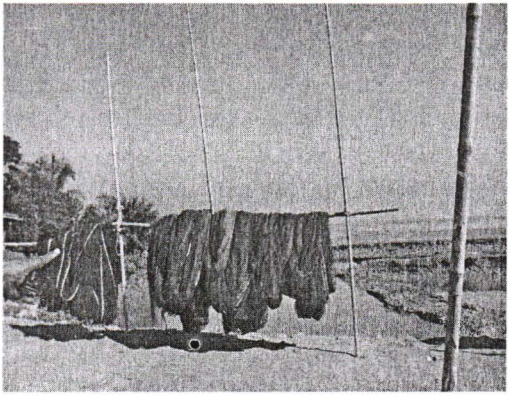

মাছ ধরার জাল

চাই

চাই মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্রামে বর্ষাকালে মাছের আসা যাওয়ার পথ দেখে ক্ষেতের আইলে, খালের ধারে, পুকুরের চালায় চাই বসানো হয়। বড়ো চাইয়ে সাধারণত চিংড়িমাছ, নলা মাছ, রয়না, কই, মাগুর ইত্যাদি ধরা পড়ে। ছোটো চাইয়ে পুটি, ট্যাংরা, গুলশা, মলা, ছোটো চিংড়ি, চেলা মাছ ধরা পড়ে। গ্রামীণ বাংলায় চাই-এর ব্যবহার বেশি।

চাই বানানোর জন্য বাঁশ কদ্দাইতে বা ফাটাতে হয়। বাঁশ কদ্দানোর পর মাপ অনুযায়ী বাঁশের শলা (আঞ্চলিক ভাষায় হলা) বানাতে হয়। প্লাস্টিক বা পাটের রশি দিয়ে জো উঠাতে হয়। একটা চাই বানাতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে।

ডুলা

জাল দিয়ে মাছ ধরে তা সাধারণত ডুলায় রাখা হয়।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী হরি জলদাস, বয়স ৭০ বৎসর, গ্রাম : মাথিয়ারা, পাঁচগাছিয়া, জেলা : ফেনী; প্রফুল্ল জলদাস, বয়স ৫০ বৎসর, গ্রাম : মাথিয়ারা, পাঁচগাছিয়া, জেলা : ফেনী

www.pathagar.com

লোকভাষা

বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে একই জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জনপদ হলেও এদেশে বিভিন্ন ধরণের আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত আছে; সেই সঙ্গে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গি রয়েছে। শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক সব ধরণের লোকের কথাবার্তায় আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের একটা প্রবণতা থাকে। ফেনী জেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান, বঙ্গোপসাগরের নোনা জল, পির-ফকিরের প্রভাব এবং পূর্বপুরুষদের বীরত্ব গাথা এই জেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে প্রভূত ভূমিকা রেখেছে। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য আবেগপ্রবণতায় অপরকে আপনীকরণের প্রচেষ্টা। এর মাঝেও ভাষায় কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন : ফেনী কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ উচ্চারণের ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহের চাপ কম থাকায় অল্পপ্রাণ ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। আবার অল্পপ্রাণ ধ্বনিসমূহ উচ্চারণের ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহের চাপ বেশি থাকায় মহাপ্রাণ ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। বর্ণ উচ্চারণে সহজতর বর্ণ ব্যবহার করা হয় অধিক হারে এবং প্রয়োজনে বর্ণকে ভেঙে কাছাকাছি উচ্চারণ অবস্থান বেছে নেয়া হয়, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা সুস্পষ্ট। এর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের মানুষ ফেনীর আঞ্চলিক ভাষাকে সহজভাবে বুঝতে পারে এবং সহজেই এ আঞ্চলিক ভাষাটিকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করতে পারে। ফেনীর আঞ্চলিক ভাষার সাথে কুমিল্লা অঞ্চলের চৌদ্দগ্রাম ও লাকসাম উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের মিরসরাই, বারইয়ারহাট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার মিল সুস্পষ্ট। নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর এলাকার ভাষার অনেকটাই সাযুজ্য রয়েছে ফেনীর আঞ্চলিক ভাষার সাথে।[১]

ফেনী অঞ্চলের মানুষের উচ্চারণে কোনো শব্দের আদ্য অক্ষর 'প' থাকলে তা আঞ্চলিক ভাষায় 'হ' এর মত উচ্চারিত হয়। আবার এখানকার কথ্য ভাষায় স, শ, ষ বর্ণের উচ্চারণে তেমন পার্থক্য থাকে না। স্থানীয়ভাবে 'চাটিগ্রামী' বলে কথিতদের উচ্চারণে 'ড়' বর্ণ 'র' এর মত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মধ্যযুগে মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারের ভয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বহু মুসলমান পরিবার দাদরা (ফেনী) ও চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলে বসতি পত্তন করেছিল। তারা স্থানীয়ভাবে 'চাটিগ্রামী' নামে পরিচিত হয়। একই পাড়ায় বংশ পরম্পরায় বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের উচ্চারণ স্থানীয়দের মত নয়।[২]

ফেনী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর আরবি, ফার্সি, ও পশ্তু শব্দ প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে ফেনী অঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত কিছু আঞ্চলিক শব্দ দেয়া হলো :

হোলা	=	ছেলে
মাইয়্যা	=	মেয়ে

www.pathagar.com

ছালন	=	তরকারি
সুরবা	=	তরকারির ঝোল
ঘরবা	=	মেহমান
হোঁয়া	=	শসা
হোর	=	শ্বশুর
হোয়ী	=	শাশুড়ি
আঁই	=	আমি
তুঁই	=	তুমি
হে	=	সে
হুব	=	পূর্ব
হইর	=	পুকুর
হাক্কানে	=	সামনে
ওঁচে	=	উপরে
এক্কেনা	=	একটু
কত্তে	=	কোথায়
রাঁই	=	বিধবা
হেগুন	=	তাহারা
হেমুই	=	সেখানে
হইক	=	পাখি
কিল্লাই	=	কেন
বিছইন	=	হাত পাখা
বাইয়্যুন	=	বেগুন
কলমতরাজ	=	ছোরা
মিন্নতি	=	মেহনতী বা কাজের লোক
ঢেঁই	=	ঢেঁকি
হুইস	=	সুঁই,
কুরাইল	=	কুড়াল
হুত	=	পুত্র
মুত	=	প্রসাব
থোয়না	=	রাখে না

www.pathagar.com

ডরে	=	ভয়ে
মাডি	=	মাটি
হিম্বা	=	পিঁপড়া
আঁতি	=	হাতি
হুজালী	=	ক্ষুদ্র মশা-মাছি
কুত্তা	=	কুকুর
চুঙ্গা	=	বাক্স
কাঁড়ল	=	কাঁঠাল
আঁডা	=	হাঁটা
ঠাইলে	=	ডালে
দুইন্নাই	=	দুনিয়া
বান্দে	=	বাঁধে
হরের	=	পরের
হাডা	=	পাটা
হোল	=	ষোল
হইসার	=	পয়সার
হরান	=	পরান
বিয়া	=	বিবাহ
আঁর	=	আমার
হগুন	=	শকুন
হাগুন	=	ফাল্গুন
হানি	=	পানি
ভালা	=	ভালো
হঁচা	=	পঁচা
হামুক	=	শামুক
বইর	=	পা
কাডা	=	কাটা
হয্যন্ত	=	পর্যন্ত
আল	=	হাল
হিছের	=	পিছের
সোন্দর	=	সুন্দর

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. http://www.feni.gov.bd/node/498682
২. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ. ১৯৮-১৯৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

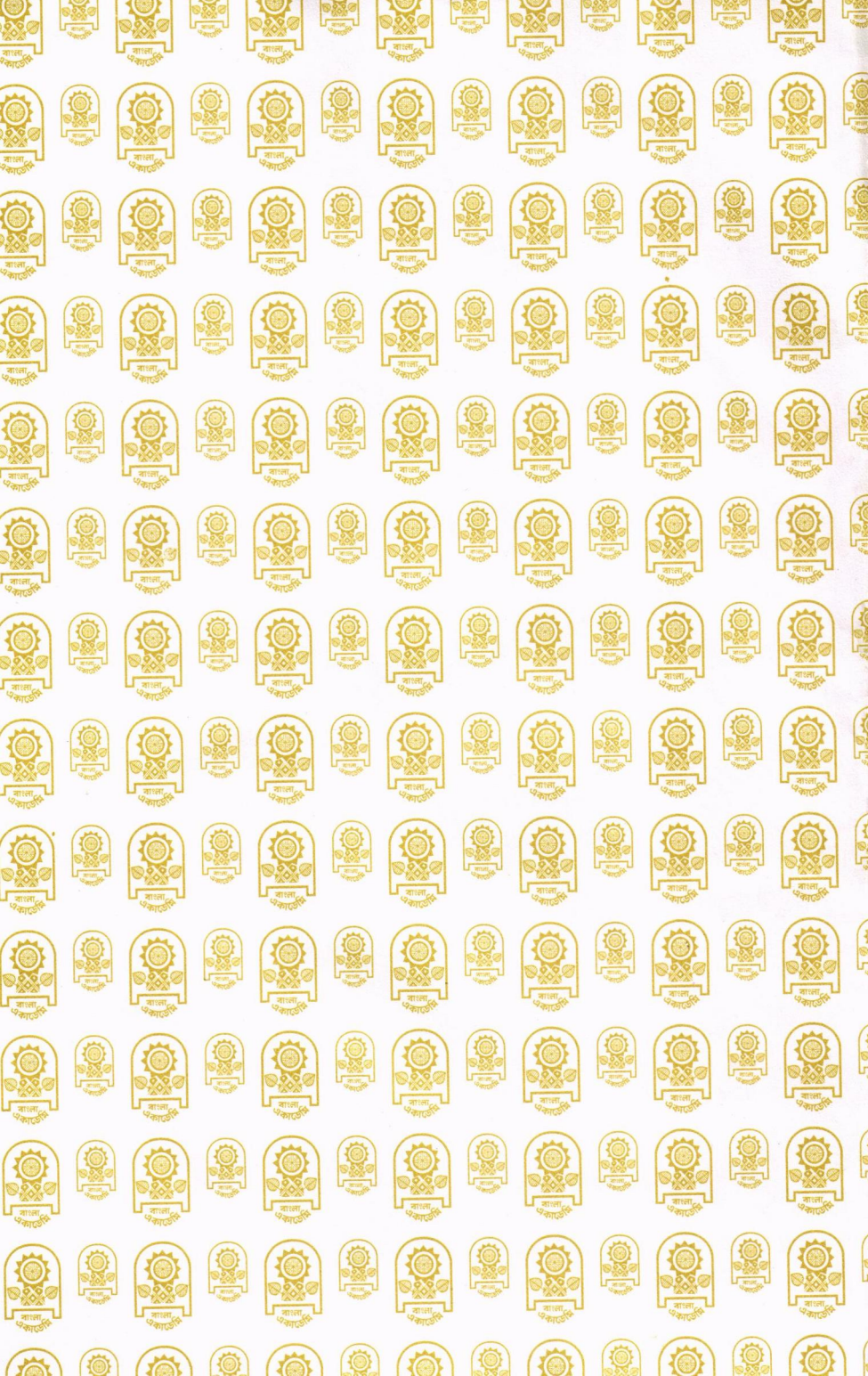
বাংলা একাডেমি